Orient Binding Works
BINDERS AND PRINTERS
100 BAITAKHANA RD.
CALCUTTA—9

কবিতা

দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]   আশ্বিন, ১৩৫৩   [ক্রমিক সংখ্যা ৫১

সম্পাদকীয়

‘কবিতা’র দ্বাদশ বর্ষের প্রারম্ভে এই প্রশ্ন মনে জাগলো যে প্রথম পাঁচ-ছ বছর আমরা যে-পরিমাণে ভালো কবিতা পরিবেশন করতে পেরেছি, যে-অনুপাতে আশাপ্রদ ও অজ্ঞাত নবীনদের পাদপ্রদীপের সামনে আনতে পেরেছি, এখনও কি তা-ই পারছি ? স্বীকার করতেই হয়, না। গেলো কয়েক বছর ধ’রে যে-সব কবিতা আমরা প্রকাশ করছি, তার অধিকাংশই কোনোরকমে প্রকাশযোগ্য মাত্র, তার বেশি কিছু না। ও-সব প্রকাশ না-ক’রে, ছুটি চারটি মাত্র কবিতা রেখে ‘কবিতা’কে প্রধানত সমালোচনা-পত্রিকায় পরিণত করবার কথাও আমাদের মনে হয়েছে, কিন্তু ভেবে দেখেছি যে তাহ’লে ‘কবিতা’ নামের অর্থ আর থাকে না, আমাদের মৌল লক্ষ্য থেকেও অনেকখানি চ্যুত হ’তে হয়। বাংলাদেশে মাসিকপত্রাদিতে কবিতার সম্মান নেই, এ-কথা বারো বছর আগে যতখানি সত্য ছিলো, এখন আর ঠিক ততটা না-হ’লেও এখনও প্রয়োজন আছে এমন একটি পত্রিকার, কবিতা যেখানে পাদপূরণ নয়, এমনকি অলংকরণও নয়, কবিতাই যার প্রধান উপাদান ও আলোচ্য, কবিরা যেখানে একান্তরূপে সজাতিসঙ্গে নিশ্বাস ফেলে বাঁচবেন, বিরূপ, বিরুদ্ধ ও বিপরীত প্রতিবেশিতায় পীড়িত হবেন না। কাব্যকলা সম্বন্ধে আরো বেশি পাঠককে উদ্বুদ্ধ করবার সঙ্গে-সঙ্গে কাব্যরচনায় উন্মুখ

নবীনদের উৎসাহিত করতেও আমরা চাই ; সেইজন্য, অবিশ্রাম নতুন লেখকদের স্থান না-দিলে 'কবিতা'র সার্থকতাই অনেকখানি নষ্ট হয়। আর সেইজন্যই, যে-সব রচনায় সামান্যতম ভালোরও আভাস আছে, তা-ই থেকেই বেছে-বেছে প্রকাশ ক'রে 'কবিতা'র বিশিষ্টতা ধারাবাহিকভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে আমরা প্রয়াসী ; আজ পর্যন্ত এমন ঘটনা প্রায়ই দেখছি যে 'কবিতা'য় যাঁর রচনা প্রথম বেরুলো, দু'এক বছরের মধ্যেই নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়ে তিনি কোনো-একরকমের 'খ্যাতি' অর্জন করলেন। বলা বাহুল্য, বার-বার ছাপার অক্ষরে নাম বেরুনোকেই বাংলাদেশে খ্যাতি বলে, এবং প্রতি বছরেই এইরকম এক-একজন খ্যাতিমানের কথা শোনা যায়, যাকে লক্ষ্য ক'রে অজিত দত্ত নতুন ক'রে বলতে পারেন, 'তুমিও বিখ্যাত হ'লে, সেই দুঃখে লিখি না কবিতা !'

★ ★ ★

কিন্তু কেন নবীনদের রচনা প্রায়ই আজকাল মাত্র সামান্যতম ভালো হচ্ছে ? কিংবা ভালোই হচ্ছে না ? কী হয়েছে ? ক্ষণজন্মা প্রতিভার কথা এখানে তুলবো না : সেটা দৈবের দান, তার আবির্ভাব গণনার অতীত, তার গতি অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু বাংলাদেশে কবিত্বশক্তির যে-একটি ঐতিহ্য দীর্ঘকাল ধ'রে প্রবহমাণ, তা কি হঠাৎ শেষ হ'য়ে গেলো ? এই বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে নিঃস্ব হ'লো প্রেরণা ? রিক্ত হ'লো ভাষা ? তা হ'তেই পারে না ; দেশে এখনো চিৎশক্তির সম্পদ আছে, চিরকালই থাকবে, সেটা তো প্রকৃতির দান, নষ্ট হবে কেমন ক'রে। কিন্তু প্রকৃতি যা দেয়, তা গ্রহণ করা, তার ব্যবহার করা, এও শক্তিসাপেক্ষ, জীবলোকে একলা মানুষেরই এ-শক্তি আছে, তারই নাম মনুষ্যত্ব। সাহিত্যক্ষেত্রে এই শক্তির আজ অবক্ষয় দেখছি বাংলা-দেশে, হয়তো জীবনের ক্ষেত্র থেকেই সাহিত্যে সেটা প্রতিফলিত। যে-পরিবেশ, যে-জলবায়ু ভালো লেখার অনুকূল তা আপাতত দেশ

থেকে মুছে গেছে বললেও বেশি বলা হয় না। কোনো লেখা ভালো ব'লেই মূল্যবান, এ-কথা প্রবলভাবে অস্বীকার করাই আজ প্রগতিশীল বৈদগ্ধ্যের লক্ষণ। তারুণ্য, অন্তত কিছুদিন পর্যন্ত, নব্যতমের অনুসারী ; যেটা সর্বাধুনিক, আপন স্বভাবের বিরুদ্ধ হ'লেও সেটাকেই অবলম্বন না-করলে যৌবনের জাত যায়। আজকের দিনে আধুনিকতম মত হচ্ছে এই যে লেখা জিনিশটা হচ্ছে লাল কিংবা কালো, ভালো কিংবা মন্দ নয়, আর সেইজন্য ভালো লেখবার চেষ্টাই নবীনেরা করছেন না। যদি উল্টো মতটাই চলতি মত হ'তো, তাহ'লে এই সব লেখকেরাই ভালো লিখতেন। যথার্থ অসাধারণত্ব সব সময় সম্ভবই নয়, কিন্তু সব সময়ই সাহিত্যের স্রোত ব'য়ে চলে—আর সেই সব লেখা, যার সার্থকতা শুধু সাহিত্যের সচলতা রক্ষায়—তাও ভালো হয়, দীপ্তিশালী হয়, কখনো-কখনো স্থায়ীও হয় যে-অন্তর্লীন শক্তির প্রেরণায়, তাকেই বলে ঐতিহ্য, বলে আদর্শ। বর্তমানে সেই আদর্শ দেশত্যাগী ব'লেই বাংলা কবিতার অধঃপাত ঘটেছে—শুধু কবিতার কেন, সমস্ত সাহিত্যের।

★ ★ ★

এই আদর্শের প্রকৃতি কী, আর তার প্রক্রিয়াই বা কী-রকম ? অন্য সব বিশেষণের মতো, ভালো কথাটাও অস্পষ্ট ও আপেক্ষিক, তার কোনো সংজ্ঞা আমরা দিতেই পারি না, যদি না কোনো প্রতিরূপের সাহায্য পাই। প্রতিরূপ মানে বস্তুরূপ। ভালো কবিতা বলতে স্বদেশের বা বিদেশের কয়েকটি কবিতা বা কাব্যাংশই আমাদের মনে পড়ে, তারই তুলনায় সদ্যোজাত রচনার আমরা বিচার করি। এইটে হচ্ছে ম্যাথু আরনল্ড বর্ণিত সমালোচনার পদ্ধতি ; সত্যি বলতে, ভালো লেখারও এইটেই উপায়। তরুণ বয়সে কাগজে কলম ছোঁওয়াবার জন্য আঙুলে যার দুশ্চিকিৎস্য চুলকনি রোগ দেখা যায়, ধ'রে নেয়া যাক স্বাভাবিক সাহিত্যশক্তি তারই আছে। এই শক্তির কোনো

নির্বস্তুক পরিমাপ নেই। এমন বলা যাবে না যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একশো শক্তির এঞ্জিন, আর জীবনানন্দ দাশ তিরিশ শক্তির, আর সুকান্ত ভট্টাচার্য পাঁচ। আজ যদি কোনো সতেরো বছরের ছেলে ঘরে ঢুকে বলে, 'আমিই বা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কম কিসে!' কিছুই বলবার নেই তার উত্তরে। কিন্তু সে-কথা বললেই শুধু হবে না, সেটা প্রমাণ করতে হবে। যুক্তি দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে। সেই যে দুশ্চিকিৎস্য চুলবুলি রোগ, সেটা শুধু লেখার বেগ জোগায়; কী লিখবো, কেমন ক'রে লিখবো, সেটা অবশ্যই সংগ্রহ করতে হয় পূর্ববর্তীদের ভাণ্ডার থেকে। তার মানে অবশ্য এ নয় যে একান্ত-ও অফুরন্ত-রূপে সাহিত্য থেকেই সাহিত্যের জন্ম: কী লিখবো, সে-কথা কবিকে কানে-কানে ব'লে দিয়ে যায় বিশ্ব, বা জীবন, বা, বিশ্বজীবন, বা বিশ্বপ্রকৃতি; কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কী-লিখবো আর কেমন-ক'রে-লিখবো অবিভাজ্য ব'লে রচনার আদর্শ না-থাকলে বক্তব্য বিষয়ও মনের মধ্যে স্পষ্ট হয় না। 'চণ্ডীদাসের মতো লিখবো,' 'ভারতচন্দ্রের মতো লিখবো,' 'মধুসূদনের মতো লিখবো'—এইরকম ইচ্ছার চঞ্চলতা কবিত্ব-অধিকৃত বালক বা যুবকের মনকে যখন তাড়না ক'রে বেড়ায় তখনই বলা যায় সে একটা আদর্শ পেয়েছে। কিংবা, 'কীটসের মতো লিখবো,' 'হুইটম্যানের মতো লিখবো,' 'এজরা পাউণ্ডের মতো লিখবো'। এমনকি, 'রবীন্দ্রনাথের মতো লিখবো'—আজকালকার বাঙালি কবিত্বপ্রয়াসীর পক্ষে এটাই বা নিতান্ত মন্দ আদর্শ কী। পূর্বসূরীদের মতো লেখবার চেষ্টা করতে-করতেই বাল্যরচনার নীহারিকায় হঠাৎ একদিন তারকার জন্ম হয়, অনুকরণের কলরোল ছাপিয়ে বেজে ওঠে নতুন সুর, নিজস্ব সুর। এর উদাহরণ শেক্সপিয়র, এর উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। আর এই প্রক্রিয়া যে ছেলেবয়সেই শেষ হ'য়ে যায় তাও নয়; পরিণত জীবনেও, নিজের নিঃসংশয় বিশিষ্টতা অর্জন করবার পরেও কোনো সমসাময়িক, প্রাচীন বা বিদেশী কবির কোনো রচনা প'ড়ে কোন কবির না মনে-মনে ইচ্ছা হয়েছে: 'আহা, এ যদি আমার লেখা হ'তো!' এ-ইচ্ছার মানে

তো এই যে কাব্যকলার শিক্ষা আরো একটু সম্পূর্ণ হ'লো, আরো একটু বিস্তৃত হ'লো ক্ষেত্র, আরো একটু বিকশিত হ'লো প্রতিভা। এই শিক্ষিত হবার ক্ষমতাকে যিনি জীবনের যত দীর্ঘকাল পর্যন্ত সজীব রাখতে পারেন, এক হিশেবে তিনি তত বড়ো কবি। একে যদি বলি অনুকরণের—বা অপহরণের—আশ্চর্য ক্ষমতা তাহ'লেও দোষ হয় না: পৃথিবীর মহৎ কবিদের সমস্ত জীবনের কাব্যসাধনার কথা যখন ভাবি তখন এ-কথা মনে না-ক'রে উপায় থাকে না যে আত্মোপলব্ধির অন্যতম উপায়ই অনুকরণ, প্রকৃত মৌলিকতার সেটাই উপলবন্ধুর বঙ্কিত পথ।

★ ★ ★

কিন্তু শুধু অনুকরণ যথেষ্ট নয়। টি. এস. এলিঅট বলেছেন যে অপরিণত কবি অনুকরণ করেন, আর পরিণত কবি অপহরণ করেন, অর্থাৎ আত্মসাৎ করেন। সত্য কথা। কিন্তু অনুকরণ থেকে অপহরণের শক্তি আসবে কেমন ক'রে। তার জন্য অনুশীলন চাই। অনুকরণ করেন অনেকেই, অনুশীলন করেন না ব'লে ব্যর্থ হন। এই অনুশীলনের অভাব বর্তমান নবীন লেখকদের মধ্যে ভয়াবহ। 'আমিই বা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কম কিসে!' এ-কথা মনে করতে দোষ নেই, সেটা ভালোই, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা চাই লুপ্ত নীল খাতাটির কথা, বোলপুরে গাছের তলায় ব'সে লেখা পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য, মনে রাখা চাই অপরিণত কবির সেই অপরিমাণ গদ্য-পদ্য, যা সঙ্গে-সঙ্গেই কালস্রোতে ভেসে গেছে। আরো মনে রাখা চাই পরিণত রবীন্দ্রনাথের বিরামহীন চিন্তা, চেষ্টা, উৎসাহ, উদ্বেগ, আপন রচনার বর্জন, পরিবর্তন পরিমার্জনা। এ-রকম যে পারে, কবি তো সে-ই। আর-কিছু না: কোনো-একটি ছেলে, কবিতার দিকে যার ঝোঁক আছে, সে ব'সে-ব'সে পাঁচ বছর ধ'রে প্রাণপণে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করুক, মানে, প্রাণপণে রবীন্দ্রনাথের মতো লিখতে চেষ্টা করুক, প্রত্যহ লিখুক, অবিশ্রাম

লিখুক—এ-কথা বাজি রেখে বলা যায় যে পাঁচ বছর পরে সে এমন কিছু লিখবে যা খাঁটি কবিতা, এবং রচয়িতার স্বকীয়তা যাতে সুস্পষ্ট। কিন্তু এ-রকম কোনো প্রস্তাবে সম্মত হ'তে নবীনেরা ইচ্ছুক নন আজকাল। তাঁরা শ্রমবিমুখ, তাঁরা নিকৃষ্ট অর্থে শৌখিন। মিলিয়ে-মিলিয়ে পদ্য লেখার শিক্ষাও তাঁরা নেবেন না, কেননা ছন্দ মিল ইত্যাদি জিনিশগুলি তাঁদের ধারণায় অতিশয় সেকেলে। ছন্দোবদ্ধ পংক্তিবিন্যাসের অভ্যাস করেন না এঁরা, ছন্দোবোধকে জাগ্রত করেন না—যতই ভাঙাচোরা হোক, যতই এলিয়ে পড়ুক, আর তো ভয় নেই, গদ্যকবিতা কিংবা ফ্রী ভর্স বললেই হ'লো। 'কবিতা'য় প্রকাশের জন্য অযাচিত যত লেখা আমরা পাই, তার মধ্যে এমন খুব কমই থাকে যা একটা নির্দিষ্ট ছন্দে লেখা, ঠিক গদ্যকবিতাও যে বেশি আসে তা নয়, অধিকাংশই গদ্যপদ্যের মাঝামাঝি একটা ছন্দোহীন ছন্নছাড়া অবস্থায় বিরাজমান, মিলের পাট তো প্রায় উঠেই গেছে। সনেট বা ঐ-রকম কোনো নির্দিষ্ট কাব্যরূপ বিরল হ'য়ে আসছে ক্রমশই। নবীনদের মধ্যে একজনকে দেখি না যিনি একটা আঁটোসাঁটো স্তবকবিন্যাস অবলম্বন ক'রে, মিলের জটিল গ্রন্থি আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ রেখে পঁচিশ-কি তিরিশ লাইনের একটি কবিতা লিখে উঠতে পারেন—পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর দেবার মতো ক'রেও এ-কাজ তাঁরা পারেন ব'লে মনে হয় না। এ-সব বিদ্যায় যাঁরা সিদ্ধ, এগুলিকে অগ্রাহ্য করবার অধিকার তাঁদেরই শুধু আছে। কেননা, বলা বাহুল্য, কারুকলার সুদীর্ঘ সুনিবিড় চর্চা দ্বারাই কবিতা লেখার হাত, কান ও মন ও তৈরি হয়, সেই হাত, সেই কান, সেই মন, যার দ্বারা রীতিবিরুদ্ধ হবার মতো, নতুন রীতি প্রবর্তনা করবার মতো, শক্তি ও আত্মবিশ্বাস জন্মায়। প্রথম অবস্থায় এই মানসিক শৃঙ্খলা শিক্ষা করতেই বহু বছর কেটে যায়—সেটা যে-কোনো শিল্পীর পক্ষেই অপরিহার্য—কিন্তু, আজকাল যাঁরা নতুন লিখেছেন, সে-শিক্ষাকে তাঁরা সময়ের অপব্যয় মনে করেন। কোনোরকমে ভাঙাচোরা

কয়েকটি লাইন পর-পর সাজিয়ে—না, সাজিয়ে কথাটা ভুল হ'লো —পর-পর বসিয়ে ছাপাবার জন্য অধীর হ'য়ে পড়েন তাঁরা, এবং যা-হোক একটি বই যদি বের করতে পারেন, অমানুষিক শ্রম করেন তার প্রশংসাপত্র সংগ্রহের জন্য। অবশ্য, প্রকাশ করবার ইচ্ছাটা খুবই সংগত, কেননা আত্মপ্রকাশের তাগিদেই মানুষ লেখে। যশোলিপ্সাও স্বাভাবিক। আমরা বলবো, সত্যিকার যশোলিপ্সাই এঁদের নেই; এ-কথা এঁরা ভাবেন না, কী ক'রে আমি এমন লিখতে পারবো যাতে যশ আমার অনুগামী হবে। যশের যেটা সুলভ সংস্করণ, খ্যাতি, পাঁচ বছরের, দু'বছরের, ছ'মাসের খ্যাতি, সেটাই এঁদের কাম্য, এবং সেটা, এঁরা বোধ হয় ধ'রেই নেন, নানারকম কৌশলে আদায় ক'রে নেয়া যায়। যেমন হলিউডে অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে 'বূস্ট' করা হয়, তেমনি সাহিত্যজগতেও ঠিক-ঠিক লোকের দুর্দমনীয়-দ্বারস্থ হ'তে পারলেই, 'নাম' করাটা সহজ, এইরকম একটা ধারণা সম্প্রতি দেশে খুব বেশি ছড়িয়েছে। এ-ধারণা যে একেবারেই ভুল নয়, সেটাই তো মারাত্মক। এরই ফলে এমন দৃশ্য আজকাল দেখা যায় যে সাহিত্যক্ষেত্রে কোনো নবাগত একখানা বই বের করবার পর একটি বছর শুধু প্রশংসার উমেদারি ক'রেই কাটিয়ে দিলেন—সে-উদ্দেশ্যে সাধারণ নীতিজ্ঞান ও আত্মসম্মান পর্যন্ত বিসর্জন দিলেন—কিন্তু ঐ এক বছরে আর-একটি লাইন নতুন লিখলেন না, হয়তো বাকি জীবনই লিখলেন না আর। সাহিত্যের ব্যবসায়িক দিকটার প্রাধান্য অধুনা বাংলাদেশে বাড়ছে ব'লে এই কুশ্রীতা নিতান্ত নির্লজ্জ হ'য়ে উঠেছে—সাহিত্যব্যবসার সঙ্গে অন্যান্য অর্থকরী ব্যবসার প্রভেদ আজ লুপ্তপ্রায়। ছল, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার—ইংরেজিতে যাকে এক কথায় ডিপ্লমেসি বলা হয়, তারই সাহায্যে নিছক 'উন্নতি' করাই জীবনের লক্ষ্য, এ-রকম কথাও লেখকজাতীয় ভদ্র ব্যক্তির মুখে শোনা যাচ্ছে। এর পরেও কি সাহিত্যের অধঃপাত হবে না!

* * *

আবার বলি: এ-রকম যে হচ্ছে তাঁর কারণই আদর্শের অভাব। মানে, যুবজনের মনে এই ধারণাই কাজ করছে যে লেখার সৌকর্যটা কিছু না, বানান-ব্যাকরণ কুসংস্কার মাত্র, লেখার বিষয়টা 'যুগোপযোগী' হ'লেই হ'লো। তা না-হ'লে অনেক লেখা লিখতে বা ছাপাতে, এবং অনেক কথা মনে-মনেও ভাবতে, নিজেরাই তাঁরা লজ্জা পেতেন। তা না-হ'লে তাঁরা সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন লিখতে, সত্যি লিখতে। কিন্তু হট্টগোলে গলা মেলালেই কোনো-না-কোনো মহল থেকে একটু-না-একটু বাহবা যখন নিশ্চিতই, তখন আর কষ্ট করে কে।

* * *

বাহবা দেয় কারা? কারা দায়ী এই শৈথিল্য, এই ভ্রষ্টতা, এই অনাচারের জন্য? তারা কয়েকটি রাজনৈতিক দল। এই সব দলের অধিপতিরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন তাঁদের প্রপাগাণ্ডার দপ্তরে সাহিত্যিকদের ভরতি ক'রে নিতে—সাহিত্যিকরা ভরতি হচ্ছেনও, সত্যি বলতে, ভরতি হবার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। কেন? না, তাহ'লে বই ছাপা হবে, বই কাটবে, নাম ছড়াবে। বই ছাপা হোক, বই বিক্রি হোক, এ-ইচ্ছা সদিচ্ছা নয় তা বলি না, কিন্তু সেটা মুখ্য নয়; যেটা সাহিত্য, যেটা আর্ট, সৃষ্টি, সেখানে 'মনের কথা মনের মতো ক'রে' বলাটাই আসল। কিন্তু দলভুক্ত সাহিত্যিকেরা মনের কথা বলছেন না, মনের মতো ক'রেও না; তাঁরা বলছেন দলের কথা যেমন-তেমন ক'রে। দলপতিরা অকৃতজ্ঞ নন, প্রচারকদের পুরস্কারে অকৃপণ। একটা আশ্চর্য এই যে এই রাজনৈতিক নামাশ্রয়ী দলগুলির সত্যিকার রাজনীতির চাইতে সাহিত্য শিল্পকলার দিকেই ঝোঁক যেন বেশি—বাইরে থেকে কখনো-কখনো এমনও মনে হয় এটাই তাঁদের একমাত্র আগ্রহস্থল—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ-কিছু কাজ নেই এঁদের—কেননা, রাজনীতিই যাঁর পেশা, ইচ্ছা

থাকলেও সাহিত্য বা অন্য-কোনো বিষয়ে মন দেবার সময় কোথায় তাঁর—রাজনীতির আচ্ছাদনে সাহিত্যই এঁদের কর্মক্ষেত্র, বাংলাদেশের সাহিত্যকে নানাদিক থেকে বিনষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট, বিপর্যস্ত করতেই এঁরা বদ্ধপরিকর। আজ অধিকাংশ লেখক কোনো-না-কোনো পতাকার তলে আশ্রয় নিয়েছেন—এমন হয়েছে যে কেউ কোনো নতুন পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হ'লে তক্ষুনি প্রশ্ন ওঠে: মশাই, আপনি কোন দলের? কেউ কমিউনিস্ট, কেউ কংগ্রেস, কেউ বা অন্য-কিছু—আর যদি এমন-কেউ থাকে যে ও-সব কিছুই নয়, সে-দুর্জনের কথা কিছুই না-বলাই ভালো।

* * *

বাংলায় 'দল' কথাটার একটু দুর্গন্ধ আছে। 'দল' বলতে সাধারণত 'দলাদলি' মনে পড়ে আমাদের, 'শতদল' মনে পড়ে না। 'আমাদের পত্রিকা সর্বদলীয়', কিংবা 'উনি ভালোমানুষ, কোনো দলে নেই'—এ-রকম কথা প্রায়ই শোনা যায় বাংলাদেশে। সে-রকম সুনাম অর্জনের সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের কখনো হয়নি, এ-কথা কারো-কারো জানা থাকতে পারে। সর্বদলীয়তা বা নির্দলীয়তার, ইনিও-ভালো-উনিও-ভালো-আমিও-ভালো-তুমিও-ভালো গোছের ভালোমানুষ হবার দাবি কখনোই করিনি আমরা, বরং কিছুটা তীব্রতার সঙ্গেই ঘোষণা করেছি যে এটা ভালো এবং ওটা ভালো নয়, সেটাকেই সাহিত্যবৃত্তির অঙ্গ ব'লে জেনেছি, মনুষ্যত্বেরও। সাহিত্যিক দলের শ্রদ্ধেয়তা আমরা স্বীকার করেছি। 'ভারতী', 'সবুজপত্র', 'কল্লোল' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়', প্রথম দিকের 'কবিতা'—এই পত্রিকা-গুলিকে কেন্দ্র ক'রে এক-একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে, সাহিত্যানুশীলনের এক-একটি তরঙ্গকে জেগে উঠতে দেখেছি আমরা। বিদেশী সাহিত্যের ইতিহাসেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর বিবরণ সুপ্রচুর। একে নিন্দার অর্থে দল বলা অন্যায়: সমসাময়িক সমধর্মীরা পরস্পরের

প্রতি আকর্ষিত হবেন, পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করবেন, প্রীতি বিনিময় করবেন—সেটাই তো শুভ, স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর। এ-রকম হ'তেই হবে, কিংবা না-হওয়াটা, কিংবা এর উল্টোটা, ক্ষতিকর, এমন কথাও বলবো না—কেননা সাহিত্য মানুষের একলার কাজ, তার নির্জনতার সাধনা—কিন্তু মানবস্বভাবের অনতিক্রম্য নিয়মেই এ-রকম প্রায়ই ঘ'টে থাকে। আর তাতে যে কতখানি ভালো হয় তা আমরা নিজের জীবন দিয়ে একাধিকার অনুভব করেছি—অনেকেই করেছেন। কী হয়? না, আলাপে, আলোচনায়, অনুশীলনে ঠিক সেই আবহাওয়াটি গ'ড়ে ওঠে, মন যাতে মুক্তি পায়, লেখনী হয় অকুণ্ঠিত। তরুণ বয়সে এটা বিশেষভাবে প্রয়োজন। দেশে আজ সাহিত্যিক দল ব'লে কিছু নেই, লেখার আবহাওয়া তাই চ'লে গেছে। তার বদলে আছে পোলিটিকাল পার্টি: দল কথাটা শুনে শিউরে উঠতেন, এমন লোকও আত্মনিয়োগ করেছেন পার্টির পরিচর্যায়। সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক দল থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী—কিন্তু সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক দল, রাজনীতির চর্চার জন্য সাহিত্যিক সমিতি, কিংবা সাহিত্যের আলোচনার জন্য রাজনৈতিক বৈঠক—এই সব নিদারুণ অপভ্রংশের সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়। সাহিত্যিক দলের সঙ্গে এ-সব দলের মস্ত তফাৎ এইখানে যে সাহিত্য-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় স্বভাবতই, যথাসময়ে তার জন্ম, মৃত্যুও যথাসময়ে, আর এরা কৃত্রিম, মানে বানানো, মানে রীতিমতো সংঘবদ্ধ—সেই অর্থে সংঘবদ্ধ যেটা যুদ্ধে বা বাণিজ্যে অপরিহার্য, কিন্তু সাহিত্যে কালান্তক। বিশেষ কোনো-একটা মত প্রচারের জন্য এই সব দল চেষ্টা দ্বারা গঠিত হয়েছে, বিশেষ-এক রকমের জ্ঞান বিতরণের, বিশেষ-এক ধরনের সংবাদ বিকীরণের জন্য। সাহিত্যের মূল্য যে মতে নয়, তথ্যে নয়, তত্ত্বে নয়, সাহিত্য আর সাংবাদিকতা যে স্বতন্ত্র, এই কথাটা দেশের লোককে ভুলিয়ে দেবার জন্য প্রতিদিন মুদ্রাযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে অক্ষৌহিণী বাক্-বাহিনী। এই বিকৃতি, এই

আদর্শহীনতার ফলেই নবীনদের মধ্যে যেটুকু সাহিত্যশক্তি আজ আছে, তা কিছুতেই বিকশিত হ'তে পারছে না।

★ ★ ★

আর শুধু নবীনদের কথাই বা বলি কেন। যাঁরা প্রবীণ, আমাদের আধুনিক সাহিত্যে অগ্রগণ্য তাঁরাই অনেকে সংক্রমিত, উদভ্রান্ত ধর্মচ্যুত। জীবনানন্দ দাশ কী লিখছেন আজকাল? এ-প্রশ্ন সাধারণভাবে সাধারণ পাঠক করতে পারেন, আমরা তাঁর অদ্বিতীয় ভক্ত ব'লে বিশেষভাবে করতে পারি। অন্যদের বাদ দিয়ে বেছে-বেছে তাঁর নামই করলুম এই কারণে যে উদাহরণ হিশেবে তিনি সর্বলক্ষণসম্পন্ন। জীবনানন্দ দাশ আমাদের নির্জনতম স্বভাবের কবি। এই নির্জনতার বিশিষ্টতাই তাঁর প্রাক্তন রচনাকে দীপ্যমান করেছিলো। মনে-মনে এখনো তিনি নির্জনের নির্ঝর, তাঁর চিত্ততন্ত্রী এখনো স্বপ্নের অনুকম্পায়ী। কিন্তু পাছে কেউ বলে তিনি এস্কেপিস্ট, কুখ্যাত আইভরি টাওআরের নির্লজ্জ অধিবাসী, সেইজন্য ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার বিষয়ীভূত ক'রে তিনি এইটেই প্রমাণ করবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন যে তিনি 'পেছিয়ে' পড়েননি। করুণ দৃশ্য, এবং শোচনীয়। এর ফলে তাঁর প্রতিশ্রুত ভক্তের চক্ষেও তাঁর কবিতার সম্মুখীন হওয়া সহজ আর নেই। দুর্বোধ ব'লে আপত্তি, নয়; নিঃস্বুর ব'লে আপত্তি নিঃস্বাদ বলে। হয়তো ওরই মধ্যে তাঁর পরিণতির সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন, কিন্তু প্রচ্ছন্নই। তা যে পরিস্ফুট হ'তে পারছে না তার কারণই এই যে হুজুগের হুংকারে তিনি আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন। মনের অচেতনে তাঁর এই কথাই কাজ করছে যে আমি যদি এখনো মাকড়শার জাল, ঘাস আর শিশিরের কথা লিখি, তবে আর কি তার পাঠক জুটবে? তবু কবিতায় মাঝে-মাঝে রোম-বার্লিন দেখলে লোকে এ-কথা অন্তত ভাববে যে লোকটা নিতান্তই ম'রে যায়নি। হয়তো তাঁর মন

এখনো প'ড়ে আছে ঘাসে, শিশিরে, জলে, ছায়ায়, আকাশে—প্রকৃতির কবি তিনি, তা ছাড়া কিছুই নন—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ; কিন্তু সেই তাঁর স্বদেশ থেকে, তাঁর রাজত্ব থেকে মনকে সরিয়ে এনে তিনি নিজেকে বন্দী করেছেন চলতি আন্দোলনের আন্দামানে—এই নিষ্ঠুর অত্যাচারও যে কোনো-একজন কবি নিজের উপরে করতে পারলেন, তার জন্য কবিকে দোষ দেবো, না সেই আন্দোলনকে, না আন্দোলনের জনক বর্তমান সময়কে, সে-বিষয়ে মনস্থির করা শক্ত।

★ ★ ★

হয়তো সময়েরই দোষ। সময়টা দুঃসময় বইকি। শুদ্ধ দৈহিক অস্তিত্বটুকুই নিয়ে দেশের লোক এমন বিব্রত যে অন্য-কোনো কথা তারা ভাবতেই পারছে না। কিসে তারা খেতে-পরতে পাবে, এই তাদের একমাত্র চিন্তা। এমনকি, সাহিত্যের কাছেও আশা করছে অন্নবস্ত্রসংস্থানের উপায়ের নির্দেশ। এ নিয়ে তাদের দোষ দিয়ে কী হবে, এটা তাদের দুর্দশারই পরিমাপ। কিন্তু সর্বসাধারণ আজ উদ্‌ভ্রান্ত ব'লে কি কবিরও বুদ্ধিভ্রংশ হবে? মনীষীও উন্মত্ত হবেন? শিল্পী ভুলবেন তাঁর শপথ? তাঁরাই যে সমাজের বিবেক, তাঁরাই সত্যের দীপাধার—তাঁরাও যদি চারিত্রচ্যুত হন তাহ'লে আর রইলো কী। এ-কথা ঠিক যে যা সূক্ষ্ম, যা সুন্দর, যা বিশুদ্ধ, যা সর্বতোভাবে কবিতা, যা সত্যই সাহিত্য, তার সুর কান পেতে শোনবার মতো কান দেশে আজ নেই। একেবারে নেই, এমন নির্মম হতাশার কথা বলবো না, কিন্তু অধিকাংশেরই নেই, সমগ্রভাবে সর্বসাধারণের নেই। কিন্তু সে-কান সে-মন একজনেরও যদি না থাকে, তাই ব'লে কি কবিরা শ্রুতিগম্য হবার জন্য মাতালের মতো চীৎকার করবেন, না কি পাগলের মতো প্রলাপ বকবেন? সেই সুর, যা সূক্ষ্ম, যা সুন্দর, যা বিশুদ্ধ, সেই সুরই বাজিয়ে যেতে হবে। যদি অধিকাংশ না শোনে, তবু। যদি একজনও না শোনে, তবুও। বাজাতে হবে সেই সুর, অবিরাম,

অবিশ্রাম, বাজাতে-বাজাতে প্রলয়ের জলে খণ্ড-খণ্ড দ্বীপের মতো এখানে-ওখানে জেগে উঠবে কান, প্রাণ, মন, ক্রমে সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপাবলী পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে, মিলিত হবে, গ'ড়ে উঠবে দ্বীপপুঞ্জ, মহাদ্বীপ, মহাদেশ। ফিরে আসবে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, আনন্দ, রুচি। ফিরে যাতে আসতে পারে, সেইজন্যই বাজাতে হবে বার-বার, বাজাতে হবে বরাবর। বাজাতে হবে, যাতে নিদারুণ দুর্দিনেও মানুষ এ-কথা ভুলে না যায় যে স্বাস্থ্য আছে, অপ্রমত্ততা আছে, মেঘ আছে, রৌদ্র আছে, চিরন্তন সৌন্দর্য আছে। সে-কথা না-ভুললেই সে বাঁচবে, সে-কথা ভুললে কিছুতেই সে বাঁচবে না। এটাই কবির কর্তব্য এখন, একমনে সেই সুর বাজানো, সেই সুন্দর বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম সুর, প্রাণপণে বাজানো ; এটাই কবির কর্তব্য চিরকাল। এমন কেউ-কেউ যদি থাকেন—নিশ্চয়ই আছেন—যাঁরা আজকের দিনেও সাহিত্যের এই চারিত্রে বিশ্বাসী ; যাঁরা মানেন যে শিল্পকলা কোনো উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নয়, নিজের জন্যই মূল্যবান ; রুচি যাঁদের অবিকৃত এবং সাহিত্যরচনায় শ্রী ও শৃঙ্খলার আদর্শ যাঁদের মনে জাগ্রত—তাঁদের সকলকে আমাদের অভিবাদন, তাঁদের সকলকেই আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আপাতত শেষ করি।

পথের শপথ

বুদ্ধদেব বসু

ব্যর্থ হয়েছে দিন
রাত্রি আমার বৃথা,
আসো নাই তুমি আসো নাই ;
স্বপ্নেই হ'লো লীন
স্বপ্নের পরিচিতা,
বাসা নাই তার বাসা নাই।
বিরতিবিহীন কাল
চল্লিশে দিলো তাল—
আশা নাই আর আশা নাই।

ছিলো আশা ছিলো কুটিল আঁখির আখরে,
ছিলো বাসা ছিলো বিকচ বুকের চূড়ায়, সুখের শিখরে ;
মনে হয়েছিলো কতবার, যেন চপল চোখের ব্যাকুল রেখায়
অশ্রু-হাসির ছল ক'রে শুধু তোমারে দেখায় ;
মনে হয়েছিলো ঘনচুম্বন-ফেন-উচ্ছল অধর আধার
সে শুধু উপায়, শুধু উপচার তোমারে সাধার ;
মনে হয়েছিলো তড়িৎ-পরশ লাজুক আঙুলে, উদ্বেল চুলে,
চুলের ঢেউয়ের কোঁকড়া কুলায়ে
তোমারেই যেন আনলো ভুলায়ে
আমার ব্যগ্র মত্ত অধীর হাতের মুঠোয় ;

তোমার আকাশে অদ্ভুত যত চাঁদ ফোটে, তারা নারী হ'য়ে যেন
আমার ঘুমের প্রান্তে লুটোয়—
তনুর ধনুতে কানে-কানে টেনে ছিলা
মুগ্ধ, অবোধ, অমর অতনু
যখন করেছে লীলা।

দিনে-দিনে মোর পূর্ণ হয়েছে
যখনি যে-কোনো বাসনা,
মনে-মনে তারই অনুকম্পনে
শুনেছি তোমার ভাষণা।
আজ চল্লিশে এসে দেখি শেষে
আসো নাই তুমি আসো নাই।

আজকে দেখছি আশা ঝ'রে গেছে, বাসা ভেঙে গেছে,
আছে শুধু আছে ভাষা,
আর আছে ভালোবাসা।
তৃপ্ত হয়েছে শতবর্ষের উপবাসী দেহ, পূর্ণ হয়েছে প্রাণ,
তবু গান, কেন গান ?
যে-ভালোবাসায় বিবশ, বিশ্বে জড়ায়ে ধরেছি বুকে
স্বর্গ-নরকে উজাড়ি' পলকে সামান্য সুখে-সুখে,
যে-ভালোবাসার হৃৎস্পন্দনে সমুদ্র উন্মাদ
ভেঙেছে সকল গতানুগতির বাঁধ—
সে-ভালোবাসার দান
এখনো হয়নি শেষ,
এখনো আমার গান
জেগে আছে অনিমেষ।

আজো যায় ডেকে চুপে-চুপে সে কে,
কেঁপে-কেঁপে ওঠে প্রাণ,
পেয়ে কার সাড়া হ'লো নীড়হারা
আজো গান, মোর গান ?
জানি, সে তোমারি অসীম, অপার,
অপরশ মধুরিমা,
কথা-বোনা পাড়ে আজো চাই যারে
পরাতে রূপের সীমা।
যুবক বয়সে ভেবেছি, তোমার
কোনো দেহে আছে বাসা,
আজ চল্লিশে এসে দেখি শেষে
সে-বাসা আমারি ভাষা।
ভাষার যে-পথে নিত্য চালায়
ভালোবাসা তার যান,
সেই ভাষাকেই ভালোবাসা আজ
করেছে আত্মদান।
যত চলি পথে তত দেখি দূরে
তোমার বিশাল ছায়া,
সত্য কি শুধু পথের শপথ,
লক্ষ্য কি তবে মায়া ?

মধ্যবয়সের প্রার্থনা

বুদ্ধদেব বসু

যে-অল্প আমার আছে, সেই স্বল্প সর্বস্ব আমার ;
সব যদি স্বল্প হয়, সে-অল্পের বেশি নেই আর।
তোমারে তা দেবো ব'লে দিনে-দিনে বেদনার দূত
করেছে প্রস্তুত।

কত না মধুর ক্ষণে মনে হ'লো, কিছু নেই বাকি,
দুঃখের প্রহারে জেগে দেখেছি, লুকায়ে ছিলো ফাঁকি।
কিছু হাতে রেখে দিতে বানিয়ে নিয়েছে ছল-ছুতা
দুর্বল ভীরুতা।

যেখানে সর্বস্ব প্রাপ্য, সেখানে তিলার্ধ যদি খসে
যা-কিছু দিলাম, তা-ই মূল্যহীন হয় সেই দোষে।
তাই আমি আজো গনি ব্যর্থতার আবর্তের ঢেউ
অনেক দিয়েও।

আমার সর্বস্ব যদি স্বল্প হয়, সব সে তবু তো,
তারও নেই সর্বস্বের বেশি, যার ঐশ্বর্য প্রভূত।
আন্তরিক এ-গণিতে অল্প তাই অমিতপ্রতিম,
সামান্য, অন্তিম।

অনেক এখানে শূন্য, ন্যূনতম একান্ত চরম,
শূন্য আর ভগ্নাংশের মূল্যভেদ মারাত্মক ভ্রম।
এ-ভুল উন্মূল ক'রে দুঃখের দাবিতে তুমি কাড়ো
আরো, আরো, আরো।

তবুও দিইনি সব ; বন্দী দেহে অন্ধতার দ্বিধা
এখনো বিচার করে অনাচারী সুযোগ সুবিধা।
কবে আর চিন্ময়ের পূর্ণিমায় ছিন্ন হবে বেড়ি—
আর কত দেরি।

যে-স্বল্প আমার আছে, সে-অল্পের সর্বস্ব তোমার,
সব যদি স্বল্প হয়, সর্বস্ব ব'লেই মূল্য তার।
রাত্রিদিন শ্রান্তিহীন বাজে, শোনো, আমার বীণায়
'নাও, নাও, নাও।'

কী দীর্ঘ অপেক্ষাকাল ! কী কঠিন তোমার শপথ !
বাঁচায় বঞ্চিত যত, তত মুক্ত পরম সম্পদ।
দিনে-দিনে জীবনেরে রিক্ত ক'রে দাও-যে বিদায়
দেহের দ্বিধায়।

তা-ই, তবে তা-ই হোক ! স্মৃতি হ'য়ে ঝরুক, ঝরুক
অপলাপী অনুকম্পা, অপ্রতিভ-ভীত দুঃখ-সুখ।
যে-আমি তোমার বাণী, তারে আর রেখো না নির্বাক ;
দাও, দাও ডাক।

আঘাতে-আঘাতে আমি তোমারে তো জেনেছি দুর্বার,
আর নয় অনুক্রম, হানো আজ অমোঘ উদ্ধার।
ভুলায়ো না শূন্য-সম অংশেরে একটু ক'রে বড়ো ;
করো, পূর্ণ করো।

করো শুষ্ক, শুষ্কতর জীবনেরে ; বাণীর নটীকে
মগ্ন করো চৈতন্যের নগ্নতার ভীষণ স্ফটিকে,
তবে যদি সর্বশেষ-সর্বস্ব-স্বল্পেরে দিতে পারি
নিঃশেষে নিঙাড়ি'।

অফুরন্ত

বুদ্ধদেব বসু

হাওয়ার চীৎকারে আমি তোমারেই ফিরেছি ডেকে।
দয়া নেই, শান্তি নেই ! দুর্বার, বিশাল, উত্তাল
ঢেউয়ের উৎসাহ ঢেলে মগ্নতার পাহাড় থেকে
প্রান্তরের সমতলে, দিগন্তের সমান্তরাল
নদী হ'য়ে, জলের দুরন্ত বেগে চকিতে বেঁকে
তোমার নামের মন্ত্র অন্তহীন, অপরিমিত,
জপিয়েছি পৃথিবীর হৃদয়েরে ; আকাশে এঁকে
ঝড়ের অরাজকতা, বজ্রের বিদ্রোহে উদ্ধৃত
বিদ্যুতের অসহ্য মুহূর্তে আমি নিয়েছি দেখে
আশ্চর্য তোমারে। শুধু এই ! তারপর আবার
কি অন্ধ-করা-অন্ধকার-কারাগারে, একে-একে
রুদ্ধ হবে ঝড়, ঝর্না, বন্যার উচ্ছ্বাস, আর আমার
সত্তার সত্য ! হাওয়ার চীৎকারে যাবে হেঁকে
অফুরন্ত ভবিষ্যৎ—'সে কে···সে কে···কে !'

সাঁওতাল কবিতা

বিষ্ণু দে

(১)

দুটি ছেলে
তারা লাঙল চালায় লাঙল
লাঙল চালায় তিন পাহাড়ের গায়ে।

দুটি মেয়ে
তারা জল তোলে দুইজনে
জল তোলে ঐ ছোটি পাহাড়ের ঢলে।

ওগো ছেলে দুটি
বাপ্‌কে আমার কোথাও
দেখেছ তোমরা—লাঙল চালায় তিন পাহাড়ের গায়ে?

ওগো মেয়ে দুটি
জানো কি আমার মা
জল তোলে কোথা ঐ পাহাড়ের ঢলে?

দেখেছি আমরা তোমার বাপকে ঐ
ঐ হোথা ঐ উঁচু পাহাড়ের শিরে।
আমরা দেখেছি তোমাদের মাকে বটে
ঐ হোথা নিচে সুদূর ঝর্না-তীরে।

(২)

ঘাস কাটি ঘাস বড়ো পাহাড়ের পরে
প্রেয়সী, ক্লান্ত কণ্ঠে তৃষ্ণা ভরে
প্রেয়সী, আমাকে নিয়ে চলো ফাটে গলা
তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঝর্নাতলায়।

তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঝর্নাতলায়
জোঁকের রাজ্যি, কাজ নেই গিয়ে তায়
প্রেয়সী আমাকে নিয়ে চলো, ফাটে গলা
আমবাগানের পাশের ঝর্নাতলায়।

আমবাগানের পাশের ঝর্নাতলায় জুটেছে নেচে
প্রেয়সী, রাখাল ছেলেরা
চলো যাই দোঁহে ময়নামতীর পারে,
দীঘি থেকে জল খেতে দেবে সেঁচে সেঁচে।

(৩)

শ্বেত পাহাড়ের দুইটি শুভ্র ঘুঘু
কি দুঃখে বলো উড়ে চলে' গেলে হুঁহুঁ?
সে বুঝি দিনের প্রখর তাপের তরে
সে বুঝি রাতের শিশির শীতের তরে!
আহা শিশিরেই উড়ে চলে গেল ঘুঘু।

অস্ত ইসারা

জ্যোতির্মালা দেবী

ওই
দিগন্তের পারে
তারা হারে
কমল-কুঙ্কুম
ও কি স্বপনের
মৃদু মায়া
রূপছায়া রঙিন কুসুম !
ও যে উষসীর মনোরথে
ভেসে আসা মৃদুল সমীর
দোলন চাঁপার বাণী দোদুল লতায়
আধো অমরায় ।
ঈষৎ কম্পিত কর,
নহে দেবী নহে স্বর
আঁখিরাগে নাই নাই উচ্ছল মানিক
শুধু শিহরণ
পারাবার প্রান্তে আঁকা কনককম্পন
সন্ধ্যার সৈনিক ।
ওগো তার ইসারা যে
পাল তুলে যায়
চক্রবাল-উদাসিনী
প্রবাহিণী আলো মেখলায় ।

হায়
ওরা সাগরের মায়া,
রঙের তরঙ্গ তুলে
ছুলে ছুলে লুকায় যে
অধরার কায়া ।
ঝিলিমিল-ঝিলিকের মরুময় পথে
মরীচিকা-ফুল
উদ্ভাসিয়া ক্ষণ হাসি
নিভে যায় স্রোতে
নিশাতটিনীর
মিলনব্যাকুল ।

না, না,
ওই নামে পশ্চিমের অকূলবিথার,
অনুপম
তীরবিদ্ধ পাখিসম
অসীমের রক্তপারাবার ।
কোন ব্যাধ হাতে ল'য়ে সব্যসাচী তূণ
ম্লান অবনীরে দিল আনি
অন্তরীক্ষ হিয়াখানি—শোণিম প্রসূন ।
উচ্ছ্বসিত বক্ষধারা
সুরঞ্জিত সীমান্তের, প্রহাসিনী
তারা
গোকুলগমনতালে গোধূলির ধূপ
জ্বালে অনিবার
নভচূড়ে অপরূপ
অস্তপ্রতিভার ।

ওথেলো

রাজলক্ষ্মী দেবী

নীল চামড়ার তলে লাল প্রেম হয়ে গেল নীল।
অথবা সমুদ্র বুঝি রুমালের ঝাপটায় বিক্ষোভিয়া হয়েছে ফেনিল।
তবু রক্ত একদিন লাল ছিল;
সমুদ্রও সমুদ্রই,—নহে সে পঙ্কিল
পরিসরহীন কোনো বিল।

ছুরি হানো আমার হৃদয়ে।
ওথেলো, তোমার জয় নারীত্বের চির পরাজয়ে।
বর্বর পুরুষ, নারী তোমাকেই ভালোবাসে;
কী-প্রভেদ প্রেমে আর ভয়ে?

ডেস্‌ডেমোনার মতো নিতান্ত কোমল এক অকর্মণ্য মেয়ের হৃদয়,
তোমার ছুরির যোগ্য নয়।
মরণের ক্ষমা দিয়ে মলিন করেছে তব পৌরুষের প্রখর বিজয়।

আমার শোণিতে আছে তোমারি মতন এক নীলের আভাস,
আমারে ছুঁয়েছে এক উত্তরের বর্বর বাতাস,
মরণের আয়োজন নিজ হাতে ক'রে যাব,
ক্ষমার রবে না অবকাশ।

রুমালের অসতর্ক অন্তর্ধান,—কী-রোমাঞ্চ তাতে?
ওথেলো, জানো কী-সুখ পৌরুষের সঙ্গে ছলনাতে?
ছদ্মপ্রণয়ের কোনো প্রখর ইঙ্গিতে
ক্যাসিওকে রুমালটা দিয়ে দেব আমিই না-হয় নিজ হাতে।

ইআগোর কী বা প্রয়োজন?
নারী হ'য়ে জানি না কি, কেমনে জোগাতে হয় ঈর্ষার ইন্ধন?
হায়,—উত্তপ্ত হয় না তবু ম'রে-যাওয়া আধুনিক মন।

তুমি আধুনিক নও,—আছে যে-বর্বর বন্য তোমার ভিতরে
যুগে-যুগে নারী তারি প্রণয়ের তরে
প্রাণপণ করে।

ওথেলো, আমার মন জড়ায়েছ কুহকে মায়ায়;
আমি নারী, চাই আমি তোমারেই চাই।
আপনি জ্বলিতে চাই তোমারে জ্বালায়ে ছলনায়।

তোমার ছুরির তলে পেতে দেব স্পন্দিত হৃদয়।
আমার মৃত্যুতে হোক চিরন্তন পৌরুষের জয়।
ছলনার ছলে নারী পরাজয় যাচে শুধু,—
লাঞ্ছনায় সে যে ধন্য হয়।

তবু আধুনিক মন নির্বিকার থাকে ছলনাতে,
আঘাতের তীক্ষ্ণ ছুরি চাহে না তুলিয়া নিতে হাতে,
শুধু ব্যগ্র প্রণয়ের অশেষ আশ্বাস দেয়,—
নারীর কি ভরে মন তাতে?

যে-মৃত্যু নারীর কাম্য, সেই মৃত্যু দাও তুমি মোরে,
ছুরি বিদ্ধ ক'রে দাও এ-বক্ষপঞ্জরে,
অবলুপ্ত হ'য়ে যাক আমার স্বাতন্ত্র্য চিরতরে।

বর্বর ওথেলো, তুমি আমার প্রেমিক, প্রিয়তম।
তোমারি জয়ের টীকা রচিব অন্তিম রক্তে মম॥

পদ্মভুক্

রাজলক্ষ্মী দেবী

কাছে ডাকিও না, প্রিয়া,—বাধায় বন্ধুর দীর্ঘ পথ,
প্রণয়তরঙ্গাঘাতে ভগ্নপ্রায়, ক্লান্ত মনোরথ।
তোমার দুইটি চোখে দেখিয়াছি লোভনীয় তীর,
তবুও ভ্রূকুটি করে কালো ঢেউ দূর বারিধির।
আমি ভীরু,—অবসাদে মন্থর হয়েছে দেহ, মন;
বিবিধ শঙ্কার চাপে সঙ্কুচিত জর্জর যৌবন।

তার চেয়ে দূর হ'তে ভালোবাসি,—বাধাবিঘ্নহীন
মধুর স্বপন দিয়ে ভ'রে তুলি মোর নিশিদিন।
ভার রহিবে না কিছু, দায় রহিবে না কিছু তার।
আকাশকুসুম হয়, হোক, তবু, সে-প্রেমই আমার॥

চড়ুই

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কোনো একদিন ধরো হাতে নিয়ে বই
তারা আর জ্যোছনার ভিড় ঠেলে ঠেলে
নীল, নীল আকাশসীমানা পার হই—
ঘাসের ছায়ায় ঢাকা নীল হ্রদ যেন,
—পাখীর চোখের মত যে-আকাশ কাঁপে নিয়তই।

হয়ত রয়েছে খোলা অক্ষরে ধূসর পৃষ্ঠা হাতে কোনো বই
ভুলে গেছি; কুড়ায়ে-কুড়ায়ে ফিরি জ্যোছনার জুঁই,
হুঁশ নেই, কখন এসেছে কাছে ধূসর-গোলাপি রঙ একটি চড়ুই।

একটি চড়ুই শুধু, ফড়িঙের মত তার ডানা—
এল কাছে, পাতলা মসৃণ ঠোঁট;—ভুলে বুঝি গেছে দূর
বনের ঠিকানা।
দুটি চোখ ভ'রে আছে অনেক বিস্ময় আর
স্বপ্ন কত নেই, নেই জানা;
শুধু কাঁপে সারা মন—সারা গৃহখানা।
হারানো দিনের ঘ্রাণ পাই যেন, আর
দূরাগত স্বপ্নের আভাস
নীলের উচ্ছ্বাস।

সে-চড়ুই আর নেই, উড়ে গেছে, ফাঁকা-ফাঁকা লাগে মন, ফাঁকা
লাগে ঘর,
আমার মনের মাঝে চকিতে শুনিতে পাই যেন কার পুরাতন স্বর,
নীল, নীল আকাশ কতই
আবার পেরিয়ে যাই, উড়ে যাই, মন যেন পাখির মতই;
হাতে থাকে ধূলায় ধূসর এক গল্পের বই।

ঘুম-ভাঙা রাত

রাধাবিনোদ সরকার

ঘুম ভেঙে দেখি
আইবুড়ো রাত চাঁদনি-জ্বলা ;
রাশি-রাশি রূপ উথলে পড়ছে
জানালা খোলা।
দুর্বার আলো
লুটোপুটি খায় পাতায় ঘাসে :
কালো ছায়াগুলো
কানাকানি করে, মুচকি হাসে।
অবোধ জ্যোছনা
মানে না শাসন, জানালা খোলা
রাত্রির দেহে তুলেছে প্রবল
ঝড়ের দোলা।
সন্ধেবেলায় দেখেছি একটি
ছোট্ট মেয়ে
কালো মুখখানি
একবারও আমি দেখিনি চেয়ে।
হঠাৎ কী ক'রে
চাঁদ জেলে দিলো চাঁদ ঢেলে দিলো
দুর্বার রূপ
অঙ্গে-অঙ্গে জানালা খোলা।
আমি চেয়ে দেখি
ঘুমভাঙা এই রাত্রিবেলা।

চারটি কবিতা

নরেশ গুহ

মাঘ শেষ হ'য়ে আসে

মাঘ শেষ হ'য়ে আসে; ভোর হোলো হিমে-নীল রাত,
আলোর আকাশগঙ্গা ঢালে কতো উল্কার প্রপাত।
আনত ওষ্ঠের তাপ বসন্তের প্রথম হাওয়ায়।
তবু ক্লান্তি চোখের চাওয়ায়।
দিন ভ'রে ওঠে স্বাদে, ভরে রাত, তুমি কাছে নাই।
বসন্তের বাতায়নে মাঘের রাতের শীত একলা পোহাই।

জিজ্ঞাসা

মনের ধেয়ানে নেই নেই চাঁদ তারা নেই
নেই আর জানালায় আলো আসা।
সকলি কি দিতে পারে ধরণীর এক কোণে
কন্যার এতটুকু ভালোবাসা ?

পৃথিবীর পথে

আলোক পায় না সাড়া চোখের তারায়
এখনি যে কতো কিছু হারালেম।
চোখ মেলে দৃশ্যের মিছিলে মেলায়
ভিক্ষুর দীন হাত বাড়ালেম।
অনেক গানের শুধু প্রথম চরণ
শুনেছি তো অচেনা গলায় ;
কতো নৃত্যের যেন প্রথম আবেগ
উদ্ধত মেয়ের চলায়।

যারে ভালো লেগেছিল, কখনো যে তবু
আনে নাই চোখে তার প্রেম
তার কালো পক্ষ্মের অকারণ কাঁপা—
দুর্লভ ছবি—হারালেম।
দুপুরের আকাশের যে-মেঘের কণা
ভেঙে যায়, জ'মে ওঠে ফের।
তার লঘু চপলতা, অলস খেয়াল
ভাসবে না সমুখে চোখের।
জীবনের ক্লান্তির জল ঠেলে ঠেলে
উঠি যদি কারো ঘরে শেষে,
দেখবো না হাসে কিনা সে-চোখের তারা
ঝলে কিনা অকারণ শ্লেষে।
মেলা শেষ হ'য়ে গেলে ঘরে যাবে সবে
দল বেঁধে, কেউ যাবে একা।
আঁধার নদীর চরে মেলা অবসান
সে মিছিল হবে নাকো দেখা॥

সরাইখানা

বাদলের সুরে চমকে তাকাই, চেনা মনে হয়!
চোখে স'য়ে যাওয়া বিবর্ণ রাত—এ নয় এ নয়।
কুন্তলে কালো জল ঝরঝর—মনে পড়ে নাকি?—
কতকাল পরে ফিরেছে হারানো ঝড়ে-পড়া পাখি!
কোন গাছে তার বাসা ছিল, কোন নদীর তীরে?
জারুল? কদম? বুক পেতে শুতে এসেছে ফিরে।
কোথায় সে-গাছ? সে-নদী কোথায়? চড়ার বালি।
উত্তরে পূবে বাজে ঝঞ্ঝার কী করতালি!

কতো বর্ষার ধারে কেটে গেছে পুরোনো সে-তীর।
ধীরে ব'হে যায় দূরে গতপ্রাণ সে-ভরা নদীর।
ছেঁড়া কাগজের টুকরো এবং শুকনো পাতায়
স্রোতোহীন জল নামে বিষণ্ন পঙ্কিলতায়।
মাঠের ঘাসের, নীল আকাশের ধার ছুঁয়ে নয়;
পাথরে বাঁধানো তীরতলে বয় ভিন্ন সময়।
সরাইখানার খোলা জানালার পাণ্ডু আলোয়
পেয়েছি আবার মন ভোলাবার বানানো ভালোয়॥

ইতিহাস

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখেছিলাম।
শিকারী মাছরাঙা লুকিয়ে এসে তীরবেগে জলে পড়ল,
তারপর ডানা ঝট্‌পটিয়ে চ'লে গেল তার নিভৃত নীড়ে।
আবার সব চুপ।
চুপচাপ ধ্যানী বকের মতো শান্ত মধ্যাহ্ন।

দেখেছিলাম।
মৃত্তিকা এখানে তার বিস্তীর্ণ অরণ্য নিয়ে সবিতা পিতার কাছে শঙ্কিত।
যেন এক ব্যাঘ্রমাতা
লুকোতে চায় তার শাবকটিকে আপনার দেহান্তরালে
ব্যাঘ্র-পিতার লালসাকরোজ্জ্বল তীব্র দৃষ্টি থেকে।
তবু সে-শাবক থেকে-থেকে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে,
দেখতে চায় বিধাতার দান তার অবাধ অগাধ পৃথিবী।
তাই দেখি বন্দী সরোবরের বক্ষে
উদ্বেল একটা বেগ এলো আচম্বিতে
ডাহুক-ডাকা মধ্যাহ্নের তীরে-তীরে কাঁপন জাগিয়ে
দুলে-দুলে উঠল কার অর্ঘ্য—একটি পুজোর ফুল!
হয়ত কোন্ অন্তঃপুরের অন্তশ্চারিণী
চুপি-চুপি এসে অলক্ষিতে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে
তাব বন্দিনী জীবনের গোপন ইতিকথা।

হায়, দীপা,
এত ক'রেও তুমি লুকোতে পারলে না নিজেকে।
ভেসে-আসা পুজোর ফুল—তারও শেষটায় গতি হ'লো
সেই আদিকালের আদিমতম তরঙ্গের উদ্বেলতায়!

এই তো তোমার ইতিহাস, দীপা!

সিনাই-খাড়ির ধার

Charles Kingsley-র "Sands of Dee" কবিতার অনুবাদ

অশোকবিজয় রাহা

"ও মুংলি যাও যাও গাইকে ডাকো ঘরে
যাও গাইকে ডাকো ঘরে
যাও গাইকে ডাকো ঘরে
সাগর-পারে সিনাই খাড়ির ধার ;"
ঝোড়ো হাওয়া আসছে ছুটে ঢেউয়ের ফেনায় ভ'রে—
মুংলি বুঝি একলা হ'লো পার !

ঝড়ের সাথেই জোয়ার এলো বেয়ে তটের বালু
এলো ছেয়ে তটের বালু
এলো ঘিরে তটের বালু
যতদূরে তাকাই চারিধার ;
আঁধির ধোঁয়ায় হারিয়ে গেলো সাগর-পারের ঢালু,
ঘরে সে তো ফিরল নাকো আর !

"ভাসছে ও কী ? শ্যাওলা না মাছ ? কার মাথার এ-চুল—
আহা কার সোনালি চুল
আহা কোন মেয়েটির চুল
জেলের জালে আটকালো এইবার ?
সোনালি মাছ কবে এমন চক্ষে লাগায় ভুল,—
কে দেখেছে সিনাই-খাড়ির ধার ?"

ডিঙি বেয়ে আনল তারে ঢেউয়ের ফেনার 'পরে
ও সেই কুটিল ফেনার 'পরে
ও সেই করাল ফেনার 'পরে
সাগর-তীরের কবরে শেষবার,
আজো তারা শোনে সে তার গাইকে ডাকে ঘরে
সাগর-পারে সিনাই-খাড়ির ধার।

অচল চূড়া

অশোকবিজয় রাহা

মেয়েটি চূড়ার কাছে
সারাদিন দাঁড়িয়ে আছে
ছেলেটি পথের পাশে
কেবলি দেখছে তাকে,
এসেছে মেঘলা ক'রে
দু' ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে
মেয়েটি যায় না স'রে
ছেলেটি দাঁড়িয়ে থাকে।
নিচে ঐ নকশা কাটা
দেখা যায় বাগান ছোটো
জানালার ফ্রেমে আঁটা
ছোটো এক সবুজ ফোটা,
সোনালি ফুল যে কত
ফুটেছে তারার মতো
রূপালি চুমকি যত
বসানো লতার ফাঁকে।

এখনো চূড়ার কাছে
মেয়েটি চেয়েই আছে
পাশে ঐ পামের গাছে
পাতারা কাঁপছে হাওয়ায়,

ছেলেটি তেমনি ক'রে
দাঁড়িয়ে পথের 'পরে,
কী আকুল দৃষ্টি ঝরে
দু'জনের চোখের চাওয়ায়।
এদিকে সকাল থেকে
নগরের ব্যস্ত প্রহর,
জনতার স্রোতের বেগে
সারা পথ ত্রস্ত মুখর
এরা তা দেখতে না পায়
এরা তা জানতে না চায়
দু'জনের দিন কেটে যায়
কী-যে এক স্বপ্নে পাওয়ায়।

বিকেলে মেঘের কোলে
আকাশে সূর্য ঢলে
সোনালি আগুন জ্বলে
চূড়ার ঐ কাচের ঘরে।
মেয়েটি হেলছে যেন
ছেলেটি দুলছে যেন
মেয়েটি বলছে যেন
'এসো আর একটু স'রে!'
দুটিতে মিলবে না কি?
মেয়েটি যাক না নেমে,
ছেলেটি করছে বা কী?
কেন ও রইলো থেমে?

জীবনে আজ দু'জনের
এলো ডাক পরম ক্ষণের
কে তবু মন্ত্রে এদের
রেখেছে পাথর ক'রে ?

শুভখন যায় যে ব'য়ে
তবু হায় কিসের ভয়ে
দু'জনে পাথর হ'য়ে
দাঁড়িয়ে রইলো একা ?
মেয়েটির করুণ ঠোঁটে
কী কাতর কান্না ফোটে
ছেলেটির আতুর চোখে
কী আকুল তৃষ্ণা-লেখা !
কবে কোন শিল্পী এদের
গড়েছে কেউ জানে না,
বুকে ঐ শ্বেত পাথরের
মুছে যায় কালের ফেনা,
দেহের ঐ কঠিন কারায়
কত কাল বন্দী যে হায়,
ফোটে না পাথর-কায়ায়
হৃদয়ের রক্তরেখা !

কত যুগ মৌন তারা
কত যুগ নিমেষ-হারা
রূপের ঐ পাষাণ-কারায়
বিরহের বন্দী দু'টি !

ও দু'টি তরুণ কায়ায়
ওরা কি মিলবে না হায়,
বেঁধেছে মন্ত্র-মায়ায়
পাষাণের কঠিন মুঠি ?

চিরকাল এমনি ক'রে
ছেলেটি রইবে চেয়ে ?
চিরকাল চূড়ার 'পরে
দাঁড়িয়ে দেখবে মেয়ে ?
কোনো এক জ্যোৎস্নারাতে
দু'টিতে জড়িয়ে হাতে
পাশের ঐ সবুজ মাঠে
এরা কি পায় না ছুটি ?
আকাশে মেঘ টুটেছে
তারাদের ঝাঁক উঠেছে
ছোটো এক চাঁদ ফুটেছে
পামের ঐ পাতার ফাঁকে,
মেয়েটি হাসছে এবার
হাওয়াতে ভাসছে এবার
এগিয়ে আসছে এবার
ছেলেটি ডাকছে তাকে।
মেয়েটি আসছে নেমে
মেলে দুই স্বপ্ন-পাখা,
ছেলেটির সামনে থেমে
হাসে, মুখ জ্যোৎস্নামাখা।

লঘু এক মেঘ উড়িয়ে
ঢাকে চুল ওড়না দিয়ে,
ছু'জনে ফুল ছড়িয়ে
নেমে যায় পথের বাঁকে।

সারা রাত মনের মতো
বুনে যাই স্বপ্ন যত
শুয়েও ভাবছি কত,
এবারে ভুলতে হবে,
তবু যে ঘুম আসে না,
ওরা কি ঘর যাবে না ?
মেয়েটির ঘুম পাবে না ?
ছেলেটি চেয়েই র'বে ?
জানি এ ভাবনা মিছে
তবুও মিছেই ভাবি,
এড়াবার উপায় কী যে
ওরা যে জানায় দাবি।
মিছেই ছু'চোখ বুজি,
মিছেই ভুলতে খুঁজি,
মেয়েটি কাঁদছে বুঝি,
ছেলেটি কাঁদবে তবে ?

মুহূর্ত

মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন সকালবেলা একফালি ফাল্গুনী রোদ
বাঁকা এসে পড়েছিল তোমার গায়ে,—
তখন পথের মোড়ে একগোছা বই নিয়ে হাতে
উঠছিলে ত্রস্তে বাস্-এ।
ট্রাম থেকে আমি দেখলাম,
শাদা শাড়ি, ফিকে-নীল ব্লাউজের আভা,
ধুলোহীন রোদটুকু পৃথিবীকে মাখিয়েছে বাসন্তী রং,
বাসন্তী রোদ মাখা তোমার শরীর।

তারপর ছুজনের বিপরীত চলার হাওয়ায়
ট্রাম, বাস স'রে গেল, ছেড়ে দিল পথ
কর্নওআলিস স্ট্রীটে জনতার ঘেঁষাঘেষি ভিড়ে,
মুহূর্তে হারায়ে গেল বসন্তের রঙ।
তবুও যখনি ফের ট্রামে ক'রে ঐ পথে যাই
উৎসুক চোখ নিয়ে চেয়ে দেখি, আজো বাস-এ উঠছো কি তুমি।

আসমানী

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দম দিই। তেতলার শেষ সিঁড়িখানি
এখানে থেমেছে। জানালায় আসমানী
রঙ, চৌকো আকাশ।
পাতার মর্মর—নীল—সমুদ্র-আভাস।

সূর্য গিয়েছে চলে, আবার হেমন্তে
গানের কলির মতো ফিরবে।—সাড়ে-ছয়—সন্ধে।
মন্দির-দেউল নয় হৃদয়ের স্রোত শুধু বাজে
নানা সুরে : না, না, আসা হয় কাজে।
দম নিয়ে ভাবছি, কেবল ভাবছি
মনে-মনে আউড়ে নিই : এই যে, কেমন আছো ?
শার্শিতে নীল একটা মাছি !

আবার হারিয়ে যায়।
রেশমের মতো এই আলো
সন্ধ্যার মিনার বেয়ে কেঁপে-কেঁপে উড়ে যায়।
একদিন, মনে আছে, ভালো-
বেসেছিলে ? মন দিয়ে, দেহ দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আর—
যাক, কী-দরকার সে-কথা কইবার ?

শুধু এই সিঁড়ি ভেঙে খানিক হাঁপাই
দূরে বড় রাস্তা : ট্রামের স্পষ্ট শব্দ পাই।
মাছিটা গিয়েছে উড়ে, জানালার চৌকো আকাশে
খেয়ালী আসমানী রঙ একান্তই মুছে-মুছে আসে।

দম নিয়ে আবার হাঁপাই।
কাজ কী দেখায় ? কাজ কী ?—পাই কি না পাই।
ফিরে চলি।
মনে-মনে কী যেন চেষ্টা চলে। বলি
তোমার চোখের চেয়ে আরো ধূর্ত আছে
চৌকো জানালার পাশে, বর্ষার সুগন্ধের কাছে
বিবেকের পাশেও হাঁটে না
এ-জীবন জেনেও জানে না।
নির্বিকার অতিশয়
সে—সময়।

উপরের দরজা খুলে যখন আসবে
অন্ধকারে আসমানী রঙ নেই : কে যেন কাশবে।
শ্রাবণের নারকেল-পাতার মর্মরিত বিহ্বলতা
সমুদ্রের অসীম শূন্যতা
সময় বাজাবে একতারা—
সিঁড়ি দিয়ে কত মুখ উঠে আসবে : কারা ?

তারা আর কেউ নয়
তোমারই অনেক ছবি। সময়ের অপব্যয়।
তবু তোমাকে গড়েছে কৈশোরে-যৌবনে
আবার বানাবে বার্ধক্যে-জরায়। অন্ধকার শোনে
প্রতিধ্বনি।
আমি তখন কোথায় ?
    এই যে শেষ সিঁড়ি।
        বাইরে আকাশ
            রঙ—নীল আসমানী।

অন্য কোনোখানে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

বঞ্চনার তীক্ষ্ণ হাত ছেঁড়ে যবে আমার হৃদয়
ছলনা-নীলাঞ্চলে মুখ ঢেকে তখন বোধ হয়
বিদ্রূপে বিষাক্ত হাসি সর্বনাশী মৌনমুখে উঠেছিল হেসে
ঘৃণার ঘোরালো জলে ঘোলা হ'য়ে সব প্রেম গেছে বলে ভেসে—
সে কোন্ নিষ্ঠুর বুক চেনা তারে শক্ত বেশি নয়
গ্র্যানাইটে গড়া জানি সে তোমার ছোট ও-হৃদয়।

তোমার উন্মুখ বুক হয়তো পেয়েছে খুঁজে নতুন আশ্রয়
নতুন সূর্যের করে কর-কম্পনের নতুন আহ্লাদ
নবতর উষ্ণতার স্বাদ অন্য-এক নতুন প্রশ্রয়
অনায়াসে পেতে পার এই সব কিন্তু আর এর বেশি নয়।
মোটের উপর দেখো তাহ'লেও বহু কিছু পড়ে যাবে বাদ
ফিকে যবে হ'য়ে যাবে অধুনার মধুময় নতুন আস্বাদ।

অত্যকার পদ্যপূর্ণ প্রেমের মহড়া আর স্মৃতির সংলাপ
দেখো পরে মনে হবে যা হয়েছে অতিকৃতি, অশ্লীল প্রলাপ—
বস্তু হ'তে দূর এরা, সত্য হ'তে দূর এরা, এরা অপলাপ।

একদিন বলেছো যা রতি-দীর্ঘ প্রহরের তারকিত চন্দ্রাতপ-তলে
অন্য অঙ্কে শুয়ে ফের আবার তা বলবে কি, হে বঞ্চকী, অভিনয়-ছলে ?
পালঙ্কের অঙ্কে কোনো ছোট এক দৃশ্য তুমি শেষ হ'লে মামুলি প্রথায়
এখন নতুন কোনো শিহরণ প্রতীক্ষিছে তোমা তরে অন্য কোথায়।
অন্য জ্যোছনায় চেনো অন্যতর বিহ্বল মুখ অন্য কোনো ছোঁয়ার ম্যাজিক,
অন্য শয্যা, অন্য বাহু-উপাধান-তল, অন্য কারো রাত্রির সুরার শরিক।

পুরী

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

১

পুরী।
আমার স্বপ্নে-দেখা পুরী।
কী অপরূপ সমুদ্র
সূর্যাস্তের আলোয় প্রশান্ত, গম্ভীর।
কিন্তু সমুদ্রের চেয়েও অপরূপ
সমুদ্র কি আকাশের চেয়েও অনেক গভীর
সমুদ্র কি আকাশের চেয়েও রহস্যময়ী
একটি মেয়েকে আমি দেখেছিলুম
নীলিমা-রহস্য-ঘেরা যার ক্ষীণতম কটি ;
সূর্যাস্তের আলোর চেয়েও কোমল তার হাসি
সূর্যাস্তের আলোর চেয়েও রহস্যময় ;
সমুদ্রের উদাত্ত গম্ভীর গানের চেয়েও তার কণ্ঠ ঐশ্বর্যবান।
সন্ধ্যার চেয়ে, সন্ধ্যার সমুদ্রের চেয়েও সে বিচিত্র।

সেদিন সমুদ্র থেকে, আকাশ থেকে আমি চোখ
ফিরিয়ে নিয়েছিলুম
সমুদ্র আর আকাশের মাঝে একটি নীল, প্রদীপ্ত বিন্দুর দিকে—
ধূলির বিন্দু, সমুদ্র কি আকাশের চেয়েও অনেক,
অনেক ঐশ্বর্যময়ী।
সমুদ্র কি আকাশের চেয়েও মহীয়সী।

সেদিন সমুদ্রের হাওয়া হা-হা ক'রে হেসেছিল।

২

পুরী।
আমার স্বপ্নে দেখা পুরী।
আকাশের দিকে দেবতার মন্দির উঠে গেছে
মানুষের স্পর্ধার মতো।
এখান থেকে সমুদ্রের গান শুনতে পাওয়া যায়
সমুদ্রের হাওয়া এখানে আসে।
দেবতার মন্দির,
যাত্রীর ভিড়,
পুণ্য এখানে পণ্যের মতো বিক্রীত।
মন্দিরে আসবার পথের দু' পাশে,
মন্দিরের সম্মুখে,
অগণ্য আতুরের ভিড়,
দেবতার আশীর্বাদে যাদের অঙ্গ গেছে খসে',
কারও হাত নেই, কারও চোখ নেই।

মানুষের স্পর্ধার উপর সুতীব্র বিদ্রূপ।

এদের মধ্যেও আমি একটি মেয়েকে দেখেছিলুম
নীল সমুদ্র যার দেহকে ঘিরে রাখেনি রহস্যের মতো,
যার চোখের দৃষ্টি মৃতের মতো ম্লান,
অপরিচ্ছন্ন দাঁত, রক্তহীন পাণ্ডুর হাসি,
অবিন্যস্ত, রুক্ষ কেশ,
ধূলি-ম্লান নীরস যৌবন ;
সমুদ্রের গভীর রহস্য মিলিয়ে গেছে,
ধূ-ধূ করছে অনুর্বর মরুভূমি।

আমরা মহান্ !
আমরা আকাশ ছুঁয়েছি, সমুদ্রের গভীরতা স্পর্শ করেছি !

সমুদ্র কি আকাশের চেয়ে অনেক, অনেক রহস্যময়ী
একটি মেয়েকে আমি দেখেছিলুম
সমুদ্র কি আকাশের চেয়েও মহীয়সী।

সমুদ্রের হাওয়া সেদিন হা-হা ক'রে হেসেছিল।

মনের কথা

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

মনের কথা ঢুলিত যদি অশোক-তরু-শাখে,
ঢুলিত যদি নদীর ছলছলে,
ঢুলিত যদি উদাস-করা ঘুঘুর ডাকে-ডাকে,
বাতাসে-দোলা কমল দলে-দলে,
ঢুলিত যদি অশথে বটে লতার সাথে-সাথে
ঢুলিত যদি আকাশ-গাঙে চাঁদিনী রাতে-রাতে,
অথবা ঘন বাদল-বুকে অঝোর ধারা-পাতে
গোপন হ'য়ে একেলা উপবনে—
তাহ'লে তারে আহরি' আনি' স্বপন-তুলিকাতে
দিতাম রাখি এ-মনে সযতনে।

মনের কথা কাঁপিত যদি তৃণের ফুলে-ফুলে,
কাঁপিত যদি দখিনা বায়ু সনে,
কাঁপিত যদি বারিধি-বুকে যেথায় দুলে দুলে
লহরী-মালা উঠিছে অকারণে,
কাঁপিত যেথা রঙিন-পাখা উড়িছে প্রজাপতি,
দূর্বাশিরে শিশিরে যেথা পরায়ে দেয় মোতি,
অথবা উষা-নভের গায়ে কোমল যেথা জ্যোতি
আপন মনে একেলা ছায় ধীরে—
তাহলে তারে আহরি' আনি' যতন করি' অতি
দিতাম রাখি' মনে সে-কথাটিরে।

মনের কথা খেলিত যদি কিশোরী-আঁখি-তটে,
খেলিত তার কবরী ঘিরে-ঘিরে,
খেলিত তার হিয়াটি জুড়ি কনক ছুটি ঘটে,
খেলিত তনু-তনিমা-তীরে-তীরে,
খেলিত যদি স্বপন-সম অধর ছুটি-পাশে,
খেলিত যদি মৃণাল-সম বাহুর ছোঁয়া আশে,
অথবা তার চলন ঘিরি' কমল যেথা হাসে
কোমল তার চরণ-তালে-তালে—
তাহ'লে তারে আহরি' আনি' প্রেমের মধু-পাশে
দিতাম রাখি' মনের মণি-জালে।

মনের কথা ভাসিত যদি সুদূর দূর-গানে,
ভাসিত যদি উজল তারা-মালে
সারাটি নিশি যেথায় তারা গহন কার ধ্যানে
বিরতিহীন আরতি-দীপ জ্বালে,
অথবা যদি ভাসিত ঐ সুদূর নীহারিকা
যেথায় চির জ্বালায়ে আছে আপন আলো-শিখা,
অথবা দূরতম যে নভে কে এক অনামিকা
ভাসিত যদি তাহারি বুকে মুখে—
তাহ'লে তারে আহরি' আনি' সে মোর স্বপনিকা
দিতাম রাখি' এ-মনে গাঢ় সুখে।

হায়রে আজি মনের কথা কোথায় গেছে মম
খুঁজিয়া তারে মিলে না ত্রিভুবনে,
সুদূরতম দূরের আশা কি এক অরি সম
ঘেরিয়া আছে একক প্রাণে মনে ;

সে এক আশা সুদূর হ'তে সুদূরতম পথে
বাহিয়া নিয়া চলিয়া যায় সকল মনোরথে,
সকল তৃষা ভাঙিয়া পড়ে দু'ধারে শতে শতে
গভীর কার অধীর কোন আশে—
মনের কথা খুঁজিছে আজি কোন সে অনাগতে
গহনতম গোপন কার ভাষে!

বিদেশী সাহিত্য

বর্নার্ড শ : এইচ. জি. ওএলস

জর্জ বর্নার্ড শ নব্বুই বছরে পা দিলেন। এত দীর্ঘকাল সশরীরে টিঁকে থেকেছেন পৃথিবীর খুব কম লেখকই। লেখার কাজের পরিশ্রম অত্যন্ত কঠোর, আর-কোনো কাজই বোধহয় সমস্ত মনঃশক্তির এমন নিবিড় ও সুদীর্ঘ একাগ্রতা দাবি করে না, বোধহয় লেখাই একমাত্র কাজ যাতে, এজরা পাউণ্ডের ভাষায়, 'one has to use one's damned brains all the time'; আর সেইজন্য এটা খুবই সম্ভব মনে হয় যে এক-একজন লেখক নিছক জীবহিশেবে যতদিন বাঁচবার মেয়াদ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন, তাঁদের অনেকেরই আয়ু ফুরিয়ে যায় তার আগেই। ব'সে-ব'সে কাজ করতে হয় ব'লে ব্যাধিজরারূপ ব্যাধের শিকারও হন তাঁরা সহজে। সংসারে সাধারণত আশির বেশি বয়সের অনেক মানুষর দেখা যায়—বাংলা দেশের কথা ভেবেই বলছি—হেঁটে-চ'লে খেয়ে-দেয়ে যারা আছে ভালোই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সত্তরের কাছাকাছি এসেই প্রায় অচল হ'য়ে পড়েছিলেন কেন? আর ঐ আশ্চর্য স্বাস্থ্য নিয়ে ও-রকম দীর্ঘায়ু বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, শারীরিক পরিবেশের সর্বাঙ্গীণ অনুকূলতা আজীবন ভোগ ক'রেও মাত্র আশি বছর বয়সে মরবারই বা তাঁর কী হয়েছিলো? মহর্ষি পিতার বা দার্শনিক অগ্রজের আয়ু যে তিনি পেলেন না এর কারণ নিশ্চয়ই সাহিত্যরচনার সুতীব্র ক্ষয়কারিতা।

বর্নার্ড শ-র নব্বুই বছর এইজন্যই সাহিত্যপ্রেমিকের আনন্দের একটি উপলক্ষ্য। জীবন ভ'রে তিনি যা লিখেছেন তার অন্তিম মূল্য সম্বন্ধে এ-যুগের বিচারক যতই না সন্দিহান হোন, শেষ পর্যন্ত এ-কথা মানতেই হয় যে শেক্সপিঅরের পর তিনিই ইংরেজি ভাষার মহত্তম

নাট্যশিল্পী, শেক্সপিঅরের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান দুস্তর হ'লেও মাঝখানে আর কার কথা আমরা ভাবতে পারি? সে যাই-হোক, সম্প্রতি তাঁর জীবনের চিত্রলতাই উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিলো সমস্ত পৃথিবীর চোখে। তাঁর জীবন, তাঁর ব্যক্তিত্ব, এ-ই তো বর্তমান সময়ের আশ্চর্য একটি আদর্শ, এবং ইতিহাসেও তা-ই হ'য়ে থাকবে। বর্নার্ড শ-কে মনে হয় সেই সব ইতিহশ্রুত বীরোত্তমদের অন্যতম, আপন জীবনের যাঁরা অবিসংবাদিত বিধাতা। তাঁর আয়ু, তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর মনের দুর্বার উল্লম্ফনশক্তি, এই সমস্তই মনে হয় তাঁর নিজের কাছে নিজের প্রতিজ্ঞাপূরণ, তাঁর সমস্ত জীবন যেন স্বহস্তে নিয়ন্ত্রিত। দীর্ঘজীবন না-হ'লে তাঁর চলতো না, কেননা অসাধারণত্বের অপরাধে তাঁর নাট্যকার-জীবন আরম্ভই হয়েছিলো প্রায় চল্লিশে; বীজাণুর অনাক্রমণীয় দেহও তাঁর চাই, কেননা একবার পায়ের ঘা নিয়ে ডাক্তারদের হাতে বছরখানেক যন্ত্রণাভোগের পর সেই যে পণ করলেন জীবনে আর ডাক্তার দেখাবেন না, সে-পণ রক্ষা করা চাই তো। নব্বুই হোক আর যা-ই হোক, যত দিন বেঁচে থাকবেন জিভে আর কলমে যুবকোচিত ধার না-থাকলে তাঁকে মানাবে কেন; সে-ধারটুকুও তাই জিইয়ে রেখে দিয়েছেন, এখনও তিনি কোনো কথা বললেই ঝাঁঝ পাওয়া যায়। বয়সে বুড়ো হলেন বর্নার্ড শ, কিন্তু মৃদু হলেন না, শান্ত হলেন না, ধ্যানী হলেন না—আমাদের রবীন্দ্রনাথর অবিকল বিপরীত তিনি, তাঁর সদৃশ খুঁজতে হ'লে এক ভলতেআরকে মনে পড়ে; এই ফরাশি বাচস্পতিও নব্বুই পার করেছিলেন, তবু স্বাস্থ্য ভাঙেনি, পরিহাস-প্রবণতার হ্রাস হয়নি, এমনকি জীবন-ক্ষুধাতেও নাকি মন্দা পড়েনি। এ-দু'জনের মধ্যে তুলনা করলে বরং শ-কেই একটু যেন স্তিমিত লাগে।

এইচ. জি. ওএলসও শ-র বিসদৃশ নন। তাঁর মনও প্রধানত বহির্মুখী; মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ে অফুরন্ত উৎসাহের সঙ্গে মিলেছিলো কাগজের উপর অবিশ্রান্ত অক্ষর

আঁকবার প্রায় অতি-মানুষিক ক্ষমতা, দ্রুতচল মস্তিষ্কের সঙ্গে নিত্য-গতিশীল লেখনী। সারা জীবনে যত সহস্র পৃষ্ঠা, যত কোটি শব্দ তিনি লিখেছেন এবং ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন, এমন বোধহয় এ-যুগের আর-কোনো ইংরেজ লেখকই করেননি: তাঁর প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক নিশ্চয়ই, যার মধ্যে ক্ষীণকায় কোনোটিই প্রায় নয়। 'বৈজ্ঞানিক' উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, ছোটোগল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, আত্মজীবনী—এই সমস্ত ক'রে উঠেও তিনি সময় পেতেন বালরঞ্জন ক্রীড়া উদ্‌ভাবনের কিংবা দৈনিক পত্রে সরোষ বাক্‌বিতণ্ডার। চলতি কালের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনে যত চিন্তা, যত সমস্যা, যত আন্দোলন প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছিলো, তার প্রত্যেকটাই প্রতিফলিত হয়েছিলো যথাসময়ে তাঁর রচনায়: এমনকি, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ওএলস ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার গৌরব পর্যন্ত নিয়েছেন—সকলেই জানেন যে এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক আর অ্যাটম-বোমা, এই তিনটিই বাস্তবে আবির্ভূত হবার আগে প্রতিভাত হয়েছিলো তাঁর কল্পনায়।

বিশ শতকের দুয়ার যখন খুলে গেলো, সুইনবর্ন, মেরেডিথ, হার্ডি, তখনো বেঁচে, কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান পুরুষরূপে নূতন কয়েকটি নাম তখনই গুঞ্জিত হ'য়ে ফিরছে—সে-গুঞ্জন সুস্পষ্ট হ'লো প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই, এবং সে-যুদ্ধের পরে উচ্চণ্ড হ'লো। শ, ওএলস, গলসওর্দি, বেনেট আমাদের ছাত্রবয়সে এঁরাই ইংরেজি সাহিত্যের দিক্‌পাল, এঁদের খ্যাতির চরম লগ্ন তখন, সেইন্ট জোন, আউটলাইন অব হিসট্রি, ফোরসাইট সাগা আর পাঁচ শহরের উপন্যাসরাজি, সবই প্রকাশিত হ'য়ে গেছে, লরেন্স কিংবা হক্সলির অভ্যুত্থান তখনো হয়নি। সে-সময়ে একজন ইংরেজ লেখিকা সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছিলেন এঁদের: এঁরা যেন দরাজ হাতের, খরচে স্বভাবের, খোশমেজাজি খুড়ো, প্রায়ই দেখা করতে আসছেন আমাদের সঙ্গে, তাড়াহুড়োয় হাঁপ-ধরা, উপহারের ভারে ফেটে পড়ছেন যেন।

আমরা, যারা তখন ছোটো ছিলাম, সেই-সব উপহারের বিচিত্র বহুলতার কথা ভেবে আজীবন কৃতজ্ঞ না-থেকে উপায় নেই আমাদের।

জনগণের মন অন্যদের চাইতে ওএলস বোধহয় দখল করেছিলেন বেশি; তাঁর জনপ্রিয়তা কিপলিঙের মতোই উপকথার বিষয়। অবশ্য সুয়েজ-খালের পুবে কিপলিঙের সত্যকার পশার যেমন অসম্ভব, তেমনি অবাধ ছিলো ওএলসের জন্য আমাদের হৃদয়ের অভ্যর্থনা। তাঁর মুখে আমরা শুনলাম গণতন্ত্রের আর সমাজতন্ত্রের জয়-জয়কার—আর সে-সব কথা তিনি বললেন শ-র মতো তির্যক ভঙ্গিতে নয়, উচ্চহাসির হেঁয়ালিতে নয়—বললেন গম্ভীরভাবে, অথচ প্রাঞ্জল ও সুন্দর ক'রে, প্রতিভাশালী শিক্ষকের মতো: তাঁকে মনে হ'লো আমাদের 'বন্ধু,' যুগধর্মের দীক্ষাগুরুর আসনে তাঁকে বরণ করলো বাঙালি যুবসম্প্রদায়, দেশে এ-ধারণা ছড়িয়ে পড়লো যে ওএলস না-পড়লে শিক্ষাই সম্পূর্ণ হ'লো না, তাঁর নতুন-নতুন বইয়ের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে হাঁপিয়ে উঠলো কলেজের ভালো-ভালো ছেলেরা।

ভাবতে গেলে, ওএলস-এর সাহিত্যিক জীবনের নিরঙ্কুশতা বিস্ময়কর। তাঁর মৃত্যুর পরের দিন শ-র যে-স্মারকলিপি সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছে তাতে তিনি সুন্দর বলেছেন যে ওএলস একজন 'spoilt child—the most completely spoilt child I have ever known.' গরিবের ঘরে জন্মাবার সুবিধে পেয়েছিলেন তিনি, গরিবের ঘরে অসাধারণ ছেলের অসাধারণ যত্ন নেয়া হয় ব'লেই এটা সুবিধে। বাপ মালি এবং 'মিস্টর'-উপাধি-বঞ্চিত পেশাদার ক্রিকেট-খেলোয়াড়, মা কোনো-এক ধনী গৃহে হাউসকীপর। মা-বাবা একটি চিনে বাসনের দোকান চালাতেন, তারই রাস্তার তলাকার ঘরে ব'সে বাচ্চা-ওএলস ফুটপাতের একটি ফাটল দিয়ে দেখতো রাস্তার লোকেদের জুতোর তলা—লক্ষ্য করতো যে তার বেশির ভাগই পুরোনো, ক্ষ'য়ে-যাওয়া। এ-থেকে কেউ যেন অত্যন্ত সহজে ভেবে না বসেন যে

দারিদ্র্যের সঙ্গে, হীন অবস্থার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ক'রে-ক'রে আস্তে-আস্তে তাঁকে উঠতে হয়েছিলো : না—শ বলছেন যে এইচ. জি. এক লাফেই উঠেছিলেন একেবারে তলা থেকে একেবারে উঁচুতে, কোথাও বাধা পাননি, কোথাও হোঁচট খাননি। জীবিকা উপার্জন তিনি আরম্ভ করেন কাপড়ের দোকানের কর্মচারী হ'য়ে, তারপর স্কুলমাস্টারি করতে-করতে সরকারি বৃত্তি নিয়ে লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অব সায়ান্সে টি. এইচ. হক্সলির ছাত্র হলেন, পাশ করলেন বি. এস-সি., আর তারপর যেই লিখতে আরম্ভ করা, সঙ্গে-সঙ্গে সিদ্ধি এলো অবিশ্বাস্য, দেশের রাজা-রাজড়া গুণী মানী সকলের দরজা অবারিত হ'লো তাঁর কাছে। শ তাঁকে 'spoilt child' বলছেন এইজন্যই : কোনো দুঃখ, কোনো বাধা পাননি ব'লে তাঁর মেজাজ ছিলো দারুণ অসহিষ্ণু, কোনোরকম মতভেদ সইতে পারতেন না, সামান্য কারণে তীব্র আক্রমণ করতেন হিতৈষী বন্ধুকেও, শ-কেও রেয়াৎ করেননি, বিএট্রিস ওএবকেও না, অথচ তাঁর স্বভাবে এমন-একটা অপরিবর্তনীয় প্রিয়ত্ব ছিলো যে কেউ কিছু মনে করতো না, বন্ধু-বিচ্ছেদ হ'তো না। শ বলছেন : 'এইচ. জি. আমাকে বলতেন স্নব, বলতেন তৈরি-করা ভদ্রলোক ; আমি উত্তরে বলতাম যে জমিদার-শ্রেণীর কনিষ্ঠ পুত্রদের যে-দুশ্চিকিৎস্য দারিদ্র্য ভোগ করতে হয়, যে-রকম ক'রে উচ্চ বংশের মানমর্যাদা বজায় রাখবার চেষ্টা করতে হয় অর্থাভাব সত্ত্বেও, তার ভয়াবহতা তিনি তো কিছুই জানেন না।...এইচ. জি. একবেলা না-খেয়ে থাকেননি, নিষ্কপর্দক অবস্থায় কখনো রাস্তায় ঘুরে বেড়াননি, ময়লা জামা-কাপড় পরেননি, বেকার হননি কখনো, বাচ্চা-প্রডিজি হিশেবে প্রশ্রয়ই পেয়েছেন বরাবর।...তাঁর গল্প পেলেই সম্পাদকরা ছেপেছেন, তাঁর উপন্যাস পেলে প্রকাশকরা প'ড়ে দেখাও দরকার মনে করেননি : আর আমি পাঁচখানা মোটা-মোটা নভেল লিখে ন'বছর নীরন্ধ্র ব্যর্থতার মধ্যে ব'সে ছিলাম, তবে কোনো ভদ্র প্রকাশক তা ছুঁয়ে দেখতে রাজি হলেন। হ'তে-হ'তে আমার খোলশ লোহার

মতো শক্ত হ'য়ে গেলো, আর এইচ. জি. আদরে-আদরে হ'য়ে উঠলেন সাহিত্যিক কাচের ঘরের সবচেয়ে স্পর্শকাতর চারাগাছ।...ভদ্রলোক ছিলেন না তিনি, ভদ্রলোক কাকে বলে তা তিনি যে-কোনো লোকের চাইতে ভালো বুঝতেন, কিন্তু ভদ্রলোকের ভূমিকা তাঁকে মানাতো না, কোনো ভূমিকাই মানাতো না।...তাঁর ব্যবহার ছিলো ভদ্রলোকের নয়, দোকানের কর্মচারীর নয়, স্কুলমাস্টারের নয়, তাঁর ব্যবহার ছিলো তাঁরই। আর কী মনোমোহন মানুষ তিনি ছিলেন !'

শ-র এই বর্ণনার সঙ্গে ওএলস-এর সাহিত্যিক জীবন সহজেই মেলানো যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে এসেই তিনি দেশ ভাসিয়ে দিলেন 'বৈজ্ঞানিক' উপন্যাসে—জুল ভার্ন-এর চেয়েও অনেকটা বেশি বৈজ্ঞানিক—আমাদের দেশে বোধহয় তাঁর এই বইগুলিরই সমাদর হয়েছে সবচেয়ে বেশি, এ-গুলি বাংলায় অনূদিত, অপহৃত ও অনুকৃত হয়েছে, এবং আমাদের অন্তত একজন লেখক এ-ধরনের মৌলিক উপন্যাস লিখতেও কৃতকার্য হয়েছেন, তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র। এর পরে কিছুদিন মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার পরে ওএলস হাত দিলেন সামাজিক উপন্যাসে, খানিকটা ডিকেন্সের মতোই প্রবল প্রাণশক্তি, যদিও হাস্যরসে অনেকটা খাটো, চরিত্রসৃষ্টিতে তুলনাই হয় না। হু-হু ক'রে বিক্রি হ'তে লাগলো তাঁর বই, তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে প্রকাশিত আউটলাইন অব হিসট্রি একই সময়ে প্রকাশিত অচিরবিস্মৃত ইফ উইনটর কমস উপন্যাসের মতোই একটি সেরা-বিকিয়ে বই হ'য়ে উঠলো। তারপর তাঁর যে-বইটি নিয়ে খুব হৈ-চৈ হ'লো সেটি তাঁর সুবৃহৎ আত্মজৈবনিক উপন্যাস, ওঅর্লড অব উইলিঅম ক্লিসোল্ড—এ-বই পড়তে-পড়তে মনে হয়, বাবাঃ! ইনি বকতেও পারেন—আর তাতেও ক্ষান্ত না-হ'য়ে ১৯৩৪-এ প্রকাশ করলেন তাঁর এক্সপেরিমেণ্টস ইন অটোবাওগ্রাফি—অকপটতায় রুসোর প্রতিদ্বন্দ্বী। ইতিমধ্যে উপন্যাসের ক্ষেত্র থেকে স'রে এসে তিনি মন দিয়েছিলেন বিবিধ বিজ্ঞান নিয়ে বিশ্বকোষিক গ্রন্থ প্রণয়নে ও সম্পাদনায়, জুলিআন হক্সলির সহযোগিতায়

৮

সায়ান্স অব লাইফ, তারপর ওঅর্ক, ওএলথ অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস অব ম্যান—শক্ত-শক্ত বিষয় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হবার মতো প্রাঞ্জল এবং উপভোগ্য হবার মতো সরস ক'রে বলা, অন্তত এ-বিষয়ে ওএলস অদ্বিতীয় ; এবং বেন সিরিজ থেকে পেঙ্গুইন পর্যন্ত যাঁরা সর্বসাধারণকে সর্বজ্ঞান বিতরণ করতে অধুনা বদ্ধপরিকর, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তাঁদের উৎসাহের এইচ. জি. ওএলসই আদি উৎস।

২

বিশ' শতকের প্রথম চতুর্থের সর্বলক্ষণসম্পন্ন সন্তান এইচ. জি. ওএলস। বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, মানবহিতৈষী, প্রগতির উপাসক, গণতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত, বংশগৌরব কুলমর্যাদা রাজন্যবর্গের প্রতিশ্রুত শত্রু। (মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের বিরুদ্ধে একটি সুতীব্র আক্রমণ প্রকাশ করেছিলেন।) সেইসঙ্গে পৃথিবীব্যাপী মনস্বিতার আভিজাত্য তাঁর কাম্য ছিলো, বংশের বদলে বুদ্ধি, ধনশক্তির বদলে মনঃশক্তিকে সিংহাসনে বসালেই মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে, এ-কথা তিনি যখন প্রচার করতে আরম্ভ করলেন, তখন কোনো পাঠকই ভাবতে পারেননি যে এর ন্যায়সম্মত বাস্তব রূপ অল্ডস হক্সলি বর্ণিত ভয়াবহ ব্রেভ নিউ ওঅর্লড।' বস্তুত, হক্সলির ইউটপিআ ওএলস-এর (এবং কিছুটা বর্নার্ড শ-র) ইউটপিআর উদ্দেশে বিদ্রূপ : বিজ্ঞানের সংকীর্ণ বুদ্ধিকে একেশ্বর ক'রে তুললে মানুষের কী-দশা হবে, তারই 'বৈজ্ঞানিক' এবং বিশ্বাসযোগ্য ছবি হক্সলির বইতে আমরা দেখতে পাই। সংঘবদ্ধ ধর্মকে অস্বীকার ক'রেও ওএলস ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরকে স্থান দিয়েছেন, কিন্তু এ-কথা ভাবেননি যে ঈশ্বরের অলৌকিক সত্তা যদি না মানি, অথচ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর উপাসনা করতে থাকি, তাহ'লে কালক্রমে সে-উপাসনা গণ-নায়কের চরণেই পৌঁছবে, ডেমক্রেসির কাঁচা নাস্তিকতাই ডিকটেটরশিপের জন্ম দেবে। উনআশি বছরের জীবনে ওএলস

চোখের উপর দেখলেন তাঁর প্রত্যেকটি আদর্শের ব্যর্থতা ; বিজ্ঞানের ব্যর্থতা, গণতন্ত্রের ব্যর্থতা, সোশ্যালিজম-এর শোচনীয় পরিণাম, জড়বাদী বুদ্ধির সর্বনাশী স্বরূপ। অবশ্য কমিউনিজমকে তিনি আলিঙ্গন করেননি, কিন্তু করলেই বা কী হ'তো। কমিউনিজম কি কোনোখানে পরীক্ষিত হয়েছে ? আর যদি হ'য়েও থাকে, তার ফলে সমগ্রভাবে মানবজাতির দুঃখ-দুর্দশা এক তিলও কি কমেছে ? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরে সর্বস্বান্ত মানুষ যখন অরাজক অন্ধকারে চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করছে : 'বিজ্ঞান কি আমাদের বাঁচালো ? গণতন্ত্রে কি আমরা রক্ষা পেলাম ?' তখন ওএলস-এর মুখে কোনো উত্তর ছিলো কিনা জানি না, কিন্তু ওএলসকে ঠাট্টা ক'রে ইএটস যে একবার ছড়া কেটেছিলেন তা থেকে একটা উত্তর—এমনকি একটা আশ্বাস—পাওয়া সম্ভব :

Should H. G. Wells afflict you
Put whitewash in a pail ;
Paint : 'Science—opium of the suburbs'
On some waste wall.

৩

'Science—opium of the suburbs.' এই উপনাগরিক অহিফেন পরিবেষণ ক'রে-ক'রেই ওএলস তাঁর রাজত্ব গড়েছিলেন। যেমন কিপলিঙের আদর্শ মানুষ ছিলো শাদাসিধে ইংরেজ, তেমনি ওএলস স্তব করেছেন সাধারণ মানুষের—দৃশ্যত ইংরেজ ককনি হ'লেও যে-কোনো দেশের, যে-কোনো জাতির সাধারণ মানুষ। তাঁর জন্ম যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে এ-কথা ওএলস কখনো ভুলতে পারেননি, ঐ শ্রেণীকেই মহিমান্বিত করেছেন বলশালী লেখনীদ্বারা—তাঁর উপন্যাসের চরিত্র অধিকাংশই আধা-ভদ্রলোক, কাপড়ের দোকানের গরিব কর্মচারীটিকে বার-বার দেখতে পাওয়া যায়। ভাষা তাদের অশিষ্ট, ব্যবহার অমার্জিত, শব্দের আদিতে 'h' উচ্চারণ হয় না, তবু—ওএলস স্পষ্ট ক'রেই বুঝতে দিয়েছেন—পৃথিবীতে তারাই

প্রধান, সংসারটা তারাই চালাচ্ছে, বিজ্ঞান তাদের সমস্ত সুখের ব্যবস্থা করবে, গণতন্ত্র কাছে এনে দেবে সবরকম সুযোগ। এই খোশামুদে আফিং সর্বদেশের জনসাধারণের অত্যন্ত রমণীয় মনে হয়েছিলো ব'লেই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ওএলস 'বিশ্ববিখ্যাত' হ'তে পেরেছিলেন। বর্তমান কালের আরো একজন ইংরেজ লেখক গরিব ঘর থেকে এসেছেন: ডি. এইচ. লরেন্সের পিতা ছিলেন কয়লা-কুলির সর্দার। তুলনা আরো একটু টানা যায়—লরেন্সও স্কলারশিপ নিয়ে বি. টি. প্যাশ ক'রে স্কুলমাস্টার হয়েছিলেন, কিন্তু সাদৃশ্যের এখানেই শেষ। যেহেতু লরেন্সকে সুতীক্ষ্ণ শ্রেণী-চেতনা পীড়ন করেনি, যেহেতু ভদ্রসমাজের সুযোগ-সুবিধাতেই জীবনের সার্থকতা তিনি দেখেননি, যেহেতু তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের বিরোধী, আধুনিক সভ্যতারই বিরোধী, সেইজন্য তাঁর প্রভাব জনসাধারণে ছড়াতে পারলো না, শিক্ষিত সমাজেই আবদ্ধ রইলো। ওএলস-এর ককনিরা মুখ্যত পেতিবুর্জোআ, লরেন্সের মিডল্যাণ্ড-মজুররা মুখ্যত মানুষ। ওএলস-এর প্রচণ্ড ওকালতি নিতান্তই শ্রেণীগত, কিন্তু লরেন্সের মত্ততার অর্থ আরো গভীর—অর্থাৎ তাঁর গল্পে কোনো বড়োমানুষের স্ত্রী যখন কোনো 'ছোটোলোকে'র প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন, তখন লরেন্স নিজের মজুর-জন্মের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত নন, জীবনের আদিম উদ্দাম প্রেরণার কাছে নীরক্ত শ্বেত সভ্যতার পরাভব দেখাতে প্রয়াসী। ওএলস ইতিহাসের একটি, একটিমাত্র অধ্যায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ লিপিকার; লরেন্সের সন্ধান জীবনের মূলে, তার চরম মূল্যের উদ্দেশে; তাই দু'জনের মধ্যে তিনিই বড়ো শিল্পী।

উপরের মন্তব্যের উদ্দেশ্য ওএলসকে অনর্থক খাটো করা নয়, লেখকহিশেবে তাঁর গোত্রবিচারই এর লক্ষ্য। যে-মত তিনি প্রচার করেছিলেন, যে-আদর্শ তিনি তুলে ধরেছিলেন, এবং যার জন্য বিশ্ব তাঁকে বরমাল্য দিয়েছিলো, সেই মতের ভ্রান্তি, সেই আদর্শের নিষ্ফলতা আজ যদি বিশ্ববাসীর মনে প্রতীয়মান হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তাঁর

গৌরবের কতটুকু অবশিষ্ট রইলো, এ-প্রশ্নকে তো ঠেকানো যায় না। আসলে ওএলস (এবং অংশত বর্নর্ড শ-ও) সেই শ্রেণীর লেখক যাঁদের চিত্তে বিশেষ-একটি যুগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়, যাঁদের বলা যায় যুগ-প্রতিনিধি, এমনকি যুগাবতার, আর সেই বিশেষ যুগটি কেটে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই যাঁরা অনেকাংশে, কখনো বা সম্পূর্ণরূপে, অর্থহীন হ'য়ে পড়েন, তাঁদের রচনাবলী তখন শুধু ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপই দাঁড়িয়ে থাকে। তর্ক করা যায় যে সব বড়ো লেখকই যুগ-প্রতিনিধি, চসরও তা-ই, শেক্সপিঅরও তা-ই, ওআর্ডস্বর্থও তা-ই, কিন্তু চসর শেক্সপিঅর ওআর্ডস্বর্থ আপন-আপন যুগকে অবলম্বন ক'রে চিরকালের কথাই বলেছিলেন, তাই প্রতি যুগই তাঁদের মধ্যে নিজের হৃদয়ের কথাই শুনতে পায়। আবার এমন বড়ো লেখকও আছেন যাঁর রচনার সঙ্গে তাঁর যুগের, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, কিছুমাত্র সংশ্রব নেই, যেমন আঠারো শতকে ব্লেক কিংবা উনিশ শতকে ল্যাণ্ডর। ল্যাণ্ডর যে রোমান্টিক যুগে বেঁচে ছিলেন, এবং ভিক্টোরীয় যুগেও, তাঁর রচনা প'ড়ে সে-কথা মনে করবার কোনো উপায় কি আছে! যুগলক্ষণ এ-সব লেখকে বর্তায় না, স্বযুগে তাই পাঠকসংখ্যা তাঁদের স্বল্প, পরবর্তী যুগেও বেশি না, কিন্তু যুগে-যুগে কিছু পাঠক তাঁদের থাকেই, সেই সব পাঠক, যাঁরা সৌন্দর্যের অপ্রমত্ত প্রেমিক। আর এঁদের চরম বিপরীতে এমন লেখক মাঝে-মাঝে দেখা দেন যাঁরা স্বকালকে সম্পূর্ণ দখল ক'রে নেন, এবং তার সীমান্তে এসেই যাঁদের স্বাদ উবে যায়: এইরকম লেখক ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রিচার্ডসন, জর্জ এলিঅট, এবং এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, এত বড়ো লিপিনৈপুণ্য নিয়েও এইচ. জি. ওএলস।

মতামত মূল্যহীন হ'য়ে গেলো, সামাজিক প্রসঙ্গের উত্তেজনা ঝ'রে পড়লো, এইরকম অবস্থায় শিল্পসুষমা ছাড়া আর বাকি রইলো কী? ঐটুকু আশ্রয় ক'রেই তো লেখকরা কালের ঢেউ-তোলা সমুদ্রে খেয়া ভাসিয়ে থাকেন। কিন্তু সে-আশ্রয় ওএলস-এর নেই, কিংবা নামমাত্র আছে। শিল্পী তাঁকে বলা যায় না, তিনি লেখক,

ঠিক লেখকও নন, লিপিকার ; সাহিত্যিক নন, সাংবাদিক, সাংবাদিক-সম্রাট। সাহিত্যিক আর সাংবাদিকতার বিভেদ লুপ্ত ক'রে দিয়ে বর্তমান সময়ে সাহিত্যের আদর্শের অধঃপতন যাঁরা ঘটিয়েছেন, ওএলস তাঁদের মধ্যে প্রধান। ইংলণ্ডে শ্রম-বিপ্লবের পর থেকে সাংবাদিকতা দৈত্যের মতো বেড়ে উঠেছে, তারই চরম অভিব্যক্তি তাঁর রাশি-রাশি রচনা। সমসাময়িক জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, চিন্তা, আন্দোলন, সম্ভাবনা তাঁর বিরাট ক্ষুধা তখনই আত্মসাৎ করেছে, এবং সে-বিষয়ে কোনো মন্তব্য না-ক'রে, কোনো উপদেশ না-দিয়ে তিনি টিঁকতে পারেননি। আর সে-উপদেশ কি অল্পস্বল্প !—লাখ কথা না-বললে কোনো কথাই তাঁর বলা হয় না। ডারুইনী চিন্তা-বিপ্লবের পরিশিষ্টে যে-বুদ্ধিবাদ নানাদিকে শাখাবিস্তার ক'রে-ক'রে বিশ শতকে এসে পৌঁচেছিলো, ওএলস তারই মহত্তম প্রচারক, ওএলস আর শ। দু' জনের মধ্যে ওএলস যেন ভীমের মতো, বিরাট বিক্রম, কিন্তু শ্রী-ছাঁদ কম ; আর শ যেন অর্জুন, তাঁর যুদ্ধ করাটাও সুন্দর লাগে। এঁরা দু'জনে প্রায় একই সময়ে ঘোষণা করলেন যে যাকে আমরা সাহিত্য বলি, তার মধ্যে স্থান আছে সমস্ত তর্কের, তত্ত্বের, সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, বিশ্বমানবিক সমস্যার, দু' জনেই উঠে-পড়ে লাগলেন নানা বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দিতে। কিন্তু শ দুটো সুস্পষ্ট বিভাগ ক'রে নিলেন ; তাঁর শিক্ষকতার জন্য, প্রত্যক্ষ প্রচারের জন্য রইলো নাটকের অতিদীর্ঘ ভূমিকাগুলি, আর নাটকগুলি রচনা করতে লাগলেন শিল্পরূপের আদর্শ অনুসারেই। সেইজন্যই তাঁর পক্ষে ক্যাণ্ডিডা বা সেইণ্ট জোন বা হার্টব্রেক হাউসের মতো নাটক লেখা সম্ভব হয়েছে যা শিল্পকলার পরিবর্তনহীন সৌন্দর্যে ভাস্বর। পক্ষান্তরে, ওএলস তাঁর উপন্যাসের দেহের মধ্যেই সমস্ত বিষয় এনে জুড়তে লাগলেন—রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, লম্বা-লম্বা বক্তৃতা, নায়কের ছদ্মবেশ ছুঁড়ে ফেলে কখনো বা নিজের মুখেই ; উপন্যাসের আকার স্ফীত হ'লো, তার চেহারা হ'লো মুসাফিরের ঢিলেঢোলা ঝুলির

মতো, যার মধ্যে পথ-চলতে কুড়িয়ে-পাওয়া যে-কোনো জিনিশ ভরা যায়। সে-ঝুলিতে উঁকি দিয়ে জ্ঞানের গুপ্ত রহস্য হয়তো আমরা জানতে পারলাম, কিন্তু সৌষ্ঠব গেলো, শ্রী ব'লে কিছু রইলো না। এতে ক'রে সমগ্রভাবে উপন্যাস-শিল্পের যে-ক্ষতি হয়েছে সে-বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। যৌবনের উৎসাহে তাঁর অনেকগুলি বই পড়েছিলাম, আরো অনেকের অনেক বই-ই সেই সময়েই আমার পড়া, যে-সব বই তার পরে আর পাতা উলটিয়ে দেখবারও সময় পাইনি—কিন্তু আজ দেখছি যে হার্ডি, শ, এমনকি গলসওআর্দির অনেক ঘটনা আমার মনে বিঁধে আছে, অনেক ছোটো-ছোটো দৃশ্য, হার্ডির কোনো-কোনো মন্তব্য, শ-র কোনো-কোনো সংলাপ পর্যন্ত মনে আনতে পারি, কিন্তু ওএলস-এর কিছুই আমার মনে নেই, হুইলস অব চান্স নামে প্রথম দিককার একটি অপ্রধান ছোটো উপন্যাস ছাড়া, যাতে তাঁর আত্মজন সেই কাপড়ের দোকানের কর্মচারীর সাইকেলে চ'ড়ে কয়েকদিন ছুটি কাটানোর হাস্যরসাশ্রিত বর্ণনা আছে। কিপস, টনো-বাঙ্গে, মিস্টর ব্রিটলিং, স্বয়ং উইলিঅম ক্লিসোল্ড—ছায়ার চেয়েও ছায়া হ'য়ে গেছে এ-সব। এ থেকে মনে হয় যে ওএলস-এর রচনায় শক্তির আকর্ষণ ছিলো, সৌন্দর্যের অনুরণন ছিলো না। যে-ভবিষ্যৎ নিয়ে দুর্ভাবনার অন্ত ছিলো না তাঁর, খুব সম্ভব সেই ভবিষ্যৎ তাঁকে স্মরণ করবে—যদি সাহিত্যের দিক থেকে ভাবি—কয়েকখানা 'বৈজ্ঞানিক' উপন্যাসের লেখক ব'লেই, কোনান ডয়লের শার্লক হোমস গল্পরাজির মতো ঐ উপন্যাসগুলিরও একধরনের স্থায়িত্বের আশা আছে, শুকনো ফলের মতো স্থায়িত্ব, যাতে রস না-থাকলেও রসের স্মৃতি থাকে, সজীবতা না-থাকলেও যার ভোগ্যতা স্বীকার ক'রে নিতে হয়। আর চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান অনেকটা তাঁরই গুরু টি. এইচ. হক্সলির মতো, যুগ-প্রতিনিধির, কিন্তু যুগ-প্রবর্তকের নয় ; বৈজ্ঞানিকের নয়, বিজ্ঞান-প্রচারকের। চিন্তার জগতে স্বকীয় দান যাঁরা ক'রে যান, তাঁদের মর্ম ঘরে-ঘরে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য একদল প্রচারক চাই—বুদ্ধ-যীশু থেকে ফ্রএড-মার্ক্স পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হয়নি—আর পূর্ব-বিশ-শতকের অদ্বিতীয় প্রচারক হিশেবেই ইতিহাসে ওএলসের মূল্য নির্ধারিত হবে, সে-মূল্য যা-ই হোক।

বাংলা কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আধুনিক জীবনের পটভূমিকায় নতুন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে কাব্যনাট্য রচনার প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে এখন পর্যন্ত বিরল হ'লেও উপযুক্ত উদ্যোগীর হাতে পড়লে এদিক থেকে যে একটা মহা সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের সূচনা হ'তে পারে এ-কথা বোধ হয় মোটামুটিভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে। কারণ, কবিতা ও নাটকের যে সমন্বয়সাধন কাব্যনাট্যের মূল লক্ষ্য তা যে বাঙালী কবির আয়ত্তের বাইরে নয় তার প্রমাণ অন্তত মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথে উপস্থিত,—এবং যদিও বাঙালী মন স্বভাবতই গীতিকাব্যমুখী বলে' সত্যিকারের সার্থক নাটক বাঙালী কবিকল্পনায় রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি তথাপি নাটকের পরিকল্পনায় যেখানে কবিতার চূড়ান্ত প্রয়োগের সুযোগ আছে সে-ক্ষেত্রে বাঙালী মন সার্থক সৃষ্টির অন্তরায় হবে এরূপ সম্ভাবনা অল্পই। সার্থক নাটক তাই-ই যাতে লেখকের নিজের কোনো প্রত্যক্ষ্য বক্তব্য নেই, পাত্র-পাত্রীবর্গ তাদের নিজেদের কথা নিজেরাই বলে' থাকে এবং বিভিন্ন ও বিচিত্র নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই নাটকের চরিত্র মূর্ত হ'য়ে ওঠে এবং নাটককে তার স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে; এ-ধারণা খুব মামুলি হ'লেও সত্য। অথচ কাব্যনাট্যে সাধারণত ঘটনা-পরিবেশের সুযোগ স্বভাবতই অল্প এবং কবিতার অবতারণা যতোই আনন্দদায়ক হোক, ঘটনার অভাবে যে নাটক কতগুলো উক্তিমাত্রেই পর্যবসিত হ'তে পারে এ-কথাও ভুললে চলবে না। একাধারে নাটক এবং কবিতা দুই-ই কাব্যনাট্যে চাই এবং এই ধরনের চাহিদাপূরণ যে কতোখানি কঠিন ব্যাপার তা কাব্যনাট্য নিয়ে আধুনিককালে যাঁরা পরীক্ষা করেছেন তাঁদের অবিদিত থাকবার কথা নয়।

গতানুগতিক যে-ধরনের নাটক সৃষ্টির প্রচেষ্টা আমাদের সাহিত্যে

ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে তা থেকেও আধুনিক কাব্যনাট্যকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখা দরকার এইজন্যে যে সংলাপ অনেক নাটকেরই এর আগে পদ্যে লেখা হয়েছে বলেই পদ্যপ্রধান সংলাপযুক্ত নাটককে কাব্যনাট্য বলে' ভুল করবার ঝোঁক দেখা যায়। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'। নাটকটির সংলাপ প্রায় সব জায়গায়ই সোজা পদ্যে লেখা, তাই বলে' কি তা কাব্যনাট্য? এরূপ নাটক আরো রয়েছে। 'গান্ধারীর আবেদন'-এ কি 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এ কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণতা নেই। এই ধরনের রচনায় কবিতার অভাব নেই, অভাব শুধু নাটকীয় পরিবেশের। তাছাড়া, নাটকে যেমন একটি প্লট থাকবে, নায়ক-নায়িকা থাকবে, প্রতিনায়ক থাকবে, বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ এবং তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের সম্পূর্ণ বিকাশ-লাভের সঙ্গে-সঙ্গে নাটকও যথার্থ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে—সে-রকম কোনো পরিকল্পনা 'গান্ধারীর আবেদন' বা 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' জাতীয় রচনার মূলে ছিল বলে' মনে হয় না। কিন্তু আধুনিক কোনো কাব্যনাট্যকারের উদ্যোগ যে 'গান্ধারীর আবেদন' বা 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এর দৃষ্টান্ত থেকে অনেকখানি উপাদান সংগ্রহ করতে পারে এ-কথা বলা বাহুল্য। উপন্যাস এবং গল্পের মধ্যে যে-পার্থক্য, সাধারণ বাজার-চলতি নাটক ও কাব্যনাট্যের মধ্যে বোধ হয় প্রভেদ প্রায় ততোখানিই। সাধারণ একখানি নাটক অভিনীত হ'তে অন্তত পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে কিন্তু কাব্যনাট্যের অভিনয়কালীন সময় আরো অনেক কম। বড়ো নাটকে প্রধান ঘটনা এবং প্রধান ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি উপঘটনা সৃষ্টির সুযোগ থাকতে পারে কিন্তু কাব্যনাট্যে মুল ঘটনা ছাড়া অন্য কোনো ঘটনার অবতারণার সুযোগ খুবই অল্প। উপঘটনা-গুলিকে শুধু আভাসে-ইঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিতে হয়, যতোখানি সম্ভব পটভূমিকায় রাখতে হয়। উপঘটনা বা উপচরিত্রগুলো পাদ-প্রদীপের মতোই মূল ঘটনা বা মূল চরিত্রদের আলোকিত করতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ও মাইকেল থেকে আধুনিক কাব্যনাট্যকার তাঁর অনেকখানি উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন এ-জন্যে যে রবীন্দ্রনাথের নাটকে যেমন কবিতার অভাব নেই তেমনি মধুসূদনের কবিতায়ও নাটকীয়তার অভাব নেই। 'বিসর্জন' নাটকের সঙ্গে তুলনা করুন 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। রবীন্দ্রনাথের নাটকের পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের মধ্যে আমরা পেয়েছি শ্রেষ্ঠ কবিতার সুষ্ঠু ও অপূর্ব বিকাশ, dramatic elements নয়, lyrical elements-ই দর্শক বা পাঠককে অভিভূত করে বেশি,—কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে (ধরুন, "সোমের প্রতি তারা" কি "দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী") থেকে-থেকেই পরিচয় পাওয়া যাবে অপূর্ব নাটকীয়তার, সঙ্গে-সঙ্গে মনে হবে যে শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য মধুসূদনের হাতে হয়তো সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ গ্রহণ করতে পারতো। 'বিসর্জন' থেকে উদ্ধৃত করছি :

ক্ষীণ দীপালোকে গৃহকোণে থেকে যায়
অন্ধকার ; সব পারে, আপনার ছায়া
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
বুদ্ধি দীপময়, যত আলো করে দান
তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া, স্বর্গ
হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয় টুটে।

এর সঙ্গে তুলনা করুন সোমদেবের প্রতি গুরুপত্নী তারার প্রণয়লিপির প্রথম কয়েক ছত্র :

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে, অভাগী তারা ? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন ; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি।

প্রথম উদ্ধৃতিতে সংহত কবিত্বের বিকাশ আমাদের অভিভূত করে, কিন্তু শেষোক্ত উদ্ধৃতিতে যে-নাটকীয় আবেগের সূচনা তার পরিণতির স্তরে পৌঁছবার জন্য মন উন্মুখ হ'য়ে থাকবেই। সুতরাং আধুনিক কাব্যনাট্যকারকে কাব্য ও নাটকের সমন্বয়সাধনের দিকেই যে দৃষ্টি

রাখতে হবে এ-কথা বলা বাহুল্য। তারপর নাটকের সংলাপের স্বাভাবিকতার উপরও দৃষ্টি রাখা চাই। কবিতার ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি এগিয়ে আনবার প্রয়োজনীয়তা এ-যুগে স্বীকৃত হয়েছে। আধুনিক কাব্যনাট্যকারকে এদিক থেকেও সম্ভবত নতুন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হবে। মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকা যে-ভাষায় কথা ব'লে এসেছেন আধুনিক কালের পাত্র-পাত্রীবর্গের ভাষা তা থেকে স্বতন্ত্র হবেই এবং যতোদূর সম্ভব মুখের ভাষার প্রয়োগ নাটকের সংলাপকে বাস্তবমুখী ক'রে তুলবে এটা এখনকার দিনে প্রায় প্রমাণিত সত্য। অনেক বাংলা নাটকের সংলাপে অমিতাক্ষর ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ; মিল দিয়ে পদ্যে সংলাপ লেখারও বাধা নেই যদি মিলের দিকেই নাট্যকারের প্রয়াস ও উদ্যোগের ঝোঁকটা অতি মাত্রায় অনুভূত না হয়। তা ছাড়া, সাধারণ মুক্ত ছন্দেও (গদ্যছন্দে নয়) নাটকের সংলাপ লেখা অনুমোদন করা যায়। মোটের উপর, যে-কাব্যনাট্য লেখা হচ্ছে তা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে এই বোধটা কাব্যনাটকারের মনে সব সময় থাকা চাই। আধুনিক কবিতার পাঠকের সংখ্যা মোটেই অগুনতি নয়; বিশেষ-এক শ্রেণীর শিক্ষিত ও মুষ্টিমেয় লোকই এখন পর্যন্ত কবিতা পড়ে' থাকেন। কিন্তু যে-কাব্যনাট্য লেখা হবে তা জনসাধারণ সকলের জন্যেই, এবং খুব সাধারণ লোককেও অভিভূত করতে হ'লে যে-ভাবে সংলাপ, ঘটনার সন্নিবেশ ও চরিত্রসৃষ্টি দরকার তা কাব্যনাট্যকারকে সংগ্রহ ক'রে নিতে হবেই। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে কাব্যনাট্য নিয়ে অনেক পরীক্ষা চলেছে ও চলছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সার্থক সৃষ্টিরও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের পেশাদার লেখকরা কিছুকাল ধরে' আর ভালো নাটক দিতে পারছেন না ; যদি এখন কাব্যনাট্য নিয়ে কিছু-কিছু পরীক্ষা চলে তাহ'লেই বা মন্দ কী ? ভালো কবিতা লেখেন এবং রঙ্গমঞ্চের জ্ঞান আছে এরূপ লোকই উদ্যোগী হ'তে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপ' সর্বাঙ্গসুন্দর কাব্য, বিচিত্রিত ও মধুর; সার্থক কাব্যনাট্যের অনেক উপাদানও এতে বর্তমান কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত সব মিলিয়ে 'বিদায়-অভিশাপ' কবিতাই, কাব্যনাট্য নয়। অর্থাৎ, কবিত্বের অভাব নেই কিন্তু নাটক সৃষ্টি করতে হ'লে যে-বিচিত্র ও বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ দরকার, ঘটনার যে ঘাত-প্রতিঘাত দরকার, মূল আখ্যানভাগকে অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে নেবার জন্যে যে-পরিকল্পনা দরকার সে-সব 'বিদায়-অভিশাপ'-এ পাওয়া যাবে না। অথচ, এ-কথা ভুললে চলবে না 'বিদায়-অভিশাপ'-এ কচ দেবযানীর মুখে যে সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে কবিত্বের দিক থেকে তা যেমন অনবদ্য, নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির দিক থেকেও তেমনি সার্থক। দেবযানী যখন কচ-কে সম্বোধন ক'রে বলছেন :

জান না কি প্রেম অন্তর্যামী।
বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন,
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়। কতদিন
যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছো তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি,
অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া—
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার। সে কি আমি দেখি নাই।

তখন আমরা যে অভিভূত হই তার কারণ এই নয় যে প্রতিটি লাইনের শেষে মিল রয়েছে, আসল কারণ এই যে এই সংলাপে ভাবের যে সমগ্রতা লক্ষ্য করা যায় তা নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। আধুনিক কাব্যনাট্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আধিক্য থাকবেই, কারণ, নাটক যদি সমস্যামূলক হয় তাহ'লে হয়তো দেখা যাবে যে প্রচলিত সংস্কার ও রীতিনীতিকে হয়তো নাট্যকার ঠাট্টা করেছেন এবং সেইজন্যে যে-বিশেষ ধরনের সংলাপ পাত্র-পাত্রীর মুখ থেকে নিঃসৃত হবে তার রচনাও যাতে স্বাভাবিক হয় সে-দিকেও

নাট্যকারের দৃষ্টি থাকা চাই। আধুনিক অনেক কবির কবিতায় এই ধরনের সংলাপের উপযুক্ত ছন্দোবিন্যাসেরও অভাব নেই :

লাল মেঘ গুহা পাবে না হয়তো খুঁজে
নিজেরে নিখিলমিছিলে মিলাও যদি,
চলো তার চেয়ে মরা খড়ে ঘাড় গুঁজে
হবো অপরূপ অপরাহ্ণের নদী।

হরিণ সময় লাগামে বাঁধতে পারো?
বিংশ শতকেও ফুলের বেসাতি করি,
অতল ওদের মিতালি হৃদয়ে গাঢ়
হিংসুক হাওয়া দেহে আঁকে চক্‌খড়ি। *

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

তারপর গান। গানের দিকটাও কাব্যনাট্যের প্রাণ। মাঝে-মাঝে গান থাকবে আর সেই গানের মধ্য দিয়ে এমন বিচিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে যা সমগ্রভাবে নাটকের প্রাণশক্তিকে প্রকাশ করবে। যতো সুন্দরই হোক, খাপছাড়া গান (যেমন, ইদানীং সিনেমায় কি রঙ্গমঞ্চে দেখা যায়) হ'লে কিন্তু চলবে না, খুব বেশি সংখ্যক গান ঢোকানো যাবে না ব'লেই গানের পরিকল্পনা ও সন্নিবেশের উপরই খুব সতর্ক দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের অনেক গান অবশ্য কাব্যনাট্যে ব্যবহৃত হ'তে পারে কিন্তু নতুন ধরনের গান, বিশেষ ক'রে কোরাস গান, কাব্যনাট্যকারকে লিখে দিতে হবেই। সংখ্যায় দু' একটি অথচ সত্যিকারের আবেগপ্রধান, চেতনাদীপ্ত গান কাব্যনাট্যকে সুনিশ্চিত সমৃদ্ধ করবে।

* কাব্যনাট্য যদি ঠাট্টাকে আশ্রয় করে তাহ'লে চলতি বাংলার হালকা চালে তার সংলাপের আদর্শ তো রবীন্দ্রনাথই স্থাপন করেছেন 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য়। —সম্পাদক।

আলোচনা

বাংলা ছন্দ

কবিতার গত চৈত্র-সংখ্যায় 'বাংলা ছন্দ' নিয়ে যে আলোচনা হয়েচে, তা শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'কে কেন্দ্র ক'রে দানা বেঁধে উঠেচে। তাহ'লেও ছন্দের মৌলিক তত্ত্ব এ থেকে বাদ যায়নি। স্বরবৃত্ত সম্পর্কে ছন্দজিজ্ঞাসুর যে যে প্রশ্ন জেগেছে, তারি জবাব হিবাসে এ প্রবন্ধের অবতারণা। "বাংলা ছন্দে" উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা হয়েছে যে 'স্বরবৃত্তের প্রত্যেক পর্বে তিন থেকে পাঁচ সিলেবলের স্থান হ'তে পারে স্বচ্ছন্দে'। দৃষ্টান্তগুলি অনুধাবন ক'রে দেখা যাক এর যৌক্তিকতা কতটা আছে।

প্রথমেই ব'লে নেওয়া ভাল যে স্বর আর সিলেবল এক জিনিষ নয়। সিলেবল কখনো কখনো স্বর হ'তে পারে, কিন্তু সব সিলেবলই স্বর নয়। যেমন 'কা' একটি সিলেবল, আর এতে আছে 'ক্' ও 'আ'। শেষেরটি স্বর। কাজেই স্বরবৃত্তের সমালোচনায় সিলেবলের পরিবর্তে 'স্বর' বলাই বাঞ্ছনীয়। বস্তুত ওর নামেই আছে এ কথার সার্থকতা। পাঁচ সিলেবলের যে উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে তাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—'ই' কার, 'ও' কার ও 'এ' কার। 'ঢুলিয়ে', 'উড়িয়ে' প্রভৃতিতে স্বরাঘাতের প্রভাবে ছন্দসন্ধি হয়েচে আর 'ই' কারের মাত্রা লোপ পেয়েছে। যেমন, 'ঢুলিয়ে' =ঢুল্ ইয়ে=ঢুল্যে; 'উড়িয়ে'=উড়্ ইয়ে=উড়্যে। এখানে যদিও তিনটি স্বর দেখা যায় চোখে, কানের কাছে এর মূল্য দুই-ই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন "মধ্য যুগের ফার্সীনবিশ লিখিয়েরা অনির্দিষ্ট বা ভাংটা ইকার গুলিকে গোটা বা পূরো ক'রে বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়ুং ঢুকে দিয়েছিলেন।" 'এ' কারের উদাহরণ—'দাঁড়িয়েছিলাম'; 'মিলিয়েছিলাম'। এ সব জায়গায় 'এ' কার স্পর্শ-স্বরে পরিণত হয়েচে আর এর মাত্রা লোপ পেয়েচে। এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম= দাঁড়+(এ)+ছিলাম; মিলিয়েছিলেম=মিলি+(এ)+ছিলেম। 'ও' কারের উদাহরণ—'আমিও এমন'; 'তুমিও বুঝি'। এখানে স্বরাঘাতের পরবর্ত্তী একস্বর অক্ষরের মাত্রা লোপ হয়েচে। এর মূলে রয়েচে বাঙালীর উচ্চারণ রীতির

বৈশিষ্ট্য। বাঙালির বাক্‌যন্ত্র এতই নমনীয় যে অল্প আয়াসেই স্বরগুলি উচ্চারিত হয়। কাজেই আবশ্যকমতো তার মাত্রা বৃদ্ধি ও হ্রাস করা কিংবা তার পর ঝোঁক দেওয়া কিছুই কঠিন নয়। এই লঘু উচ্চারণের জন্যে ছন্দের হিসেব থেকে উপরি উক্ত স্বরগুলিকে বাদ দেওয়া যায়। একথা 'যমুনাবতী' 'শিবুঠাকুরের' সম্বন্ধেও খাটে। এখানে যমুনাবতী=যম্+(উ)+নাবতী, শিবুঠাকুরের=শিবঠাক্+উ+রের্। 'উ' এখানে স্পর্শস্বর—এর পূরো মাত্রা নেই। একে পূরো ওজন দিলে স্বরবৃত্তের ছন্দসুষমা নষ্ট হয়। আর উচ্চারণের সময়ও আমরা 'উ'কারকে ভাংটার ওজন দি। এ থেকেও বোঝা যাবে যে এসব উদাহরণে চতুঃস্বরপর্বই আছে।

তারপর ত্রিস্বর পর্বের কথা। এটা ব্যতিক্রমই। ছন্দের বৈচিত্র্যের জন্যেই এর আমদানি। স্বরবৃত্তে ঘন-ঘন স্বরাঘাতে একঘেয়েমি এসে যায়। তাই এই সব ব্যতিক্রম। এ ছন্দের ছাঁচটি হচ্ছে চার স্বরের। তবে এই চার স্বরের বিভিন্ন সমাবেশ হ'তে পারে যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনি নিয়ে। প্রথম—চারটি যুগ্ম ধ্বনি; দ্বিতীয়—তিনটি যুগ্ম, একটি অযুগ্ম; তৃতীয়—দুটি যুগ্ম, দুটি অযুগ্ম; ৪র্থ—চারটি অযুগ্ম। তবে এর সব গুলিই যে ভাল হয় তা নয়। 'কুড়োতে', 'না খেয়ে' বা 'না হয়ে' প্রভৃতি ত্রিস্বর পর্বে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরের উপর ঝোঁক পড়চে তাই ওর দীর্ঘ উচ্চারণ। এর জন্যে দায়ী অবিশ্চি স্বরাঘাত। যেমন কুড়োতে= কুড়ো+তে; না খেয়ে=না খেয়ে। দেখা যাচ্ছে যেখানে যুগ্মধ্বনি নেই ব'লে মনে হচ্ছে, সেখানেও ওটা আছে আর ধরা পড়বে উচ্চারণে। কতগুলি ত্রিস্বর পর্বের উদাহরণে ভুল আছে। যেমন—সন্ধ্যাসকাল করবি শুধু 'এ ঘাট ও' ঘাট। এর পর্বভাগ 'এ ঘাট ও' নয়, হবে 'এ ঘাট ও ঘাট'। এটা চতুঃস্বরের পর্ব। তেমনি 'তারি আইন' 'দূর হইতে' 'এও কেন' প্রভৃতি চতুঃস্বরপর্বিক।

স্বরবৃত্তে স্বরাঘাতের জন্যে ছন্দোলিপিকরণে গোটা শব্দকে ভাগ করা যায়। যেমন—

এল তার দৌ। রাত্ম্য নিয়ে।
হও তুমি সা। বিত্রীর মত।

কিন্তু

এল তার। দৌরাত্ম্য নিয়ে।
হও তুমি। সাবিত্রীর মত।

নয়। উচ্চারণের ঝোঁকের দিকে লক্ষ্য রাখলে এটা বোঝা যাবে।

স্বরের যখন হ্রাসবৃদ্ধি ও মাত্রালোপ আছে বাঙালীর উচ্চারণে, তখন প্রত্যেক চতুঃস্বরপর্বের ওজন যে সমান থাকবে এটা আশা করা যায় না। মাত্রাও তাই স্থিতিস্থাপকতার অধীন। এদের ওজন আক্ষেপিক। 'ওগো যৌবন-তরী' ও 'চিরনিদ্রার দেশে' প্রভৃতিতে সে-ছন্দ কেটেছে। তার কারণ একই পর্বাঙ্গে দুটো ক'রে যুগ্মধ্বনি আছে। যেমন যৌবনের 'যৌ' ও 'বন' আর 'নিদ্রার' 'নি' ও 'দ্রার'। এতে ছন্দসুষমা রক্ষা হয়নি। স্বরাঘাতের জন্যে বাগ্‌যন্ত্রের যে-প্রয়াস হয়, তারপরে সে একটু বিশ্রাম চায়। তাই আরও একটি যুগ্মধ্বনি উচ্চারণের প্রয়াসে একটু অসুবিধেই হয়।

এ-থেকে একটি জিনিষ স্পষ্ট বোঝা যায় যে শুধু স্বরধ্বনিই এ-ছন্দের সবকিছু নয়। এতে আছে হসন্তের ঠুনোঠুনি। এই স্বর ও হসন্ত নিয়েই এর চলন তিনমাত্রার। রূপকল্প অবিশ্লিষ্ট চতুঃস্বর পর্বের। দ্বিস্বর পর্বের কথাও কেউ-কেউ বলেন। কিন্তু তাতে এর চলন ঠিক থাকে না। তাই বলে ছন্দের অন্য ঢঙের মতো এতেও আছে মাত্রার হিসেব। এতে যেমন স্বরধ্বনিস্থান চার, তেমনি মাত্রা সংখ্যা ছয়। আর হসন্ত একটি থাকতেই হবে। দুটিও এ অনায়াসে বহন করতে পারে। যেমন, বায়রে দেখা—একটি হসন্ত, টাপুরটুপুর—দুটি হসন্ত। কিন্তু তিনটি হসন্ত হ'লে ছন্দ টলতে থাকে। তখন চার স্বরের জায়গায় তিন স্বর হলেই সুষমা রক্ষা পায়। এ-সব জায়গায় দুটি হসন্ত মিলে একটি স্বরের কাজ করে। যেমন গর্ গর্ গর্ গর্জে দেয়া। হসন্তের ঠুনোঠুনিতে এ ছন্দ হ'য়ে ওঠে কল্লোলিত আর এনে দেয় স্বরাঘাতের ঝোঁক। তাই শুধু স্বরের হিসেব মূল্যহীন। এর স্বরূপ নির্ণয়ে ছান্দসিকের মানদণ্ড হচ্ছে স্বর, হসন্ত, মাত্রা ও চলনের হিসেব। এদের কাউকেই বাদ দেওয়া চলে না।

অনিল বিশ্বাস

'কবিতা'র গত চৈত্র সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু মহাশয় "বাংলা ছন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতামত আলোচনা করেছেন। ছন্দোবিধি সম্বন্ধে কতকগুলি অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ধারণা ও-প্রবন্ধে চোখে পড়ল। তার বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। মূল কয়েকটি বিষয়ে পাঠকের মনে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

বুদ্ধদেবের প্রথম আপত্তি প্রবোধচন্দ্রের 'যুগ্মধ্বনি' কথাটা নিয়ে। বুদ্ধদেব

সূত্র নির্দেশ করেছেন, "পয়ার জাতীয় ছন্দে যুক্তবর্ণগুলির ওজন কখনো একমাত্রা কখনো দু'মাত্রা, মাত্রাবৃত্তে যুক্তবর্ণের ওজন সর্বদা দু'মাত্রা।" (কবিতা, চৈত্র ১৪৩ পৃষ্ঠা)। কিন্তু 'পয়ার জাতীয়' ছন্দে 'যুক্তবর্ণে'র ওজন কখনো দুমাত্রা হয় না। দুমাত্রা হয় যুক্তবর্ণের পূর্বস্থিত ধ্বনির ওজন। এই পূর্বস্থিত স্বরবর্ণের এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনের সংযুক্ত ধ্বনিকেই প্রবোধচন্দ্র 'যুগ্মধ্বনি' বলেছেন। (ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ৭, ৩৯ পৃঃ)। একটা দৃষ্টান্ত—

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল
শিট্‌কে মুখ খাবি জর আট্‌কে যাবে কাল
(রবীন্দ্রনাথ—ছন্দ)

এখানে প্রথম লাইনে যুক্তবর্ণে একটি—ষ্টি, কিন্তু যুগ্মধ্বনি তিনটি। আর 'ষ্টি' যুগ্মধ্বনি নয়, যুগ্মধ্বনি (closed syllable) হচ্ছে "মুষ" তেমনি 'টোট্' ও 'লট্'। এই যুগ্মধ্বনিকে একস্থলে সংযুক্ত এবং অন্য দুইস্থলে বিযুক্ত আকারে লেখা হয়েছে। কিন্তু তাতে মাত্রার কোনই তারতম্য হয়নি, তিনটি স্থলেই এরা সমান (এক) মাত্রার মূল্য পেয়েছে। (এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে যে ভবিষ্যতে ভাষার লিপি সরল করবার জন্য যুগ্মধ্বনি তথা যুক্তবর্ণকে বিযুক্ত আকারেই লেখা হবে)। যুগ্মধ্বনি সংযুক্ত এবং বিযুক্ত দুইই বোঝায় এবং স্থানভেদে কখনো একমাত্রা কখনো দুমাত্রা হতে পারে। বুদ্ধদেব লিখেছেন, "দেখা যাচ্ছে যে যুগ্মধ্বনি ব্যবহার পয়ারে ও মাত্রাবৃত্তে একরকম হতেও পারে। কিন্তু যুক্তবর্ণের ঘা লাগলেই প্রকট হয়ে ওঠে প্রভেদ।" (কবিতা চৈত্র ১৪৩ পৃঃ)। তিনি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন—

মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান।

এবং বলেছেন, 'তের' 'মান' যুগ্মধ্বনি দুটি দু মাত্রার, কিন্তু 'ণ্য' এক মাত্রা। প্রথম কথা—'ণ্য' যুগ্মধ্বনি নয়; আর দ্বিতীয়ত এতে প্রমাণ হয় না যে মাত্রাবৃত্তে ও 'পয়ার জাতীয়' ছন্দে যুগ্ম ধ্বনির ব্যবহার একই কারণ যুগ্মধ্বনি 'পয়ার জাতীয়' ছন্দে এক নিয়ম ও মাত্রাবৃত্তে অন্য নিয়ম মেনে চলে। ছান্দসিক এ বিষয়ে সূত্র নির্দেশ করেছেন—

যৌগিক ছন্দে (বুদ্ধদেবের 'পয়ারজাতীয়' ছন্দে) '(১) শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সর্বদাই বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক হয়ে থাকে।' (ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—৪১ পৃঃ) (২) 'সংস্কৃত শব্দের আদি বা মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট এবং একমাত্রক

হয়ে থাকে।' (ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—৪৩ পৃঃ) মোটামুটি এই নিয়ম। এই নিয়মানুযায়ীই অন্তঃস্থিত যুগ্মধ্বনি বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ প্রসারিত এবং মধ্যস্থিত ও আদিস্থিত যুগ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সংকুচিত হয়, "যুক্তবর্ণের ঘা লাগার" জন্য নয়। যুক্তবর্ণ না থাকলেও যুগ্মধ্বনি হতে পারে।

কাজেই 'অক্ষরসংখ্যার সমতা ও (যৌগিক) ছন্দের ভিত্তি নয় এবং ওটা আসলে একটি মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ' (ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—৩৬ পৃঃ)। সর্বদাই মাত্রাবৃত্তে যুগ্মধ্বনি দু'মাত্রা। স্বরবৃত্তে একমাত্রা, কিন্তু 'পয়ার জাতীয়' ছন্দে স্থানভেদে যুগ্মধ্বনি একমাত্রা এবং দু'মাত্রা। এ ছন্দের এই মিশ্র রীতির জন্য প্রবোধচন্দ্র এর নূতন নামকরণ করেছেন যৌগিক ছন্দ। প্রাচীন 'অক্ষরবৃত্ত' নামটা অবৈজ্ঞানিক (অক্ষর সংখ্যা এর ভিত্তি নয় বলে) এবং 'পয়ারজাতীয় ছন্দ' কথাটি এ অর্থে চলতে পারে না। পয়ার একটি বিশেষ ছন্দোবন্ধেরই নাম। সেই অর্থেই প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি চলে আসছে; বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুযায়ী একে অন্য অর্থে প্রয়োগ করলে অনেক অসুবিধারই সৃষ্টি করা হবে। (কবিতা, চৈত্র ১৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বুদ্ধদেব লিখেছেন, 'পয়ারকে একটা ছন্দ না ভেবে একটা ছন্দোবন্ধ ভাবলে এ-রকম অসংগতি থেকে থেকে দেখা দেবেই।' (কবিতা ১৭০ পৃঃ) কিন্তু আমাদের মনে হয় পয়ারকে একটা বিশেষ ছন্দোবন্ধ বলে মেনে না নেওয়াতেই বুদ্ধদেবের সম্মুখে এ সব 'অসংগতি' দেখা দিয়েছে। পয়ার অর্থ শুধু চোদ্দমাত্রার ছন্দ বলে বুদ্ধদেব কেন ভাবলেন জানিনে, কিন্তু তা যে নয় যে-কোনো ছন্দশাস্ত্রে বা ব্যাকরণেই তার প্রমাণ মিলবে। পয়ার বিশেষ ছন্দোবন্ধ। তিনরকম ছন্দেই পয়ার হতে পারে। (ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—১০৪—১৩১ পৃষ্ঠা)

একটি করে মাত্র উদাহরণ দিচ্ছে—

(১) মাত্রাবৃত্ত লঘু পয়ার—

চঞ্চল মৌমাছি ॥ গুঞ্জরি গায় I
বেণুবনে মর্মরে ॥ দক্ষিণ বায় I

(রবীন্দ্রনাথ)

(২) স্বরবৃত্ত লঘু পয়ার—

আবার যদি ইচ্ছা করে ॥ আবার আসি ফিরে I
দুঃখসুখের ঢেউ খেলানো ॥ এই সাগরের তীরে I

(রবীন্দ্রনাথ)

(৩) যৌগিক লঘু পয়ার—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে ॥ হে মঙ্গলময় I
দূর করে দাও তুমি ॥ সর্ব তুচ্ছ ভয় I

(রবীন্দ্রনাথ)

এ গুলি হচ্ছে চোদ্দ মাত্রার লঘু পয়ার। (আট+ছয় মাত্রা)। তিনরকমেই আঠারো মাত্রার দীর্ঘ পয়ারও হতে পারে। (আট+দশ মাত্রা)। যথা—

(১) মাত্রাবৃত্ত দীর্ঘ পয়ার—

সম্মুখে অজানা পথ ॥ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে I
সেথা যাত্রার কালে ॥ যাত্রীর পাত্রটি পুরে। I

(রবীন্দ্রনাথ)

(২) স্বরবৃত্ত দীর্ঘ পয়ার—

একটি কেবল করুণ পরশ ॥ রেখে গেল একটি কবির ভালে I
তোমার ঐ অনন্ত মাঝে ॥ এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনো কালে। I

(রবীন্দ্রনাথ)

(৩) যৌগিক দীর্ঘ পয়ার—

যত কিছু খণ্ড নিয়ে ॥ অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি I
জীবনের শেষ বাক্যে ॥ আজি তারে দিব জয়ধ্বনি। I

(রবীন্দ্রনাথ)

এটা সত্য যে (কবিতা চৈত্র ১৫১ পৃঃ) স্বরমাত্রিক (প্রবোধচন্দ্রের নূতন নাম 'স্বরকলামাত্রিক'—শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫২ দ্রষ্টব্য) ছন্দকে স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত দুয়ের মধ্যেই ফেলা যায়। কিন্তু এর একটি স্বতন্ত্র রীতি ও বৈশিষ্ট্য আছে, এটিই প্রবোধচন্দ্র নির্দেশ করতে চেয়েছেন।

বুদ্ধদেব মাত্রাবৃত্তকে 'তিনমাত্রার ছন্দ' বলতে চেয়েছেন। কিন্তু মাত্রাবৃত্তের উপপর্ব যে শুধু তিন মাত্রারই হবে এমন তো কোনো বিধান নেই। দৃষ্টান্ত—

(১) স্পন্দিত। নদীজল ॥ ঝিলিমিলি। করে I
জ্যোৎস্নার। ঝিকিমিকি ॥ বালুকার। চরে I

(২) নূতন জাগা। কুঞ্জবনে ॥ কুহরি উঠে। পিক
বসন্তের। চুম্বনেও ॥ বিবশ দশ। দিক

(৩) মৈত্রী করুণার। মন্ত্র দিতে দান॥
জাগো হে মহীয়ান। মরতে মহিমায়
স্বজিছে অভিচার। নিঠুর অবিচার॥
রোদন হাহাকার। গগন মহীছায়

এগুলিও মাত্রাবৃত্ত, অথচ কোনোটাই 'তিনমাত্রার ছন্দ' নয়। প্রথমটি চার (দুই+দুই) মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাঁচ মাত্রার (তিন+দুই) এবং তৃতীয়টি সাত মাত্রার (তিন+চার) ছন্দ।

প্রবোধচন্দ্র স্বরবৃত্তকে চতুঃস্বরপর্বিক বলেছেন (ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ২৮ পৃঃ)। বুদ্ধদেব আপত্তি করেছেন এবং কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন' পাঁচ সিলেবলে'র পর্বের উদাহরণ স্বরূপ। (কবিতা চৈত্র ১৬০ পৃঃ)। কিন্তু কোনো উদাহরণেই আমরা পাঁচ সিলেবল পেলাম না। বুদ্ধদেব 'উড়িয়ে' 'দাঁড়িয়ে' 'ঘনিয়ে' 'ছাপিয়ে' 'আমিও' প্রভৃতি শব্দে তিন সিলেবল ধরেই এই বিভ্রমের সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে সবিনয়ে বলে দেওয়া ভালো যে স্বরবৃত্ত ছন্দে অনেকস্থলেই ইয়ে ইউ ওয়া প্রভৃতি ধ্বনি এক সিলেবেল বলেই গণ্য হয়। তার কারণও আছে।

বুদ্ধদেব স্বরবৃত্ত ছন্দকে syllabic বলাতে আপত্তি করেছেন এবং লিখেছেন, "বাংলায় syllabic ছন্দ তো হতে পারে না। কেন না আমাদের অ্যাকসেন্ট-বর্জিত উচ্চারণের এইটুকুই বৈশিষ্ট্য যে ইংরেজিতে যাকে সিলেবল বলে তা বাংলায় কখনো একমাত্রা কখনো দু'মাত্রা।" (কবিতা—১৬৭ পৃঃ)। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দ তো accent অর্থাৎ stress বর্জিত নয়, পরন্তু stress accent-টাই স্বরবৃত্তের একটা বৈশিষ্ট্য। আর syllabic হতে হলে যে accent থাকতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা তো নেই। ভারতবর্ষের বৈদিক ছন্দই তো syllabic অথচ accent অর্থাৎ stress বর্জিত। প্রাচীন বা আধুনিক অন্যান্য ভাষাতেও এমন syllabic ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে যা ইংরেজির মতো accent এর সঙিন উড়িয়ে মার্চ করে চলে না।

মোয়াজ্জল হায়দর

প্রবন্ধলেখকের বক্তব্য

আমার আশা ছিলো বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমার আলোচনায় যদি কোনো প্রমাদ প্রবেশ ক'রে থাকে, অনুকম্পাশীল পাঠকদের সাহায্যে সেগুলি সংশোধন ক'রে নেবার সুযোগ পাবো। কিন্তু যে-নিবন্ধ দুটি এখানে প্রকাশ করা হ'লো, তাতে

এমন কোনো কথাই নেই, 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথে' যা আরো ভালো ক'রে বলা হয়নি; প্রবোধবাবুর উক্তির সমর্থনে প্রবোধবাবুকেই লেখকেরা উদ্ধৃত করেছেন, এবং যেহেতু তাঁর বইখানা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প'ড়ে নিয়েই মূল আলোচনাটি আমি লিখেছিলাম, এ থেকে তাই কোনো শিক্ষাই আমি পেলাম না, আমার সকল ধারণা অপরিবর্তিতই রইলো। অবশ্য এ-কথা আমি স্বীকার করি যে স্বরবৃত্তে 'উড়িয়ে' 'হারিয়ে' প্রভৃতি ণিজন্ত ধাতুরূপে 'ইয়ে' শব্দ যুক্তস্বর অর্থাৎ diphthong-এর মতো উচ্চারিত হয় ব'লে 'উড়িয়ে ধ্বজা' কিম্বা 'হারিয়ে-ফেলা'কে চার মাত্রার পর্ব ব'লে গণ্য করা সম্ভব, কিন্তু

মনে হচ্ছে 'আমিও' এমন
লিখতে পারি ঝুড়ি-ঝুড়ি

আর

মনে ভাবে 'এও' কেন মোদের সাথে আসে

এদের কথা কী? প্রবোধবাবুর একজন অনুগামী একই সঙ্গে 'আমিও' এবং 'এও'কে দু'মাত্রা ব'লে চালাতে চাচ্ছেন: সেটা অসম্ভব। যে-নীতিতে 'আমিও' দু'মাত্রা তাতে 'এও' একমাত্রা; যে-নীতিতে 'এও' দু'মাত্রা তাতে 'আমিও' তিন মাত্রা। অতএব স্বরবৃত্তে, উত্তর-রবীন্দ্রের স্বরবৃত্তে, হয় ত্রিমাত্রিক নয় পঞ্চমাত্রিক পর্ব স্বীকার ক'রে নিতেই হয়। আর 'সন্ধ্যা সকাল করবি শুধু এঘাট ওঘাট'-এর পর্ববিভাগে আমি যে ভুল করিনি তা বোঝা যাবে অল্প একটু কষ্ট ক'রে পূর্বপংক্তির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই:

ওপারেতে ধানের গোলা এই পারেতে হাট
মাঝে শীর্ণ নদী,
সন্ধ্যা সকাল করবি শুধু এঘাট ওঘাট
ইচ্ছা করিস যদি।

আবার প'ড়ে দেখা যাক:

এই পারেতে হাট
এঘাট ওঘাট

এ-দুটি অংশ নিশ্চয়ই তুল্যমূল্য। তাহ'লে কী-রকম দাঁড়ালো?

এই পারেতে। হাট
এঘাট ও। ঘাট

'এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে,' 'হও তুমি সাবিত্রীর মতো' নিয়ে তর্ক অনর্থক। 'এল আর দৌ। রাত্ম্য নিয়ে' 'হও তুমি সা। বিত্রীর মতো'—এদের ছন্দোবিভাগ যে এইরকমই তাতে আমার সন্দেহ জাগেনি; আমি বলতে চেয়েছিলাম যে পড়বার সময় আমরা ছন্দোবিভাগ অনুসারে পড়ি না, পড়ি 'এল তার। দৌরাত্ম্য নিয়ে' এবং 'হও তুমি। সাবিত্রীর মতো'; কেননা সেটাই স্বাভাবিক ও সংগত, বাক্‌ছন্দ ও ভাবছন্দের অনুগামী, যেমন কিনা 'মরি মরি অ। নঙ্গ দেব। তা' পড়ি না, পড়ি 'মরি মরি। অনঙ্গ দে। বতা' 'কিংবা মরি মরি। অনঙ্গদেবতা'। 'এল তার। দৌরাত্ম্য নিয়ে' পড়লেও যে আমাদের কানে খটকা লাগে না স্বরবৃত্তে তিন মাত্রা ও পাঁচ মাত্রার বৈধতারই এটা একটা পরোক্ষ প্রমাণ।

আসল কথা, স্বরবৃত্তের প্রধান নির্ভর চার মাত্রার পর্ব হ'লেও তিন ও পাঁচ মাত্রা স্বচ্ছন্দেই চলতে পারে, এবং তাতেই মারাত্মক একঘেয়েমি থেকে এ-ছন্দ রক্ষা পায়। এর প্রমাণের জন্য ছান্দসিকের দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন নেই, কবিরাই তা প্রমাণ করেছেন এবং আরো করবেন।

মাত্রাবৃত্ত তিন মাত্রার ছন্দ, আমার এ-মতের বিরুদ্ধে (মতটা মূলত রবীন্দ্রনাথের) দ্বিতীয় নিবন্ধে তিনটি দৃষ্টান্ত দাখিল করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটিকে প্রবোধচন্দ্রের পরিভাষায় মাত্রিক বললেই ভালো হয়; আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি নিশ্চয়ই তিনমাত্রার, কেননা ছন্দের আলোচনায় পাঁচ মানেই ৩+২ কিংবা ২+৩, আর সাত মানেই ৩+৪ কিংবা ৪+৩ কিংবা ৩+২+২ কিংবা ২+২+৩ কিংবা ২+৩+২। শুধু ৫ বা ৭ কেন, এ-ছন্দ ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭ মাত্রারও হ'তে পারে, তাই ব'লে নামে-নামে তো আর ছন্দ হ'তে পারে না। এ-কথাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে যে 'তিনমাত্রার ছন্দ' মানে শুধু তিন মাত্রার নয়, যে-কোনো বিজোড়মাত্রারই ছন্দ। নাম-হিশেবে 'বিজোড়মাত্রার ছন্দ'ও চলতে পারে।

পরিশেষে পয়ারের কথা। পয়ার যদি ছন্দোবন্ধই হয়, তাহ'লে তার স্বরূপ কী? ছন্দোবন্ধ বলতে বোঝায় স্তবকবিন্যাস, stanza-form; যেমন সনেট, ট্রিওলেট বা টেরজা রিমা; মন্দাক্রান্তাকেও ছন্দোবন্ধ বলা যেতে পারে। এদের প্রত্যেকটিরই রূপ সুস্পষ্ট ও নিয়ম সুনির্দিষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয় নিবন্ধে উদ্ধৃত ছয়টি দৃষ্টান্ত অধ্যয়ন ক'রে সে-রকম কোনো স্বরূপ খুঁজে পেলাম না। (প্রসঙ্গত ব'লে রাখি যে প্রথম দৃষ্টান্তটি মাত্রাবৃত্ত ঠিক নয়, মাত্রিক; মাত্রাবৃত্ত পয়ারের—যদি

সে-রকম কিছু থাকে—উদাহরণ হ'লো 'শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে, জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল-রবে')। যে-কোনো ছন্দের চোদ্দ মাত্রার চরণকে বলে লঘু পয়ার, আর আঠারো মাত্রার চরণকে বলে দীর্ঘ পয়ার, এটা কি একটা ছন্দোবন্ধের কোনো সংজ্ঞা হ'লো? 'পয়ার অর্থ শুধু চোদ্দমাত্রার (বা আঠারো মাত্রার) ছন্দ,' আমি ভেবেছিলাম লেখক এ-কথা অপ্রমাণ করছেন, কিন্তু ছয়-ছয়টি উদাহরণ দিয়ে সেই কথাই তো তিনি প্রমাণ করলেন। এ থেকে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হ'লো যে পয়ারকে একটি ছন্দোবন্ধ ভাবলে ছন্দের আলোচনায় ভ্রান্তির ক্ষেত্রই শুধু বাড়িয়ে দেয়া হয়। অবশ্য 'ছন্দশাস্ত্র' বা 'ব্যাকরণে'র আমি কিছুই জানি না, কেননা আমি ছন্দ শিখেছি কবিতা পড়তে-পড়তে আর কবিতা লিখতে-লিখতে।

অন্যান্য যে-সব কথা উঠেছে সেগুলি নামকরণ নিয়ে তর্ক মাত্র।

'শেষের কবিতা'

শ্রদ্ধাস্পদেষু

'কবিতা'র পাতায় 'শেষের কবিতা' নিয়ে আপনার ও শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর আলোচনা পড়লুম। পড়তে-পড়তে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জেগে উঠলো: রবীন্দ্রনাথ কি 'শেষের কবিতা'র কবিতাগুলির জন্যেই গল্পাংশটি লিখেছিলেন, না গল্পের প্রয়োজনেই কবিতাগুলি লিখেছিলেন? এ-প্রসঙ্গে গীতিনাট্যের কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো গীতিনাট্যে গানগুলিই তো প্রধান, কাহিনীর বুনোন নেহাৎ পরিমণ্ডলকে সংগতিময় ক'রে তোলবার জন্যে। গীতিনাট্যের কথার অংশটা আমাদের মনে তলানি হিশেবেই জায়গা পায়, গানগুলি যে-রেশ এনে দিয়ে গেলো তার গুঞ্জনই বিশেষ ক'রে হৃদয়কে আলোড়িত করতে থাকে। গানগুলিই নিঃসন্দেহে প্রধান, কথায় কামুফ্লাজ কাঠামো বজায় রাখবার জন্যে। 'শেষের কবিতা' সম্বন্ধেও তাই। আপনি বলেছেন: "……'শেষের কবিতা' কাব্য হিশেবে অপূর্ব, কিন্তু গল্প হিশেবে দুর্বল।' 'শেষের কবিতা', আমার তো মনে হয়, একান্তই কাব্য, গল্পাংশ নিছক টীকা হিশেবে কাজ করেছে। 'শেষের কবিতা'র স্নিগ্ধ কাব্যাভাই আমাদের আচ্ছন্ন করে, তা নিয়েই আমাদের অধিকাংশ তৃপ্তি আর আলোড়ন। গ্রন্থটির কাব্যাস্বাদ আমরা যাতে পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারি সেজন্যেই রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর প্রবর্তনা করলেন, সৃষ্টি করলেন অমিত আর লাবণ্যকে, তাদের আশে-পাশে রইলো কেটি-লিসি-সিসি, যোগমায়া যতিশঙ্কর শোভনলাল: শেষের

দিকে বাধ্য হয়ে, কাব্যের খাতিরেই বাধ্য হয়ে, শোভনলাল আর কেটিকে অধিকতর আলোয় টেনে আনলেন। তর্ক উঠেছে যে গল্পাংশের প্রধান চরিত্রদ্বয়ে আগাগোড়া সংগতি রক্ষা হয়নি, শেষের দিকে তাদের যে পরিচিতি পেলাম আমাদের মন তাকে গল্পাংশের প্রথম দিকের তাদের সঙ্গে সংযোজিত ক'রে নিতে পারছে না। সমাপ্তির দোর-গোড়ায় অমিত-লাবণ্য হঠাৎ অদ্ভুত বদলে গেছে। অমিয়বাবু সৌসাম্য স্বষ্টির জন্যে এর কারণ নির্দ্দেশ করছেন; '···লাবণ্যের মূর্তি বদলেছে এ-কথা ঠিক, কিন্তু ঘটনাও যে বদলেছে। ঘটনার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যের চরিত্রে অবনতি ঘটেনি, পরিণতিই ঘটেছে।' কিন্তু এ-উক্তিতে যুক্তি সায় দেয় না। কারণ অমিত লাবণ্যকে বাদ দিয়ে 'শেষের কবিতা'য় কোনো কাহিনী নেই, চরিত্র দুটির উপরই ঘটনাস্রোত নির্ভর করছে। লাবণ্য নিজেকে অন্যদিকে চালিত করলো বলেই কাহিনীও ও-রকম অস্বস্তিকর সমাপ্তির দিকে মোড় ফিরলো।

আমার মনে হয় এভাবে লাবণ্য-চরিত্রে সামঞ্জস্য সঞ্চারের চেষ্টা না করাই ভালো। কারণ চরিত্রের খাতিরে যেমন 'শেষের কবিতা'র জোড়া-তালি-দেয়া উপাখ্যান, তেমনি গ্রন্থটির অন্তর্নিহিত কাব্যময়তাকে উজ্জীবিত ক'রে রাখবার জন্যেই চরিত্রগুলির স্বষ্টি। এ-বইয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রকাশ করেছেন কবিতার ভিতর দিয়ে (এবং কবিতা দিয়ে আমি শুধু পদ্যকবিতাই বোঝাচ্ছি না, অমিত-লাবণ্যের দীর্ঘ কথোপকথনগুলিও ধরছি, যেগুলো এক-একটি নিটোল, সুসম্পূর্ণ গদ্যকবিতা), কবিতাগুলি আবার নিজেদের প্রকাশ করেছে কতগুলি চরিত্রের সাহচর্যে। তাই লাবণ্য-চরিত্রকে যদি স্ববিরোধী ব'লে মনে হয়, তার কারণ নির্ণয়ের জন্য আমাদের প্রবেশ করতে হবে রবীন্দ্রনাথের যে-কাব্যউৎস 'শেষের কবিতা'র জনক, তার গহনে। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মানসে কতগুলি আবছা, আশ্চর্য ছায়া দোলা দিয়ে গিয়েছিলো। সে-সমস্ত ছায়ারা এনে দিলো কবিতার প্রেরণা, সঙ্গে-সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র প্রথম দিকের অধ্যায়গুলি জন্ম নিলো পদ্য এবং গদ্যকবিতার স্নিগ্ধতায় রবীন্দ্রনাথ মগ্ন হয়ে গেলেন। 'শেষের কবিতা' রচিত হতে লাগলো, আর তার প্রেরণার মূলে রইলো সে-সব আশ্চর্য, অদ্ভুত ছায়ারা যারা তীক্ষ্ণ দ্রুততার সঙ্গে একটির-পর-আর-একটি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পটভূমিকায় পলাতক স্বাক্ষর বিকীরণ ক'রে গেলো। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ছায়াদের নিজেদের ভিতর অন্তর্যোগ ছিলো, একটি ধারাবাহিকতার সচ্ছল স্রোত প্রবাহমান ছিলো,

ততক্ষণ 'শেষের কবিতা'র চরিত্র (বা কাহিনী) আমাদের বিব্রত কিংবা সংশয়ী করেনি, আমরা তাদের ভিতরেও যৌক্তিক ক্রমপরিণতি আবিষ্কার করতে পেরেছি। কিন্তু কবিপ্রতিভায় যে-সব ইঙ্গিত বিকীরিত হয়, তারাও নিশ্চয়ই phase মেনে চলে। ছায়াময়ী সংকেতের দল ঝাঁক বেঁধে আসে, তাদের থাকে ঐকান্তিক কোনো ধর্ম, বিশিষ্ট কোনো বিচ্ছুরণ। যখন তাদের phase শেষ হ'য়ে যায়, তারা দল বেঁধেই আবার প্রস্থান করে। 'শেষের কবিতা'য়ও ঠিক সে-রকম একটা-কিছু ঘটেছিলো। যে-সংকেতময়ীরা 'শেষের কবিতা' শুরু করবার প্রেরণা দিয়েছিলো, 'মিতালি'-'দীপক' নিয়ে লাবণ্য অমিতর উচ্ছল হবার অধ্যায়েই তারা মিলিয়ে গেলো। এ-জায়গাতেই একটি অপূর্ব কবিতার, একটি কাহিনীর যবনিকা-পতন। কিন্তু সে-কাহিনী বা কবিতা 'শেষের কবিতা' নয়: তাকে অন্য-কোনো নামে অভিহিত করতে হবে। গ্রন্থের পরবর্ত্তী খণ্ডই যথার্থ 'শেষের কবিতা', এবং শেষের কবিতাটি সে-'শেষের কবিতা'রই সমীকরণ। এ-খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের মনে নতুনতর কাব্য প্রেরণা দীপ্তি দিয়েছে, প্রথমাংশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ক্ষীণ, প্রায় নেই বললেই চলে। লাবণ্যের চরিত্র সেজন্যেই দু'খণ্ডে দু'রকম, পারস্পরিক সংগতিরহিত। দু'খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রেরণা দু'রকম, তাই চরিত্রদের পরিস্থিতিও দ্বৈত।

আমি যা বললুম হয়তো তা খুবই অভিনব, এমনকি বালসুলভ কল্পনাপ্রসূত, ব'লে ঠেকতে পারে। কিন্তু এ-ছাড়া অন্য-কোনো প্রকারে লাবণ্য-চরিত্রের অসংগতির বিশ্লেষণ আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব ঠেকছে। 'শেষের কবিতা'কে সমগ্রভাবে বিচার করতে গেলে শুধু লাবণ্য নয়, আরো অনেক চরিত্রের অসংগতিই আমাদের পীড়া দেবে। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ কেটিকে যতটা সহজে কেতকীতে পরিণত করেছেন, তা কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকে। কেটির এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে অশ্রুজল বড় বেশি অবলীলার সঙ্গে গড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও-জায়গায় এ-রকম একটা আশ্চর্য সুন্দর বাক্য ব্যবহার করেছেন ব'লেই আমরা নীরব থাকতে বাধ্য হই, আমাদের আপত্তি বাক্যটির চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যের নিচে চাপা প'ড়ে যায়। আসলে আমাদের মন ঠিক তৃপ্ত হতে পারে না। তাছাড়া, কাহিনীর পরিসমাপ্তির খাতিরে রবীন্দ্রনাথ শোভনলালের সঙ্গে যে-ব্যবহার করেছেন তা রীতিমত shabby। লাবণ্য যখন তাকে তাড়িয়ে দিলো তখনই সে মাথা নিচু ক'রে চ'লে গেলো, যখন লাবণ্য তাকে ফিরে ডাকলো

সে লাফিয়ে-লাফিয়ে ফিরলো। রবীন্দ্রনাথ হয়তো একটি টাইপ প্রেমিক সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন: মনে-মনে এই সান্ত্বনা দেয়া ছাড়া আমাদের আর-কোনো উপায় থাকে না, কারণ শোভনলাল আমাদের গভীরভাবে হতাশ করেই।

'শেষের কবিতা'কে খণ্ডিত ক'রে বিচার করলে এ-জাতীয় নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যেতে পারে। কারণ তাহ'লে 'শেষের কবিতা' গ্রন্থের 'শেষের কবিতা' খণ্ডে (অধ্যায়ে নয়, যদিও এটা ঠিক যে 'শেষের কবিতা' খণ্ডটি 'শেষের কবিতা' অধ্যায়ের, তথা 'শেষের কবিতা'-পদ্যকবিতার explanation ছাড়া আর কিছু নয়) রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনে ফুটে-ওঠা যে-সব image-কে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তাদের আমরা প্রণিধান করতে পারবো, তাদের আত্মার উত্তাপকে চিনে নিতে পারবো। এবং তাহ'লেই এই খণ্ডে কেন কেটিকে কেতকীতে রূপান্তরিত করা হলো, শোভনলালকে প্রায় ইথার হাতড়ে কেন ফিরিয়ে আনা হলো তা আমরা পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারবো।

অশোক মিত্র

প্রমথ চৌধুরী

জন্ম : ৭ অগস্ট ১৮৬৮

মৃত্যু : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন জাতে রাজ-কবি, কিন্তু জন্মেছিলেন অরাজক যুগে। বীরবল ছদ্মনাম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, অতএব বর্তমান কালের বঙ্গভূমি তাঁর প্রকৃত রঙ্গভূমি নয়। বাল্যকালে তবু রাজস্মৃতিরঞ্জিত কৃষ্ণনগরে নবাবি আমলের সূর্যাস্তসোনার ছিটেফোঁটা ভোগ করেছিলেন, কিন্তু যৌবনে এবং পরবর্তী জীবনে ইংরেজের হর্ম্যময় নগরীতে, গণতন্ত্রের মন্ত্রমুগ্ধ বাংলাদেশে এমন প্রায় কিছুই ছিলো না, যা তাঁর সভাসদ্-স্বভাবের, তাঁর রাজন্য-রুচির অনুকূল। ভাগ্যক্রমে পৈতৃক বিত্তের স্বাধীনতা ছিলো ব'লেই তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর সাহিত্যবৃত্তির অনুধাবন করতে পেরেছিলেন; কেননা কালক্রমে ও কালচক্রান্তে সে-বিত্তের অবক্ষয় অবধারিত জেনেও এই অসামান্য প্রতিভার প্রতি বাঙালি সমাজের দায়িত্ববোধ জেগে ওঠেনি; তাঁর গ্রন্থরাজি বিলুপ্তির প্রান্তে পৌঁছতে পেরেছে, কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অধ্যাপকের পদপ্রার্থী হ'য়েও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, এবং ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনতিপরে তাঁর সম্বর্ধনা নিরুৎসুক পাংশুতার উদাহরণরূপেই স্মরণীয়। আর অবশেষে, যেন তাঁর স্বভাবের সঙ্গে স্বকালের জীবনব্যাপী বিরোধের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ তাঁর মৃত্যুও হ'লো এমন সময়ে, অরাজকতার নরক দেশে যখন অনর্গল, যখন হত্যার স্থূলতায় মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুকে উল্লেখযোগ্যই লাগে না, যখন দেশের একজন মনীষীপ্রধানের তিরোধান সংবাদপত্রের কতিপয় ক্ষুদ্রাক্ষর পংক্তিতে আবদ্ধ থাকাটাই লোকচক্ষে সংগত ঠেকে। প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুতে সমস্ত বাংলাদেশ যে আজ নির্বিকার, যে-বাস্তবের বিবেচনায় এটা বিস্ময়কর নয়, সেই বাস্তবই আমাদের অধঃপাতের পরিমাপ।

ঠিক এই সময়টায় প্রলয়ের প্রত্যক্ষতা না-থাকলেই বা এই মৃত্যু লক্ষ্য করতো ক'জন। যে-কারণে উন্মত্ততা আজ দেশের অধিনায়ক, সেই কারণেই প্রমথ চৌধুরী প্রায় আশি বছরের জীবদ্দশাতেও এ-দেশ বৃত হলেন না।

অথচ সবুজপত্রের সূচনা থেকেই সুসংস্কৃত বাঙালির চিত্তে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন; তারপর সাহিত্যে কত দিক থেকে কত রকম হাওয়া দিলো, কিন্তু সে-প্রতিষ্ঠায় ভাঙন ধরলো না, বরং তা দিনে-দিনে দৃঢ় হ'লো। রবীন্দ্রনাথ বার-বার বরমাল্য দিয়েছেন, ঋণ স্বীকার করেছেন তাঁর কাছে, সে-ঋণের প্রকৃত স্বরূপ আজও আমাদের উপলব্ধির অনায়ত্ত। আর সবুজপত্রের লেখক-গোষ্ঠীর তিনি তো আরাধ্যই, উপরন্তু, পরবর্তী যুগের লেখকরাও, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর প্রভাবের অন্তর্গত নন, তাঁরাও যৌবনে তাঁকে ভজনা ক'রে উত্তরজীবনে তাঁর কীর্তিকথনে প্রবৃত্ত হয়েছেন—এ-কাজে সবুজপত্রের আত্মজদের বদলে একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়রাই যে অগ্রগামী, এটা নিশ্চয়ই তাঁর স্থায়িত্বেরই নিদর্শন। আমার সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে অনেকেই অবিচল প্রমথপ্রেমিক; অন্তত একজন—অন্নদাশঙ্কর—তাঁর সার্থক শিষ্য, এ-পর্যন্ত সার্থকতম। সবুজপত্রের উদ্দীপনার যুগ অতিক্রম ক'রে তবে যে তাঁর প্রভাবের শ্রেষ্ঠ ফসল ফললো এতে এ-কথা অন্তত বোঝা গেলো যে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের যুগ-বুদ্বুদ মাত্র নন, তাঁর আসন চিরকালের কোলে।

সাহিত্য-জগতে যে-অনুপাতে তাঁর প্রতিপত্তি, ঠিক সেই অনুপাতেই দেখা গেছে পাঠক-সমাজে তাঁর সম্বন্ধে উদাসীনতা। বস্তুত, তাঁর সমীপবর্তী কোনো লেখকেরও তাঁর তুল্য অনাদর বাংলাদেশে আর কখনো ঘটেনি। বাংলাদেশ লেখককে ভালোবাসতে না জানে তা তো নয়, কিন্তু মনের মতো লেখক হওয়া চাই। বাংলা সাহিত্যে যে-অর্ধোত্তর শতাব্দী ধ'রে রবীন্দ্রনাথের একাধিপত্য নিরবচ্ছিন্ন ছিলো, সেই সময়ের মধ্যেই অন্তত তিনজন লেখক জনচিত্তে রাজত্বস্থাপন

করতে পেরেছিলেন—শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল ইসলাম; তিনজনের মধ্যে দু'জনই আবার কবি। এঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে তাঁর খ্যাতির চরম লগ্নে সমস্ত দেশ যেমন ক'রে গ্রহণ করেছিলো, প্রমথ চৌধুরী তো দূরের কথা, আমি বিশ্বাস করি না আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অদৃষ্টে সে-রকম ঘটেছে। দেশ, সত্যি বলতে, রবীন্দ্রনাথকে এখনো পায়নি: আমরা যে 'বিশ্বকবি' ইত্যাদি বালশোভন বিশেষণ দুশ্ছেদ্য-ভাবে তাঁর নামের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছি, এবং পঁচিশে বৈশাখ ও বাইশে শ্রাবণকে উপলক্ষ্য ক'রে বছরে আরো দু'বার সরস্বতী পূজার উত্তেজনা ভোগ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি; তার কারণ রবীন্দ্রনাথ শুধুই কবি কিংবা লেখক নন, তা ছাড়াও অন্য-কিছু, অন্য অনেক-কিছু; এবং একই কারণে তাঁর স্মৃতিরথের সারথির পদে এমন মহাশয়কেও মানায় যিনি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কিছুই পড়েননি, কিংবা 'কথা ও কাহিনী' মাত্র পড়েছেন, আর সে-কথা বেশ সগর্বেই ব'লে বেড়াতে যাঁর বাধে না। যে-রবীন্দ্রনাথ কবি, লেখক, সাহিত্যিক, তিনি খুব বেশি লোকের উৎসাহের বিষয় নন; যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবংশে না-জন্মাতেন, সামাজিক-রাষ্ট্রিক আন্দোলনে না-জড়াতেন, বিশ্বভারতী স্থাপন না-করতেন, জগদ্বিখ্যাত না-হতেন, এবং—এটাও কম কথা নয়—তাঁর কায়া-কান্তি যদি দেবতুল্য না-হ'তো, তাহ'লে কি ধনপতিরাই তাঁর নামে প্রণাম করতেন, না কি গণমতির উন্মুখতাই তাঁকে পুতুল-পুজোর ছুতো ক'রে তুলতো। বাংলাদেশে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল নয় যে দু' চারখানা বই পড়েছে অথচ রবীন্দ্রনাথ পড়েনি, কিন্তু এমন-কোনো পাঠক যদি থাকেন (খুব সম্ভব তিনি পাঠিকা) যিনি জীবনে একখানা মাত্র বই পড়েছেন, ধ'রেই নেয়া যায় সে-বইয়ের লেখক শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের আর প্রমথ চৌধুরীর অভ্যুত্থান প্রায় একই সময়ে; সহযাত্রী তাঁরা, কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফলের এর চেয়েও উৎকৃষ্ট উদাহরণ যদি থাকে সেটি খুঁজে পাওয়া যাবে প্রামথিক জীবনচরিতেই।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী আর চিত্তরঞ্জন দাশ, এই দুই নবীন ব্যারিস্টর একই দিনে প্রথম হাইকোর্টে পদার্পণ করলেন ; চিত্তরঞ্জন সোজা উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে, আর প্রমথনাথ হোঁচট খেয়ে সেই যে ফিরলেন, জীবনে আর ও-মুখো হলেন না। লৌকিক অর্থে, চিত্তরঞ্জনের কৌঁসিলি-কৃতিত্বের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সিদ্ধি নিশ্চয়ই তুলনীয়, এবং যাঁরা পুনর্মুদ্রণের পৌনঃপুনিকতা দিয়ে লেখকের গুরুত্ব নির্ণয় করেন, তাঁরা কখনোই প্রমথ চৌধুরীকে আমলের মধ্যে আনেননি। বাংলা দেশ শরৎচন্দ্রকে দিলো হৃদয়ের উদ্‌বারিত অভ্যর্থনা, আর প্রমথ চৌধুরীকে সম্ভ্রমের অভিবাদন ; ঘন-ঘন শরৎ-সম্বর্ধনার আয়োজন সাধিত হ'লো প্রমথ-পতিত্বে ; লেখক-পাঠকের বিবাহে বার-বার তিনি পৌরোহিত্যে আহূত হ'তে লাগলেন, কিন্তু পুরোহিত নিজেই যে বরোত্তম এ-কথা কারো মনে এলো না। সেকালে আমাদের সাময়িক সাহিত্যে রবি-স্তবের চেয়েও চন্দ্র-বন্দনার মুখরতা ছিলো বেশি, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে নীরবতাই যেন নিয়ম ; তাঁর শ্রেষ্ঠতা সাহিত্যিক সমাজে যেমন স্বতঃসিদ্ধ, অন্যত্র তাঁর অস্তিত্বই তেমনি অস্পষ্ট। এ-অবস্থা যে নিতান্তই অতীত তাও নয় : সেদিনও বেতার-বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তিমান অধ্যাপকের মুখে বাংলা গদ্যের প্রামাণিক লেখক-তালিকায় বিবেকানন্দর পর্যন্ত নাম শুনেছি, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর নাম পর্যন্ত শুনিনি। বস্তুত, বিদ্বজ্জনেরাও কদাচ তাঁকে সুনজরে দেখেছেন, কেননা অতি সহজে পাণ্ডিত্য বহন ক'রে পণ্ডিতের বৃত্তিটাকেই যেন তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন, এবং আপন বৃত্তিনাশের আশঙ্কা কোনো মানুষই সহ্য করতে পারে না। পণ্ডিতেরা তাই তাঁকে পারতপক্ষে স্বীকারই করেননি, যতক্ষণ না তাঁকে পেয়েছেন নিজের এলাকার মধ্যে, ছিদ্রসন্ধানের সম্ভাবনার সীমানায়। 'ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি' বা 'প্রাচীন হিন্দুস্থান'র মতো রম্য রচনাকেও অতথ্যের অপবাদে অগ্রাহ্য করবার মতো নিন্দুকের অভাব হয়নি বাংলাদেশে, যদিও সে-সব তথ্যাতথ্য নিত্যই তর্কাধীন।

দেখে-শুনে আমার ধারণা জন্মেছে যে আমাদের পণ্ডিতেরা লেখকের পিঠ-চাপড়াতে ভালোবাসেন : সেই লেখকই তাঁদের প্রিয়, লেখা যাঁর স্বভাব, কিন্তু লেখাপড়া অভ্যাস নয় ব'লে বিদ্বানের বশ্যতা যিনি স্বীকার করেন সহজেই।

আসলে বোধহয় সেই-সব লেখকের বাঁশি শুনেই আমরা নাচি, যাঁরা আমাদের জীবিকার সমর্থক ; অর্থাৎ আমাদের অবরুদ্ধ ইচ্ছাকে যাঁরা প্রকাশ করেন, আমাদের গুপ্ত দুর্বলতাকে গর্বের বিষয় ব'লে ঘোষণা করবার জাদুবিদ্যা যাঁরা জানেন। যেদিন থেকে 'সাধারণ পাঠক' ব'লে কথাটা উঠেছে, সেদিন থেকেই দেখা গেছে যে সাধারণ পাঠক পক্ষপাতী লেখকেরই পক্ষপাতী ; যাঁদের রচনায় নিজের মহিমান্বিত মূর্তি দেখে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোলা যায়, জনগণের প্রাণপুত্তলি তাঁরাই। তা-ই যদি না হবে, তাহ'লে চার-ইয়ারি বা নীল-লোহিতের রূপ-পূর্ণিমার প্রতি দৃক্‌পাত না-ক'রে আমরা শিশুসেব্য দেবদাস বা শেষ প্রশ্ন নিয়ে মত্ত হবো কেন ; কেন, তাহ'লে, হালখাতার হীরক-দ্যুতি আমাদের মনোগহনে বিকীর্ণ হ'তে পারলো না। প্রমথ চৌধুরী কখনো বিপ্লবের বন্দনা করেননি, কোনো-এক কল্পিত স্বর্গরাজ্যের ছবি এঁকে ক্ষুদ্রের অহমিকার খোরাক জোগাননি, ঈর্ষার বা প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতার সুযোগ দেননি কখনো ; সেইজন্য বাংলাদেশের মনের মতো লেখক তিনি হলেন না। মানুষ দুঃখী ব'লে তিনি যে মন-খারাপ করেছেন তাতে আমাদের মন মজলো না, যেহেতু মানুষ খারাপ ব'লে তিনি দুঃখ করেননি। আমরা পৃথিবীটাকে সুস্পষ্ট ভালো-মন্দে বিভক্ত দেখতে চাই ; নিজেকে দেখতে চাই ভালোর সঙ্গে একাত্ম, আর যখন যাকে আমাদের শত্রু ব'লে ভাবি তাকে মন্দের প্রতিভূস্বরূপ ; কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর জগতে মানব-স্বভাবের এই কৃত্রিম খণ্ডীকরণের স্থান নেই ; সেখানে স্বপ্ন-নায়িকা উন্মাদিনী, মিথ্যাবাদীরা চিত্তহারী, বুদ্ধিজীবীরা বাক্যবীর মাত্র, এবং মল্ল, গীতজীবিনী আর বিদূষকই মহাকাব্যের কুশীলব। সে-জগতে

ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-মূর্খ, সনাতনী-অগ্রণী এ-রকম কোনো বিভেদই ধরা পড়ে না; যদি কোনো পক্ষপাত প্রকাশ পায় সে একমাত্র মৌল মনুষ্যত্বের প্রতি, আর সেটা সত্যকার পক্ষপাতই নয়। এই নিরপেক্ষতাই বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য, এবং সেটাই তাঁর লোকপ্রিয়তার অন্তরায়। মন তাঁর ব্রাহ্মণের, ধর্ম তাঁর অনাসক্তি, কণ্ঠ তাঁর ধীরমধুর। জীবন ভ'রে বাক্‌বিতণ্ডার কর্ণধার হ'য়েও কখনো যে তাঁর গলা চড়েনি; রাষ্ট্রিক-সামাজিক বহু আন্দোলন যে অবিকল চৈতন্যে পার ক'রে দিতে পেরেছেন; জীবনে কোনো সময়েই যে রবীন্দ্রনাথের মতো লিখতে চেষ্টা করেননি, বঙ্কিমচন্দ্রের মতোও না—এর প্রত্যেকটিই তাঁর বিস্ময়কর ব্যক্তিস্বরূপের অভিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ গদ্যরচনা আরম্ভ করেন বঙ্কিমের অকৃত্রিম অনুসরণে, আর শরৎচন্দ্র সবেগে রবীন্দ্রনাথের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন; এই অনুক্রমিক প্রবাহ থেকে স্বভাবের শাণিত স্বাতন্ত্র্যে একা প্রমথ চৌধুরী অবচ্ছিন্ন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর পূর্বপুরুষ যদি কেউ থাকেন তিনি ভারতচন্দ্র; হয়তো কালীপ্রসন্ন সিংহ আর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও তাঁকে কিছু সুপরামর্শ দিয়েছিলেন, যদিও হুতোমি সংস্কারস্পৃহা তাঁর ছিলো না, এবং সমগ্র ঈশ্বর গুপ্তকে সহ্য করা তাঁর মতো বররুচির পক্ষে অসম্ভব। যাত্রাকালে লক্ষ্য তাঁর স্থির ছিলো; সহজাত শক্তিকে শিক্ষিত ক'রে নিয়েছিলেন; তার উপর ভাগ্যক্রমে ফরাশি গদ্যের আদর্শ জাগ্রত ছিলো তাঁর মনে। তাই তো ইংরেজির প্রভাব তাঁকে চঞ্চল করলো না, রবীন্দ্র-মদিরা পরিপূর্ণ পান ক'রেও আত্মহারা হলেন না; নিষ্কম্প্র মনস্বিতায় উত্তীর্ণ হলেন তাঁর শ্বেত-দীপ্ত বাণী-বৈকুণ্ঠে। অনুকূল, অথচ অনুরূপ নন; একেবারে ভিন্ন, তবু ভক্ত; অবিচ্ছেদ্য বন্ধু, কিন্তু বিশ্ববীক্ষায় বিপরীত; এমন মানুষ রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁকেই দেখেছিলেন ব'লে তাঁর প্রমথ-প্রীতির পরিসীমা ছিলো না।

বলা বাহুল্য, প্রমথ চৌধুরীর মনোরাজ্য বাস্তব জগতে আজ স্মৃতি

মাত্র। মজুর, দোকানদার আর খবুরে-কাগুজে কবির এই জগতে, যেখানে নীল রক্ত লাল হ'য়ে যায়, আর লাল রক্ত পথে-ঘাটে ঝ'রে পড়ে, নীল-লোহিতের লীলা সেখানে থেমে গেছে অনেক আগেই। তবু এ-কথা সত্য যে ইহলোক থেকে বিচ্যুত হ'য়েও মনোলোক তার সত্তা হারায় না; সভাসদ্‌বৃত্তি লুপ্ত হ'লেও সভ্যতা বেঁচে থাকে, এবং আভিজাত্য বংশগত না-হ'য়েও জন্মগত হ'তে পারে। পৃথিবীতে অরাজকতাই যদি আজ স্বরাজ পায়, তবু এমন মানুষ কয়েকজন থাকবেনই, রাজশ্রী যাঁদের অন্তরে, আর সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা যদি প্রকাশ্যেই ঘৃণা, হত্যা, পিশুনতায় রূপান্তরিত হ'য়ে থাকে, তাহ'লেও পৃথিবীর সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অবলুপ্তি অসম্ভব, সভ্যতা যার স্বভাব, সৌন্দর্য যার চিন্তায়। স্বভাবের সেই সুষমায়, চিন্তার সেই ছন্দে যে-সব লেখকের প্রতিষ্ঠা, যাঁরা চিরকাল পাঠকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির উর্ধ্বে, প্রমথ চৌধুরী সেই অমর-মণ্ডলীর অন্যতম।

সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তি

'কবিতা'র গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'একটি হারানো ছবি' নামে কবিতা অন্য একটি পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছে দেখা গেলো—আশ্চর্যের বিষয় লেখকের নাম দু' জায়গায় দু' রকম। হয়তো এ-রকম দ্বৈত প্রকাশ পূর্বেও ঘটেছে, আমাদের চোখে পড়েনি। সকলেই জানেন যে এটা সৌজন্যবিরুদ্ধ, এবং উভয় সম্পাদকের পক্ষে অসম্মানজনক। অতএব 'কবিতা'য় প্রকাশের জন্য যাঁরা রচনা পাঠাতে চান, তাঁদের আমরা জানাই যে 'কবিতা' ত্রৈমাসিক ব'লে মনোনীত রচনা-প্রকাশে তিন মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত দেরি হবার সম্ভাবনা তাঁরা যেন স্বীকার ক'রে নেন। যদি প্রকাশের বিলম্বে অধীর হ'য়ে সেই রচনাই কেউ পত্রান্তরে পাঠানো স্থির করেন, তাহ'লে আমরা আশা করবো যে তাঁরা পত্রদ্বারা সে-কথা আমাদের জানাবেন।

এ-প্রসঙ্গে আমাদের আর-একটি নিবেদন আছে। 'কবিতা'য় প্রকাশিত কোনো-কোনো রচনা পত্রান্তরে উদ্ধৃত হয়েছে আমাদের অজ্ঞাতেই, এবং পত্রিকার একটি কপিও আমাদের হাতে পৌঁছয়নি। একেও সৌজন্য বলে না। ভবিষ্যতে যদি কোনো পত্রিকা 'কবিতা'র কোনো রচনার বা রচনার অংশের পুনর্মুদ্রণ করতে চান, লেখকের ও সম্পাদকের অনুমতি নেবার কর্তব্যটুকু আশা করি তাঁরা প্রথমেই পালন করবেন, এবং পত্রিকার একটি কপিও যথাস্থানে যথাসময়ে পাঠাতে ভুলবেন না। এইটুকু রীতি-রক্ষার অপরিহার্যতা সর্বজনস্বীকৃত হওয়া উচিত।

সম্পাদক ও প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
১৮ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট দি ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ডারি এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ থেকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে, বি. এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতা

দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা] পৌষ, ১৩৫৩ [ক্রমিক সংখ্যা ৫২

চিরজয়ী

অশোকবিজয় রাহা

এ-কণ্ঠের বাণী
জানি আমি জাগে আজ সৃষ্টির সে আদি-উৎস হ'তে—
উঠেছিল অগ্নিমেঘ, উঠেছিল নীহারিকা-ঝড়
ঝরেছিল উল্কাবৃষ্টি—জেগেছিল কোটি সূর্যতারা
জেগেছিল জ্বলন্ত পৃথিবী
উত্তপ্ত লাভার স্রোত সর্বদেহে ঢেলেছিল তার
কোটি অগ্নিগিরি।

কত যুগ পরে
ধীরে-ধীরে বাষ্পমেঘ স'রে
দেখা দিল নূতন পৃথিবী
দেখা দিল জল স্থল—দেখা দিল অরণ্য বিশাল
দেখা দিল প্রথম জীবন।

আদিম অরণ্যতলে দেখেছি সেদিন
আদিম রাত্রির বিভীষিকা
বিকট হিংসার মূর্তি কৃষ্ণ-ভয়ঙ্কর
অন্ধকারে হিংস্র চোখ জ্বলে—

তীক্ষ্ণ নখে রক্ত মাখা, তীক্ষ্ণ দাঁত শাণিত প্রখর।
সে ভয়াল মহারণ্যে এক প্রান্তে জ্বেলেছি সেদিন
অগ্নিশিখা কম্পিত উজ্জ্বল
আপন অভয়মন্ত্র প্রথম করেছি উচ্চারণ।

রাত্রি শেষে পূর্বসিন্ধুপারে
আরক্ত জবার মতো লাল সূর্য উঠেছে আকাশে,
উঠেছি সমুদ্র-স্নান ক'রে
সিক্তদেহে পূর্বাকাশে চেয়ে
আপন জীবন-সূর্যে করেছি বন্দনা,
আপনার কণ্ঠস্বর মন্ত্রমুগ্ধ শুনেছি সেদিন
দূরাগত সঙ্গীতের মতো।

সেদিন জীবনে
জন্ম নিল সুন্দরের কবি
জন্ম নিল প্রেম,
উজ্জ্বল রূপের বন্যা ব'য়ে গেলো অন্তরে-বাহিরে
ছুটালো রঙের ঝড় সূর্যাস্তের মেঘে
পাখা মেলে উড়ে এলো অপরূপ তারা-ভরা রাত
সমুদ্রে পাহাড়ে বনে ছড়ালো চাঁদের স্বপ্নলোক।

আমার এ-কণ্ঠে আজ কথা কয় প্রকাণ্ড অতীত
কথা কয় বোবা মাটি-জল
লুপ্ত যুগ, লুপ্ত জনপদ
অতীতের গুঞ্জন-মুখর
শত-শত বিলুপ্ত নগর

সারি-সারি অন্ধ গিরিগুহা,
গম্বুজ, খিলান
কোটি ভগ্নচূড়া।

দীর্ঘ জীবনের পথে কত দীর্ঘ অন্ধকার রাত
জ্বলন্ত মশাল হাতে ছুটেছি উন্মাদ
উদ্দাম ঘোড়ার পিঠে।
কত বন, মরুভূমি, কত গিরিপথ
ছাড়ায়ে এসেছি পিছে,
অস্ত্রের ঝঞ্চনা আর দ্রুত অশ্বখুরে
কত মৃত্যু হ'য়ে গেছি পার,
উন্মাদ গতির ঝড়ে চক্ষের পলকে
ঘটায়েছি কত-যে প্রলয়!
তারপর দীর্ঘ রাত্রিদিন
কী কঠিন তপস্যা করেছি!
বিরাট ধ্বংসের বুকে নিজ হাতে তিল-তিল ক'রে
আবার নূতন সৃষ্টি গড়েছি অতন্দ্র সাধনায়।

জানি আজ আমার এ বুদ্ধিদীপ্ত মনীষার আলো
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কী আশ্চর্য বিস্ময় ছড়ালো,
জড়ায়েছে সপ্তলোক যন্ত্রের বিচিত্র মায়াজালে
এ-সৃষ্টির যত শক্তি বন্দী আজ হাতের মুঠোয়,
আমার ইঙ্গিতে আজ এ-বিশ্বের অণু-পরমাণু
মুহূর্তে চঞ্চল!
কোটি-কোটি জ্যোতি-কণা মুহূর্তে সে অণুনৃত্যে মাতে,

চক্ষের পলকে
বস্তু-সমুদ্রের বুকে ঝড় ওঠে প্রচণ্ড উত্তাল !
প্রতিভার দীপ্ত সূর্য জাগে আজ আমার ললাটে
উজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রে।

লোকজয়ী, কালজয়ী আমি,
তবু আজ জানি
আমার দুর্জয় শত্রু আমারি সে আত্মঘাতী মোহ
আমাতেই জাগায় বিদ্রোহ,
আমার আপন সৃষ্টি আমাকেই বার-বার হানে,
চক্ষের পলকে
বিকট রাক্ষসমূর্তি ধ'রে
শত বজ্রে বক্ষ দীর্ণ করে
ছিন্ন হৃৎপিণ্ড হ'তে রক্ত ঝরে অযুত ধারায়,
বার-বার আমার এ জয়
ডেকে আনে ব্যর্থ পরাজয়।

তবু জানি, এ কখনো চিরসত্য নয়
আমার এ আত্মদ্রোহ একদিন হবে অবসান
সেই আদি আহিতাগ্নি জ্বলে আজ শত শিখা মেলে,
প্রাণসূর্য দিকে-দিকে ছড়ায়েছে সহস্র কিরণ।
আজ সেই জ্যোতির্ময় প্রেম
মেলেছে সহস্র দল মহাবিশ্বাকাশে
শত দ্বন্দ্বমৃত্যুমাঝে হাসে আজ আমার সুন্দর।

আমার এ-কণ্ঠে তাই আজ সেই দিব্যকণ্ঠ বাজে
যে-কণ্ঠে উদাত্ত হোলো চিরজয়ী জীবনের গান,

এ-কণ্ঠের বাণী আজ উর্ধ্বপথে ধায়
বিদ্যুৎ-পাখায়
সীমাহীন মহাশূন্যে—সাড়া জাগে তারায়-তারায়
এ-সৃষ্টির শেষপ্রান্ত কাঁপে সেই তরঙ্গ-আঘাতে
কাঁপে দূর নীহারিকা, কাঁপে দূর সূক্ষ্ম মহাকাশ
জীবনের জয়ধ্বনি-গানে।

'পরধন গীতিকা' অনুসরণে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

এই মাটির মাদল থেকে কী মিষ্টি গান
তুমি নিয়ে আসো গো !
বলো কেউ কি এমন গান আনতে পারে
এই, দেহের মাদল থেকে মাটির ভাঁড়ে
যেন মধুর মতো ওগো গাইয়ে আমার !

ওগো গাইয়ে আমার নাও দু'হাত দিয়ে
নাও, দু'হাতে জড়িয়ে নাও শরীর আমার—
আরো একটু···আরো !
ওগো করো খেলা করো তুমি আমায় নিয়ে
করো আমার শরীরে খেলা শরীর দিয়ে !
আরো মাদলের মিঠে সুরে পাবে তুমি গান,
মিঠে চিনির মতো !

২

যদি বেসেছো ভালো
জাগো, সময় এলো !
দেখ, বিছানায় প'ড়ে আছে হীরার আলো ;
দেখ, আমার চোখেও আলো ঝলমলালো !
তুমি কোরো না দেরি, মিঠে লগন এলো—
যদি বেসেছো ভালো !

ওগো পাহাড় বেয়ে
তুমি উঠতে থাকো !
সেই উঁচুনিচু বাঁকা পথ দু'পায়ে মাখো।
সেই পথের শেষেই আছে সুখের পাওয়া—
এসো তাড়াতাড়ি, সুরু করো তোমার বাওয়া।
তুমি ক্লান্ত যখন নেমে আসবে শেষে
এসো, শুয়ে পড়ো ঝর্নার কিনার ঘেঁসে।
এসো ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসো স্বপ্ন-ছোঁওয়ায় এসো রাত্রি-শেষে !

আমি গেয়েছি কত
সেই কর্ম-গাথা ;
সেই নাচের বিভোল দলে জড়িয়ে যাওয়া ;
সেই গোল হ'য়ে হাতে হাত চাঁদের নিচে
ভালো- বাসার গানে ভালোবাসতে চাওয়া !
ওগো, দল বেঁধে বনে ফলকুড়োনো-ছলে
জানি, আমিও ছিলাম সেই মেয়ের দলে ;
সেই 'দাদারিয়া'-মিঠে গানে ঝড়ের মতো
আশা এই বুকে বাসা বেঁধে কেঁপেছে কতো !
তবু, তোমার সঙ্গে আজ এই যে বাওয়া—
জানি এর কাছে সব পাওয়া মিথ্যে-পাওয়া।

রোমন্থন

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীত দিগন্ত থেকে স্মৃতির বাতাস যেন আসে
—ক্ষণাভাস—স্পষ্টতায় দীন,
সর্ব্বশুক্ল-অভিধাবিহীন।
আকাশের ফার্নেসে জানি আমি নিঃশেষে
জ্বলে গেছে, গলে গেছে সেই সব দিন;
—সেই সুরা রঙীন রঙীন!

সেই সব রাত্রি যত; চুমকিতে চমকানো আকাশের নিচে
স্মৃতি হ'য়ে শব হ'য়ে ছিলো যারা
ছিলো হ'য়ে নিদারুণ মিছে—
কোথাকার মোহ নিয়ে
কোন্ মোহানায় তারা আমাকে টানিছে?
যত সব উদ্বেলিত রাত্রি আর দিন
অতীত দিগন্ত থেকে হাওয়া নিয়ে আসে
জীবনের ঝরা জুঁই জরার নিশ্বাসে
উড়ে আসে বাতাসে বিলীন;
সর্ব্বশুক্ল-অভিধাবিহীন।
বিস্মৃতির বিষে তিক্ত কঠোর বৈরাগ্যে রিক্ত
উদ্বেলিত রাত্রি আর দিন।

রৌদ্র-জ্বলা চূর্ণ মেঘে মেঘে
তারকিত নাগবীথী পথে
আজো আছে লেগে

তাদের সে পলাতক পাণ্ডুলোর ছাপ;
মুমূর্ষু স্মৃতিরা আর্ত্ত; স্পষ্ট নয় তাদের বিলাপ।
গহন-সায়াহ্ন-বাঁকে
জীবনের স্রোত যায় ঘুরে
বন্য সুরে সুরে
কে বা তারে ফেরাবারে ডাকে?
অস্পষ্ট গুঞ্জন মন্ত্র
ফেরাবে কি পুনরায় তাকে?

অকূল জোয়ার আসে মুছে দিতে মলিন হৃদয়
বাতাসে সওয়ার হ'য়ে ছুটে আসে অধীর সময়
ঢেউ তার মনে লাগে নিকো, তবু মন মদির মন্থর
লৌহজিহ্ব ঘড়িটার অনৃতভাষণ এই ঘর-ঘেরা দেয়ালের পর,
সূর্য্য-ঘড়ি আকাশের গায়—
বর্ত্তমান ধ্যাননেত্রে অতীতে ধেয়ায়!
রাত্রি নয়, দিন নয়, এও এক সময়ের নতুন অধ্যায়।

দাঁড়িয়েছি নিরালায় মনচোর-জানালার ধারে,
রৌদ্রের বুদ্বুদগুলি ফোটে ফাটে হাজারে হাজারে
নেমে আসে সে-আকাশ
যে-আকাশ সমুদ্রের মত হ'তে পারে।
যে-পৃথিবী ধানে ঘাসে কাশে অবকাশে
ফিক্‌ফিক্ অনিমিখ হাসে।
সময় এখন লঘু বিশ্রামের বারিধির পারে
সময় এখন লঘু ঘুঘুদের পাখার প্রসারে
চিন্তার চঞ্চল স্রোতে মুহূর্ত্তের মুচুকুন্দ ভাসে।

যে-পৃথিবী সারা দিনমান
একদিন শুনেছিলো গান
ধানে, ঘাসে, কাশে, অবকাশে—
আলস্যের শাদা মেঘে আকাশে আকাশে।

আকাশের নীল মুখে (এখন তো) মেঘ-ব্রণ আলোকের ক্ষত
কবেকার ব্যথা নিয়ে আজো দেখি আকাশ আহত।
গলা আজ ক্লান্ত গানে গানে
দানে দানে রিক্ত ক'রে আনে,
হৃদয়ের ডিক্যাণ্টার হ'য়ে যায় ক্ষীণ।
কোথা গেল সে-দিনের সুরা,
সেই স্বপ্ন রঙীন রঙীন!

প্রেম

অরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

মিথ্যার কুহকে ঘেরা জানি প্রেম কৃত্রিম গুণ্ঠন,
তোমার হৃদয়ে আমি স্বর্গ মেনে জানায়েছি দাবী।
মদির বিহ্বল নেত্রে অনিমেষ করেছি লুণ্ঠন
কন্দর্প সৌন্দর্যরাশি, তারে আমি অপার্থিব ভাবি।
তুষার-পরম বক্ষে করুণার ঝরে প্রস্রবণ,
ঈপ্সিত অধর তব, রসনারে তৃপ্ত করি পানে।
তোমার তনুর তীর্থে কামনার করি যে তর্পণ ;
সে-পুণ্যসলিলে আমি ধন্য হই ক্ষণ-স্বর্গ-স্নানে।
অতল ভ্রান্তির ঘোরে যেই প্রেম রচি কল্পনায়,
সে-কল্পলোকের প্রান্তে নিষ্কলঙ্ক দময়ন্তী তুমি
প্রচ্ছন্ন রয়েছো মোর কবিতার প্রত্যন্ত সীমায় ;
পৃথিবীর কন্যা তুমি, মর্ত্ত্যে তবু গড়ি স্বর্গভূমি।
জান এ কৃত্রিম, তবে ভুল যদি চিরদিন হয়,
প্রমাণ প্রচুর থাক, তবু প্রেম অক্ষয় অব্যয়।

একটু সময় হবে

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সময়, তোমার নাগরাপায়ের চলা,
থামাবে একটুখানি ?
দুপুরের রোদে ট্যাংকের ছাদে
ভিজে শাড়িধুতি ঝোলে,
অলস কাকেরা ঠোঁট খোঁটাখুঁটি করে ;
সময় তোমার, একটু সময় হবে
একটু দাঁড়িয়ে দেখার ?

খালাসি পৃথিবী ছুটি নিয়ে গেছে
জাহাজ কর্মশালায়।
গাছের ছায়ায় পায়ের পাতায় পা রেখে তোমার
একটু সময় হবে—
অলস উদাস চোখে চুপ ক'রে এই সব দেখবার ?

বন্দরে বয় দুপুর হাওয়ার লু :
ছাদের স্বপ্নে, ও মেয়ে, তোমার
ভিজে এলোচুল শুকোতে দেবার
সময় একটু হবে ?
কবে ছায়াপথ জাগবে আকাশ-পথে,
জাহাজ-জেটিতে বাজবে ছুটির বাঁশি ;
তবু কি তোমার একটু সময় হবে—
গলা-ফুলো-ফুলো পায়রার ছাদে
খোলা এলোচুলে দুপুরমেয়েকে দেখার ;
বলো না, তোমার একটু সময় হবে ?

কলকাতা

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

মেয়েটি উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে
ভগীরথের সময়ের হৃদয়ের প্রতিলেখন দেখে ;
ওর বিনুনিটি ঋতুর সেতু থেকে আরম্ভ—
আর প্রান্তিক অংশটুকু নগরের পিঠের দক্ষিণ হ্রদে।
বিনুনির বাঁকে বাঁকে কত শত সরকারি অথবা
বেসরকারি দরকারি আত্মীয় রাস্তা জড়ানো।
সকালের আলোর প্রপ্রাতে,
ওর কপালের ওপর রুপোলি এলুমিনিয়মের চুল
ভগীরথের হৃদয়ের আয়নায় ঝিলমিল করে ;
মেয়েটি নামিয়ে চোখ পিঠে বিনুনি ফেলে
কী যেন নিবিষ্ট মনে দেখে।
জনতার সময়ের সমুদ্রের বাঁকাচোরা হাড়ে,
মেয়েটির অশ্রান্ত হাতে বাঁধা পথঘাট ;
আকাশের নিশ্বাসের সকালসন্ধ্যা
লাগে মেয়েটির মাথার উপর।

ঝরা পাতা

শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

ফাগুনের হাওয়া শিমূলের তুলো
ঝরা পাতাদের ঘুড়ি ওড়ায়,
উদাসী মনের নিরালা ক্ষণের
ভাবনার ভেলা কোথা উধাও !

শরতের চাঁদ রূপালি ধূলির ওড়ায় ঝড়
নিচে তুমি বসে কী যে ভাব চেয়ে নির্নিমিখ,
চারিপাশে তব রচে মায়াজাল ছায়া তরল
আমি হ'য়ে উঠি স্বপ্নবিলাসী দার্শনিক !

পশমি মেঘের গুঁড়ো উড়ে সারা আকাশটাতে
চাঁদের মেয়ের এলোচুল দোলে হাওয়ায় মৃদু
হে অপরূপা !
কতদূরে চাঁদ তবু স্ফীত বুক সমুদ্রের
দুর্দম কোন নিগূঢ় প্রেমের আকর্ষণে,
হে বিজয়িনী !
চোখের আড়ালে গেলেও যে মনে উজল তুমি
স্থূল দুবাহুর বাঁধনে কেন বা বাঁধি তোমায়,
হায় রে হায়।

লাল টিপের কাব্য

শক্তি মুখোপাধ্যায়

দামী গাড়ি থেকে নামলুম
দারোয়ান-বসানো ফটকে।
বাবুজী, সেলাম।
বলতে পারো, এ বাড়ীতে সে থাকে কিনা।
দারোয়ান ঘাড় নাড়লো ।

লাল কাঁকরের আঁকাবাঁকা রাস্তা।
ফুলগাছগুলোর ভিতর দিয়ে,
পদ্মফুল-ফোটা কৃত্রিম সরোবরের পাশ দিয়ে,
সাদা হাঁসের পদচিহ্ন অতিক্রম ক'রে,
রজনীগন্ধার গন্ধ গ্রহণ ক'রে,
আর দেবদারু গাছের হাওয়ায় সাঁতার দিয়ে
উঠলুম মার্বেল-বাঁধানো রোয়াকে।
কলিং বেল টিপতে দরোজা খুললো ঝি।
বলতে পারো, এ বাড়ীতে সে থাকে কিনা।
ঝি ঘাড় নাড়লো।

লম্বা ঘরের মধ্যে দিয়ে,
গোল ঘরের উপর দিয়ে,
এ ঘর থেকে ও ঘর, ও ঘর থেকে সে ঘর,
ঝাড়, লণ্ঠন, আসবার, কারুকার্যকরা মূর্তিগুলোকে

পিছনে ফেলে,
নানা অদৃশ্য আশ্চর্য জিনিসকে উপেক্ষা ক'রে
চ'লে গেলুম সাতমহলা বাড়ীর শেষমহলের সাততলায়।

একটি রুদ্ধ ঘরের সামনে।
পরিচারিকা বেরিয়ে এলো।
বলতে পারো, এ ঘরে সে থাকে কিনা।
পরিচারিকা ঘাড় নাড়লো।

সোনার কবাট।
সংকেত ক'রে আওয়াজ করলুম।
কবাট খুলে গেল।
ভিতরে গেলুম।
চুনি-পান্নার মেঝের উপরে
পড়েছে নতুন সূর্যের আলো।
হীরার খাটে পাতা মখমলের শয্যা,
আর তাতে ব'সে,
অলোকসামান্য রূপের আলোয় ঝলমল
অসামান্য সুন্দরী রাজকন্যা।

কোকিলের মতো কালো তার চুল,
ধনুকের মতো টানা-টানা চোখ,
আর রক্তের মতো লাল তার ঠোঁট,
দুই ভ্রূর মাঝখানে একটি লাল সিঁদুরের টিপ,
যেন দুই নদীর মিলনস্থলে
একটি মূর্তিমান সংগীত,
যার সুরে মেশানো অনন্ত প্রতীক্ষা আর অসীম রহস্য।

বললুম, ওগো লাল-টিপ-পরা মেয়ে,
এক বিন্দু উপলক্ষ্যে যেমন সহস্র-সহস্র কাহিনী,
তেমনি এক বিন্দু টিপে আমার সীমাহীন ভালো-লাগা।
বলো তো, ওগো লাল-পাড়-শাড়ী-পরা মেয়ে,
এ কেমনতরো।

মেয়ে ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষে উঠলো হেসে,
যেন ঝর্নার উচ্ছল স্রোতে পড়লো
ঝুলনপূর্ণিমার চাঁদের আলো।
বললো, গভীর রাতে সবুজ ধানক্ষেতে যখন বেজে ওঠে বাঁশি,
আর উর্বশীর নূপুর-শিঞ্জিনীতে নেচে ওঠে পুরুষের রক্ত,
তখন যেমন, এও তেমনি।

বললুম, যে-থালিতে রয়েছে শ্রেষ্ঠতমের অপরূপ অর্ঘ,
সে-থালিতে যখন লাগবে কালের স্পর্শ,
তখন বাঁচবো কী নিয়ে।
লাল মেয়ে বললো, লাল টিপের মায়া নিয়ে।

অসন্তোষের বোঝা ব'য়ে
সারাদিন পথ চললুম।
মেঠোপথ ধ'রে, কাঁচা ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে।
বাবলা বনে গাইলো মাছরাঙা পাখী,
কচু গাছের তলায় বাসা দেখলুম ব্যাঙের,
সেগুন গাছের নিচে জিরিয়ে নিলুম দুপুরের গরমে।
বিছুটি বনের ভিতর দিয়ে পথ ক'রে নিলুম,
খেজুর গাছ জানালো অভিনন্দন,

৩

কলাগাছ করলো প্রশস্তি,
সূর্য ডুবলো।
রাতের আঁধারের বিভীষিকাতেও হোলো না আমার
চলার শেষ,
বাদুড় ডাকলো, ডাকলো প্যাঁচা,
নাম-না-জানা গাঁয়ের পাশ দিয়ে,
উঁচুনিচু রাস্তার জল-কাদা ঘেঁটে,
কচুরি পানার ফুলকে পদদলিত ক'রে
চললুম আমি বেপরোয়া নির্ভীক।
আকাশে মেঘ ডেকে উঠলো গুরুগুরু,
বিদ্যুৎ চমকালো, এলো ঝড়।
তবু চললুম।

এ নদীর নাম কী গো ?
কুলনাশিনী।
ওগো মাঝি, পারে যাবে ?
মাঝি বললো, মনের কথার পালে যখন লাগে
অন্তর্কামনার হাওয়া
তখন চলে আমার তরী।
আমি বললুম, যাবো লাল-টিপ-পরা মেয়ের কাছে।
মাঝি বললো, পারের কড়ি লাগবে তোমার অভিজ্ঞতা।
তাই দেব।

নদীর জলে লেগেছে সর্বনাশের অভিশাপ,
তরী কখনো ডোবে-ডোবে, আবার কখনো ওঠে ভেসে।
কত যে ভাসলুম, কত যে ডুবলুম,
তার হিসেব মিললো না।

আকাশে কত পরে উঠলো শুকতারা,
আর কত পরে তরী স্থির হোল।
মাঝি বললো, এই তোমার ঈপ্সিতার দেশ।

দেখলুম, বুড়ো বটগাছে ঝুরি নেমেছে,
পাতায়-পাতায় লেগেছে রাতশেষের হাওয়া।
শিশির-ধোওয়া সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে এসে
থামলুম তালপাতার ছাউনি-দেওয়া একটি কুটিরে।
চালে কুমড়োর লতা, মাচায় ঝুলছে শসা,
কঞ্চি দিয়ে তৈরি করা দুয়োর।
ডাকলুম।
সাড়া পেলুম, ভিতরে এসো। ভিতরে গেলুম।

ছেঁড়া কাঁথা, ময়লা বালিশ।
ধূলিপূর্ণ, আবর্জনায় ভরা মেঝের উপর জ্বলছে
একটি প্রদীপ।
স্থির তার শিখা, প্রাখর্য নেই, আছে মৃদু একটি আলো।
দেখলুম পলিমাটির মত শ্যামলরঙা মেয়ে,
হাতে তার রূপোর গিল্টিকরা মোটা ভারি বালা,
গলায় তার রুহিতনের মতো চৌকো চওড়া হার।
কানে তার ভারি গয়না।
দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্যরিক্ততার ছাপ সর্বত্র।
মিশকালো দাঁত, দোক্তা-খাওয়া,
পুরু কালো ঠোঁট, সুডৌল, নিটোল দেহ,
ডাগর চোখে উচ্ছলতা,
আর সুচারু কপালে একটি লাল সিঁদুরের টিপ,

যেন নীল আকাশের কোলে হোলির চাঁদ,
যার আলোয় সরল সৌন্দর্যের আভাষ।
বললুম, ওগো সবুজ-পাড়-শাড়ি-পরা মেয়ে,
এক ঝলক্ বিদ্যুতে যেমন অন্তহীন বিস্ময়
তেমনি এক ফোঁটা টিপে আমার ভাষাতীত রোমাঞ্চ।
এর নাম কী।

বললো, শিশির-ঝরা ভোরের বাতাসে
যেমন শিউলি ফুলের গন্ধ,
আর বিকেলবেলায় পল্লীরমণীদের যেমন জল আনতে যাওয়া
এও তেমনি।

বললুম, হাওয়ায় যখন তুমি গন্ধ পাবে না,
আর তোমার খোঁপার রক্তজবা যখন উত্তপ্ত হবে না
দেহের রক্তকণিকায়,
তখন থাকবে কী ?

বললো, লাল টিপের ঘনীভূত সৌন্দর্যের
একটি অক্ষয় মোহ।

পাপিয়া উঠলো ডেকে,
পূর্বাকাশে অন্ধকারের আঁচল থেকে
ঝরে পড়লো নতুন আলোর রক্তকুসুম।
বললুম, এই কি সত্যি ?

প্রদীপ নিভিয়ে
উচ্ছল হাসির ধারায় সিক্ত হয়ে
মেয়ে আঙুল বাড়ালো পুবদিকে।
বললো, অরূপ থেকে রূপ,
আর আলো থেকে আঁধার,
তবু সৌন্দর্যের অনুভূতি চিরন্তন।

তুমি কি রেখেছ কথা

নরেশ গুহ

আকাশ ঘনিয়ে এলো হেমন্তের বিকেলের সুরে
কতবর্ণে কারুকাজ অস্তরাগ রংরেজিনীর,
কাহার খোঁপার গন্ধ খুলে গেলো সায়াহ্ন-তিমিরে;
নিঃসঙ্গ পাখীর মতো ক্লান্তি নিয়ে এলো ঘুরে-ঘুরে
আর-এক দিনের কথা : চোখ থুয়ে আকাশের নীলে
—তোমার রক্তের মতো পবিত্র হবো—বলেছিলে।
তারপরে কতকাল উড়ে গেছে। জলহারা মেঘ।
—তুমি কি রেখেছ কথা ?
  দেখেছ পবিত্র কিনা এ-নিঃসঙ্গ রক্তের আবেগ ?

দুটি স্প্যানিশ কবিতা

(ডস্ প্যাসস্ কর্তৃক Antonio Machadoর কবিতার অনুবাদ থেকে)

হেমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

অনুর্বর পৃথিবীর গা ছুঁয়ে চলা
একটা ওড়নার ক্ষীণ শব্দ,
আর প্রাচীন ঘণ্টার গুরুগম্ভীর কান্না।

দিগন্তের আগুনের
নিবন্ত ইন্ধন।
পিতৃপুরুষের শ্বেত প্রেত
তারাগুলো চলে জ্বেলে'।

বারান্দার জানলা খোলো।
মোহের প্রহর কাছে আসে···
  অপরাহ্ণ ঘুমিয়ে পড়েছে
  আর প্রাচীন ঘণ্টা দেখছে স্বপ্ন ॥

২

পৃথিবী মগ্ন—
অন্তর ম্লান দিগন্তের দিকে
ক্ষুধিত হায়নার মতো চেঁচায়।
কী তুমি খুঁজছ, কবি,
সূর্যাস্তে ?

কঠিন যাত্রা, কারণ পথ
পরাস্ত করে ;
কনকনে হাওয়া আর
ঘনায়মান রাত্রি আর দূরত্বের
দুস্তরতা···সাদা পথের বুকে
নত গাছের গুঁড়িগুলো কালো দেখায়,
দূর পাহাড়ের সারিতে
সোনালি আর রক্তিম।
সূর্য ঝরছে···
কী তুমি খুঁজছ, কবি,
সূর্যাস্তে ?

আশঙ্কা

কৃষ্ণা দত্ত

পদ্মার ঢেউ ভাঙে···
গর্জন কানে লাগে।
জীর্ণ প্রাণের আবর্জনার দল
ছড়ায় ইতস্তত।
আমরা কী চাই ?
তুলে রেখে দিতে বন্যার মুখ থেকে
সামান্য সঞ্চয় ?
মিটমিটে আলো মাটির দেয়ালে
ছায়া ফেলে যায়
ক্ষীণ বাঁকাচোরা আমাদের দেহে।
গাঁয়ের সন্ধ্যা
ঘুম এনে দেয় ক্লান্ত চোখের পাতায়;
ঘুম এনে দেয় সোনালি ধানের স্বপ্ন।
তারপর রাত কালো হয়ে আসে
আলকাৎরার মত,
ঘুমন্ত প্রাণ কেঁপে ওঠে শুনে
চৌকিদারের হাঁক—
মাঝ-রাতে যেন ঘুম কেড়ে নেয়
সিঁধ-কাটা কোন ভয়।
তাই তন্দ্রায় হাৎড়িয়ে দেখি
সঞ্চয় কই ?—আছে তো ধানের গুচ্ছ ?
না কি নিয়ে গেল ধূর্ত সে নিশাচর ?
রাত্রির হাওয়া কানে এনে দিল
পদ্মার গর্জন।

ত্রাসে কেঁপে উঠি—সঞ্চয় গেলো বুঝি···
উঠে যাই···দেখি, আছে, ঠিক আছে
খুব সাবধানে—
প্রহরীর মত আগলে বেড়াই ধানের মড়াই।

মনে হয়
পদ্মার জলে ঈশানী হাওয়ায়
কে যেন এ-তীরে আসে
আমাদের ভালোবেসে
ময়ূরপঙ্খী নৌকো বুঝি বা
এই তীরে ঠেকে যাবে—
সুদূর দেশের কোন পসারিণী
গভীর রাত্রে পসরা বিলোবে
মনে হয়,
মনে হয় যেন স্বপ্নে।
আমাদের চোখে লেগে গেল বুঝি
সব-ফিরে-পাওয়া স্বপ্ন।

একচক্ষু

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যতোদূর দৃষ্টি যায়
কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে রোমাঞ্চিত মনের উদ্যম
সদ্যোজাত নীপবনে সতৃষ্ণ তাকায়।
পৃথিবীতে প্রকৃতিতে আয়োজন কম
হয়নি তো কোনোদিন, চৈত্রদিনে বসন্তবাতাস
প্রবাহিত হয়েছেই, ঘনঘোর শ্রাবণের রাতে
মেঘে-মেঘে ঝরেছে আকাশ;
স্বর্ণবর্ণ তপনের কিরণসম্পাতে
মসৃণ সবুজ মাঠে হেসেছে হেমন্তের সোনালি শিশির;
গ্রীষ্মের প্রখর দিনে তীব্র আম্রমুকুলের ঘ্রাণে
ডালে-ডালে অজানিত পাখীদের ভিড়।

পৃথিবীতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে
সৌন্দর্য্যের আবেদন ঋতুতে ঋতুতে প্রতি মানুষের কাছে;
আকাশে যে সূর্য্য ওঠে তার পিছে ঘন নীলিমায়
দিগন্তের মেঘে-রঙে অপূর্ব্ব বিস্ময় দেখা যায়,—
পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে ঘোর রাতে ঘুম ভেঙে দিয়ে
খেলা করে রূপসীর মুখের মতন
সচেতন নিরুত্তাপ হৃদয়কে নিয়ে;
কখনো ফুলের ঘ্রাণ আমাদের প্রাণ ছোঁয় চুম্বনের মতো;
পৃথিবীতে আয়োজন অব্যাহত থাকে অবিরত।

আমরাই একচক্ষু শুধু, ঘূর্ণাবর্ত্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে-যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো।

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে ;
জলে স্থলে শূন্যে নীলে চিরন্তন ছায়া-শরীরিণী
নব-নব রূপে হানা দেয় দগ্ধ হৃদয়ের বিবেকের কাছে,
অনেক নিভৃত রাত্রে শোনা যায় বিচিত্র কিঙ্কিণী।
মাঠে-মাঠে ছায়া পড়ে, ছায়া সরে' যায়,
হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ আন্দোলিত গাছের পাতায় ;
মনে পড়ে' যায়
দূরের উজ্জ্বল মুখ সুবসনা সুনয়না অরূপ মধুর,
স্তম্ভিত মুহূর্ত্তে মন স্মৃতিভারে যেন তন্দ্রাতুর ;
বহু ক্রোশ পথ হ'তে এসে
হৃদয়ের গভীর প্রদেশে
ধীরে-ধীরে মেশে
একটি গভীর ক্ষীণ সুর।

নিভৃত হৃদয় নিয়ে যদি কোনো একদিন শুভ অবসরে
আচ্ছন্ন হৃদয়বাষ্প ফুল হ'য়ে ঝরে,
স্নানরতা রমণীর পদ্মওষ্ঠে স্তনযুগে কটিতটে চোখ গিয়ে পড়ে,
দোলা লাগে হাড়ভাঙা বক্ষের পিঞ্জরে,
মনে রেখো নীলাকাশ বাঁকা চাঁদ নীল ফুল মাঠের শিশির,
পাতার আড়ালে পাখীদের
ছায়াঘেরা ছোট-ছোট নীড়।
প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে,

কুমারীর মতো তার অনেক প্রত্যাশা
আগন্তুক মানুষের কাছে ;
প্রখর বিবেক-বাণ প্রাণে অবিরত,
আমরাই একচক্ষু, আমরাই ঘূর্ণাবর্ত্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে-যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো,
বাঁচবো কী নিয়ে ?
তবুও হঠাৎ যদি সংসারের আবর্জনা ঠেলে
নীড়মুখী পাখীর মতন
দুরন্ত আবেগ বুকে জ্বেলে
একঘেয়ে প্রয়াসের হয় ব্যতিক্রম,
যদি দূরে দৃষ্টি যায়
কল্পনার সিঁড় বেয়ে রোমাঞ্চিত মনের উদ্যম
সদ্যোজাত নীপবনে ফুলে ফলে সতৃষ্ণ তাকায়
মনে রেখো পৃথিবীর রোমাঞ্চিত প্রকৃতির মৌন প্রতীক্ষার
কোনো অন্ত কোনো সীমা কোনো শেষ নেই,—
আচ্ছাদন খুলে ফেলে রমণী নেমেছে যেই জলে
কামনার পদ্মগুলি ফোটে পলে-পলে,
মনে রেখো নীতিবাক্য : অপমৃত্যু ডেকে আনে একচক্ষু
যতো হরিণেই॥

দিল্লিকা ছর্‌রা

পরিমল রায়

তোমরা বল দিল্লিকা লাড্ডু,
আমরা বলি, দিল্লিকা লাট্টু।
ঘুরছে লুটের লাট্টু রে ভাই,
লম্বা যে তার লেত্তি,
দেখতে আসে ভিড় করে' তাই,
হরেক রকম ব্যক্তি।
হাতে ঘোরায়, হাত বদ্‌লায়,
হাতাহাতি কাণ্ড,
শেষকালে এক অট্টালিকা
হাঁকড়ায় প্রকাণ্ড,
গুগ্‌লি গেলে ব্যাঙে, এবং
ব্যাঙকে গেলে সর্প,
কোত্থেকে এক বেজি এসে
ঘোচায় সাপের দর্প।

মারবে এখন বেজি কে?
এমন, বল, তেজী কে?

আকাশে ও অঙ্গনে নিদারুণ কন্‌কনে
এখনি যা ঠাণ্ডাটা বইলো,
কী হবে-যে পৌষে জানিনে আদৌ সে,
ভেবে মন শিহরিত হৈল।

ওরে তোরা রুষকে দে না, ভাই, উস্‌কে,
সোভিয়েট এসে যাক্‌ তালুকে।
কাঁথা যার সম্বল, চাই তার কম্বল,
সারা দেশ ছেয়ে যাক্‌ ভালুকে।

লোকে মরে বাংলায়,
কে বা কাকে সামলায়,
দিল্লির দায় নয় এক তো,
ফকির অব্‌ ইপি-কে
করে টেপাটেপি কে,
অতএব কোরো নাকো ত্যক্ত।
সবই হবে আস্তে,
শেখো বাপু হাস্‌তে,
হেসে-হেসে প্রাণ দাও বাঙালি,
শরীরে কি প্রাণ নাই?
আছে শুধু কান্নাই?
এ কী প্রাণধারণের কাঙালি!

সবুরে…

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ি, গাড়ি, টেলিফোন,
মসৃণ জীবন ;
মোটা স্বামী, মোটা মাইনে, মোটাসোটা
দুটি কি তিনটি ছেলেমেয়ে।
এই সব পেতে-পেতে, নিতে-নিতে
কেটে গেল পঁচিশ বছর ;
ভেবেছি, আগে তো বাঁধি ঘর,
কাব্যচর্চা পরে হবে।
তারপর
এই তো আর-বছর
পাহাড়ে ছুটির বাড়ি, রঙিন বাগান
সবে হ'লো সারা,
কাব্যজীবন সুরু করতেই দেখি,
মন গেছে মারা।

মাতলামো

তাও ইউয়ান-মিং
(৩৬৫-৪২৭ খৃঃ)

"হাতে কোনো কাজ নেই, বাড়িতে বসে আছি, মনে নেই সুখ। এখনকার এই রাত্রিগুলোও দীর্ঘ হয়ে গেছে। হঠাৎ কাছে পাই দামী মদ, এমন রাত যায় না যেদিন মদ না খাই। কিন্তু বড় একলা, নিজের ছায়ার দিকে চেয়েই রাত কাটে। একটুতেই মাতাল হয়ে পড়ি, কিন্তু তারপরও নিজের খুসীমতো লিখি গোটাকয়েক ছত্র। ক্রমেই কবিতার স্তূপ জমে যায়। আজে-বাজে নানা লেখা। খেয়ালের ঝোঁকে এক পুরোনো বন্ধুকে দিয়ে সেগুলো ভালো করে নকল করিয়ে নিয়েছি।"

(১)

জীবনের উঠতি নামতির কিছুই চিরস্থির নয়
সবই বদলায় ঘুরে ঘুরে।
সাও ফিংকেও ফলের চাষ করতে হয়েছিলো,
তুং লিং এর দেশও আজ নেই।
শীত, গ্রীষ্ম, দুজনকেই জায়গা ছেড়ে যেতে হয়,
মানুষের ধর্মও তো তাই।
যারা সব জানে তারা এটা বোঝে
যা গেছে তা নিয়ে তারা সন্দেহ করে না।
হঠাৎ মদের পেয়ালা পেলে
দিনরাত তা আঁকড়ে ধরে থাকি।

(২)

কথা আছে, জন্ম-জন্মান্তরের জমানো পুণ্যের
সুফল তুমি পাবে,
তবু,তো প-ই আর স্-ছি

* গদ্য ভূমিকাটি কবির নিজের।

এরা থাকতো পশ্চিমের পাহাড়ে,
শেষে না খেতে পেয়ে মারা গেল।
পাপ-পুণ্যের ফল-লাভ তো ঠিক মানুষের হয় না
তবে কেন এই ফাঁপা কথাগুলো চেঁচিয়ে মরে ?
সেই যে নব্বুই বছরের বুড়ো বিনা বঁড়শিতে মাছ ধরতো
আগে তো তাকেও শীত আর ক্ষিদে নাকাল করেছে।
নিজের নিজস্বটিকে ভদ্রভাবে মেনে চলা কিছু নয়
শত শতাব্দী পরে কে ভাববে তোমার কথা ?

(৩)

আজ থেকে হাজার বছর আগে সত্যের মরণ হয়েছে,
সেইজন্যেই তো সবাই আজ দুঃখু করে।
এ যেন মদ রয়েছে অথচ মদ খাই না।
তোমরা কেবল জগতে নামের প্রত্যাশী
কিন্তু দামী জিনিষের সার হচ্ছে নিজের শরীর।
এই নাম কেনা কেবল নিজের জীবনেই
সারা বিশ্বপ্রাণে তার অংশই নেই কোনো।
ক'টাই বা বছর বাঁচবে ?
বিদ্যুতের ঝলকানির মত দ্রুত।
বড় জোর একশ বছর,
কিন্তু এই শরীর নিয়ে তোমার হবেই বা কী ?

(৪)

বস্তির ভিতর আমার ছোট্ট কুঁড়ে
তবু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ এখানে নেই।
"এ-রকম ভাবে আপনি থাকেন কী করে ?"
"আমার মন তো এখানে থাকে না,
সে থাকে এখান থেকে অনেক দূরে নির্জনতার মধ্যে।"

গিয়েছিলুম পূবের বাঁখারি ঘেরা বাগানে
চন্দ্রমল্লিকা তুলতে :
আস্তে চোখের পাতা তুলেই দেখি দক্ষিণের পাহাড়।
পাহাড়ের হাওয়া সবচেয়ে ভালো
ভোরবেলায় আর গোধূলিতে।
আকাশের এই পাখিরা আমার সঙ্গে
মিতালি পাতিয়েছে।
এর প্রত্যেকটাই সত্য
আমি বোঝাতে চাই কিন্তু কথা ভুলে যাই।

(৫)

হেমন্তে চন্দ্রমল্লিকার অপরূপ রূপ,
ভোরবেলা শিশির-ভেজা ফুল তুলবো।
আমি এই ফুলে ডুবে
এর 'দুঃখ-ভোলা' নাম সার্থক করি।
এই ফুল আমাকে উপহার দেয় বৈরাগ্যের নেশা।
একলা, তবু এক পেয়ালা চলে,
কেউ তো নেই তাই পেয়ালা শেষে নিজেই আবার ঢেলে নি।
সূর্য্য ডোবে, সব-কিছুর মধ্যে ব্যস্ততা
মিলিয়ে যায়, নিবে যায়।
ঘর-ফেরা পাখির দল চলেছে
বনের দিকে ডাকতে-ডাকতে।
পূবের ঘরে ব'সে খুসীমত শিষ দিয়ে চলি।
জীবনের ক'টা দিন মজায় কাটাই।

(৬)

ভোরে দরজায় ধাক্কার শব্দ,
তাড়াতাড়ি উল্টো জামা গায়ে চড়িয়ে দরজা খুলি,

শুধোই, "কে তুমি ?"
দেখি বুড়ো চাষী এসেছে তার প্রীতি নিয়ে।
দূর থেকে ব'য়ে এনেছে মদের ভাঁড়।
শুধোয়, "কেমন আছেন ?"
আমার মনে হয় এই দিনকালের সঙ্গে আমি বেখাপ্পা।
ব'লে, "মানিয়ে বাঁচতে গেলে এইরকম ছেঁড়াখোঁড়া
খোড়োচাল তো যথেষ্ট নয়।
এ-জগতে সবার ওই সমান ধরন
ওদের সঙ্গে মিশে ওদের মদে পিষে ফেলো।"
ও গুরুজন, ওর কথায় মন গলে যায়।
মায়ের পেটেই পেয়েছি এই বেসামাল ছন্দ,
"আলগা লাগামে" চলা শিখতে পারি
কিন্তু মন বলছে সেটা ভুল হবে।
তার চেয়ে এসো একটু মদ টানা যাক্,
আমার ঘোড়ার খ ফেরার নয়।

(৭)

বহুদিন আগে বেরিয়ে চ'লে গিয়েছিলুম অনেক দূরে,
সোজা পূব-সাগরের কোণে।
দূরের পাড়িতে আঁকাবাঁকা রাস্তা,
মাঝে আছে ঝড়, তুফান, বিপদ, বাধা।
এই পাড়ির জন্য দায়ী কে
এখন বোধ হচ্ছে ক্ষুধার তাড়া।
এক পেট ভরাবার ব্যবস্থায় সব ছেড়েছিলুম,
একটু পেতেই যথেষ্ট হয়েছে।
পাছে সামান্য এই কাজের জন্যে নাম খোয়াই,
তাই রথের মুখ ফেরাই আরামে।

(৮)

পুরোনো বন্ধুরা আমার খেয়ালের তারিফ করে,
মদের পাত্র আসে, একে-একে আসে অন্য অনেকে।
ঘাস সরিয়ে ঝাউ-ডালের নিচে বসা যায়
কয়েক পেয়ালাতেই সুরু হয় মাতলামো।
গুরুজনদের কথাও হ'য়ে পড়ে খাপছাড়া।
যেমন-তেমন মদ ঢেলে চলি।
নিজের সত্তা আছে কি নেই বুঝি না,
উপকরণের দাম কী ক'রে বোঝো ?
কে যে রয়েছে ঝোঁকের মাথায় তাও ভুলেছি,
মদে রয়েছে গভীর সোয়াদ।

(৯)

ছেলেবেলায় কাজের চাপ ছিল কম
তখন ভাব জমিয়েছি সব ধরনের বইয়ের সঙ্গে।
ক্রমশ চল্লিশে পৌঁছে দেখি
একেবারে ডুবেছি, সবই বৃথা।
শেষে ভদ্রতার খাতিরে
ক্ষিধের আর ঠাণ্ডার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হয়েছে।
জীর্ণ কুটির মিতা পাতিয়েছে দুঃখের হাওয়ার সঙ্গে—
বুনো ঘাসে আঙিনা একেবারে ঢাকা,
চাদর মুড়ি দিয়ে লম্বা রাত কাটাই,
ভোরে মোরগ আর ডাকে না
বন্ধু মংকুং এখানে নেই···
শেষ পর্যন্ত আমার আবেগকে ঢাকা দিয়ে রাখি।

(১০)

ই আর থুং আমার অনেক আগে,
তারপর পৃথিবীতে সত্যের লোপ
লু দেশের বুড়ো সারাক্ষণ ব্যস্ত,
জোড়াতাড়া দিয়ে দেশকে ভালো করে তুলবে,
তবু ফং পাখি এলো না।
সঙ্গীতে আর ব্যবহারে কিছুদিনের জন্য এলো নতুনত্ব,
এই ক্ষাণ শব্দও শেষে থেমে গেল।
মত্ত স্রোত এলো পাগল ছীং এর কাছে
বইয়ের আর কী পাপ ?
একদিনে তারা ছাই আর ধুলো বনে গেল।
তারপর এল বুড়ো পণ্ডিতের দল,
চললো আসল ধৈর্য্যের কাজ
কিন্তু পরের দলে কোনো বইয়েরই দাম নেই,
সারাদিন কেবল গাড়ি চড়া আর হাঁটা
কোথায় এরা যাবে, কোনোই উদ্দেশ্য নেই।
তাহ'লে মজা ক'রে মদ চালাও,
খোলা পাগড়ির অপমান কোরো না।
নিজের ভুলের জন্যে আমি নিজেই দুঃখিত,
মাতালকে আপনারা ক্ষমা করবেন ॥

অনুবাদ—অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালো চুল

বুদ্ধদেব বসু

আজো তো মনে হয় মেঘ যেন মেঘ নয়, কার চুল,
　　কার চুল, কালো চুল, এলো চুল,
　　কঙ্কাবতীর কালো এলো চুল !
কঙ্কাবতী তার কালো চুল খুলে দিলো সন্ধ্যার সোনালি বারান্দায়,
　　স্বর্গের মায়াবী বারান্দায়,
　　লাল সূর্যাস্তের জানলায় ;
লাগলো আলো চুলে, জাগলো উচ্ছ্বাস স্বচ্ছ সবুজের,
বিলোল হলুদের আগুনে বেগনির বিশ্রাম,
　　উষ্ণ বাদামির হৃদয়ে ধূসরের শান্তি,
　　রঙের অঙ্গনে আঁধার সন্ধ্যার শান্তি।

আর্দ্র-উজ্জ্বল ধারালো-ছলোছলো ভাদ্রের হলদে বারান্দায়
　　কঙ্কাবতী এসে দাঁড়ালো,
খুলে দিলো কালো চুল, আহা কী কালো চুল। লাল সূর্যাস্তের সন্ধ্যায়।
　খুলে গেলো পশ্চিমে সূর্যের জাদুকর জানালা
রঙের রূপসীরা বাড়ালো মুখ ঐ শৌখিন প্রাসাদের জানলায়,
দাঁড়ালো দলে-দলে রৌদ্রের প্রাসাদের ধারালো-জ্বলোজ্বলো জানলায়,
　　পশ্চিমে অন্তিম সূর্যের জানলায়-জানলায়।
তবু তো পার হ'য়ে উত্তাল-লাল আর উদ্দাম হলুদের বন্যা
　　কখন তুমি এলে, কঙ্কা !
সিন্দূর-আলতার হলদে-লালে জ্ব'লে আহ্লাদে গ'লে যাক সন্ধ্যা,
　　রাত্রি তুমি নিলে, কঙ্কা।
তোমার কালো চুল ছড়ায়ে দিলে দূর নীল দিগন্তের প্রান্তে,

মত্ত বিপ্লবী অপলাপ পার হ'য়ে দাঁড়ালে শাশ্বতী শান্তি ;
আর্দ্র-উজ্জ্বল তীব্র-থরোথরো ভাদ্রের সৌম্য সীমান্তে
আশ্বিন এনে দিলে, কঙ্কা !

সৌর-শৌখিন দীপ্ত জানালায় নিবলো একে-একে
রেশমি রূপসীরা ; সোনালি অপ্সরী সাজলো সবুজে ;
হলদে আগুনের রঙ্গ থেমে গেলো বেগনি-বাদামির
অলীক অঙ্গনে ; রঙের রঙ্গের রঙ্গমঞ্চের পঞ্চ অঙ্ক
হঠাৎ হ'লো শেষ; সন্ধ্যাতারা-ফোটা শান্ত আশ্বিনে
তীব্র ভাদ্রের সন্ধ্যা নিবলো ; বাজলো ঘণ্টা
শিউলি-শিশিরের ; নামলো নিঃসীম নীলিম রাত্রি
ধূসর সুন্দর দূর দিগন্তে ; আলোর উল্লোল
আকাশ ডুবে গেলো কালোর বন্যায়
তোমার নীল-কালো চুলের বন্যায়, কঙ্কা, কঙ্কা !
বাজলো ঘণ্টা কঙ্কা কঙ্কা অন্ধকারে আর
সন্ধ্যাতারকার স্তব্ধ সবুজে। সব তো হ'লো শেষ,
এখন শুধু তুমি, শব্দ শুধু শুনি কঙ্কা, কঙ্কা,
কঙ্কা, কঙ্কা !
তারার কম্পনে লক্ষ-কোটি যুগ বাজায় কঙ্কণ
কঙ্কা, কঙ্কা !
আঁধার আকাশের হাজার বিশ্বের বহ্নি হ'লো লীন
তোমার কালো চুলে,
তারার অগ্নিতে ছড়ালো মগ্নতা তোমার কালো চুল,
তোমার কালো চুল যুগ-যুগান্তের দূর সীমান্তে
ছড়ালো শান্তি, অতল অন্তিম শান্তি, শান্তি,
শান্তি, কঙ্কা,
কঙ্কা, শান্তি।

কঙ্কা, তুমি যেই দাঁড়ালে বিশ্বের ছায়াপথে ছড়ানো বারান্দায়,
দাঁড়ালে চুপ ক'রে কুটিল জঙ্গম কালের ক্রান্তির প্রান্তে,
একটু মুখ তুলে খুলে দিলে কালো চুল লক্ষকোটি তারা ছড়ায়ে,
অমনি শান্তি, শান্তি নামলো,
থামলো ক্রান্তির মত্ত উচ্ছ্বাস,'
ডুবলো কালো চুলে বস্তু-বিশ্বের ব্যস্ত উচ্ছ্বাস,
ডুবলো বিপ্লব নিশীথ-নিঃসীম নীল সমুদ্রে,
কঙ্কা, কঙ্কা !
আঁধার-বন্যায় হাজার বিশ্বের তারার বুদ্বুদ
ফুটলো, ডুবলো,
বিশ্ব-বস্তুর বুকের বিদ্যুৎ মিশলো কালো চুলে,
শান্তি, শান্তি।
মত্ত অস্থির রঙিন দৃশ্যের নৃত্য ফেলে দিলো
লজ্জা, সজ্জা,
মগ্ন হ'লো তার নগ্ন সত্তা স্তব্ধ রাত্রির
লগ্নে, কঙ্কা ;
কঙ্কা, তুমি এই স্তব্ধ গম্ভীর আদিম অন্তিম
রাত্রি, শান্তি,
'সব তো হ'লো শেষ, এখন শুধু তুমি, তোমার কালো চুলে
শান্তি, শান্তি।

অভিষেক

বুদ্ধদেব বসু

আমি তো বুঝিনি কবে যুবরাজ-গ্রীষ্মের স্বরাজ
কেড়ে নিলো বিপ্লববিলাসী বর্ষা ; কখন আকাশে
শ্রাবণের বাণিজ্যের দিগ্বিজয়ী মৌশুমি জাহাজ
চূর্ণ হ'য়ে ছড়ালো গোপন পণ্য নীলের বিন্যাসে,
অধমর্ণ অক্ষম মেঘের বর্ণে, হলুদে, সবুজে,
লালে, সোনালির আশ্চর্য অলীকে ; তারপর দূর
দিগন্তের ধূসর কম্পনে লীন, সন্ধ্যার গম্বুজে
রেখে গেলো সন্ধ্যাতারা, অন্ধকারে নিঃসঙ্গ বিধুর।

বিধুর ? . . . তাহ'লে কেন শান্তি ঝরে শেফালি-শিশিরে,
রাত্রি কেন ধ্রুপদী তারায় মগ্ন, তৃপ্ত কেন দিন ?
ঐ ! ঐ ! বৈশাখের যুবরাজ রাজা হ'য়ে ফিরে
এলো আজ, এলো শুভ্র, শুদ্ধশীল, মনস্বী আশ্বিন !
অগ্রিম অম্লান যেন অন্তিম শ্রাবণে দিলো ঘিরে
ক্ষমার ক্ষমতা দিয়ে, শ্রীলতার শৃঙ্খলে স্বাধীন।

শীত

বুদ্ধদেব বসু

হে শীত সুন্দর শান্ত, হে উজ্জ্বল নম্র নীল দিন,
উদয়াস্ত সূর্য দিলো উজ্জীবনী শোণিত-শর্করা
বিন্দু-বিন্দু তোমার শিরায় ঢেলে, হ'লে রৌদ্রলীন
তনুর তন্তুর জালে, আকাশের মেঘচিহ্নহীন
মেদশূন্য সৌম্য সুষমায়, উত্তরের তীক্ষ্ণ, কড়া
হাওয়ার স্নায়ুর টানে ;—তবু কেন, তবু কেন জরা
তোমার কুঞ্চিত মুখে আঁকে সূক্ষ্ম মৃত্যুর মহড়া—
কী শীর্ণ কৃপণ আলো, ক্লান্ত, ম্লান, কৃশ তবু দিন !

আমিও, আমিও তা-ই। আমারেও সূর্যের শোণিত
দিলো তার অমরত্ব-স্বত্ব-সার জায়ার জঠরে,
শিশুর সর্বস্ব-স্পর্শে, যুগ্ম-যুক্ত ঘুমের কোটরে,
অফুরন্ত, অন্তহীন ! . . . লজ্জা-ভাঙা আশ্চর্য সম্বিৎ
যেন তীব্র তপ্ত বেগ হৃৎপিণ্ডে কম্পিত মোটরে ! . . .
তবু তাপ, তাপ নেই ! . . . তবু শীত, তবু আসে শীত !

মাইকেল

মাইকেলের খ্যাতির সঙ্গে মাইকেলের কীর্তির সুমাত্রা-সূত্রের সম্বন্ধ নয়। যদিও পণ্ডিতেরা পক্ষপাতী ছিলেন না এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর ঠোঁট বেঁকিয়েছিলেন, তবু সমসাময়িক পাঠকসমাজে মাইকেলের আধিপত্য সূচিত হয়েছিলো মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশিত হবার আগেই। আর তার পর থেকে আজ প্রায় একশো বছর ধ'রে আমরা অবিশ্রান্ত শুনে আসছি যে মাইকেল মহাকবি, বাংলা সাহিত্যের ত্রাতা এবং বাংলা কাব্যের মুক্তিদাতা। তাঁর ঘটনাবহুল নাটকীয় জীবন, জীবনের শোকাবহ সমাপ্তি তাঁর প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেছে; এবং সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে পুনরুজ্জীবিত মাইকেলের যে-ছবি ফুটেছে তার দিকে ভালো ক'রে তাকালে এ-কথা মনে না-ক'রে পারা যায় না যে বাঙালি আসলে তাঁর কবিকর্ম সম্বন্ধে ততটা উৎসাহী নয়, যতটা তাঁর জীবনীর অসামান্য চিত্রলতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসী।

সত্যি বলতে, মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী, দুর্মরতম কুসংস্কার। কর্মফল তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে সেই ভুল স্বর্গে যেখানে মহত্ব নিতান্তই ধ'রে নেয়া হয়, পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। এ-অবস্থা কবির পক্ষে সুখের নয়, পাঠকের পক্ষে মারাত্মক। আধুনিক বাঙালি পাঠক মাইকেলের রচনাবলী প'ড়ে এ-মীমাংসায় আসতে বাধ্য যে তাঁর নাট্যরাজি অপাঠ্য এবং যে-কোনো শ্রেণীর রঙ্গালয়ে অভিনয়ের অযোগ্য, মেঘনাদবধকাব্য নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশপদাবলী বাগাড়ম্বর মাত্র, এমনকি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বীরাঙ্গনাকাব্যেও জীবনের কিঞ্চিৎ লক্ষণ দেখা যায় একমাত্র তারার উক্তিতে। মাইকেলের ইংরেজি পত্রাবলীতে প্রাণশক্তির যে-প্রাচুর্য দেখি, এটা আশ্চর্যই যে তার সংক্রমণ দুটি প্রহসন ছাড়া আর-কোনো রচনাতেই নেই—এবং প্রহসন দুটিও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নাটক

নয়, নবিশের কাঁচা হাতের কৃশাঙ্গ নকশা মাত্র, অনেকটাই তার ছেলেমানুষি। কিন্তু এ-সব কথা মুখ ফুটে কেউ কি কখনো বলেছে? একেবারেই বলেনি, এত বড়ো অপবাদ বাঙালির ধীশক্তিকে দেবো না, রবীন্দ্রনাথের একুশ বছর বয়সে লেখা মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা স্মরণীয়। ঐ প্রবন্ধের চিন্তাবিন্যাসে অপরিণত মনের পরিচয় স্বভাবতই আছে, কিন্তু নিছক সত্যই যে বলা হয়েছিলো তাতেও সন্দেহ নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রচলিত কুসংস্কারের প্রভাবে সে-প্রবন্ধ পরবর্তী জীবনে প্রত্যাহরণ ক'রে অন্য-কোনো সুযোগে মাইকেলের স্তুতি করেছিলেন, তাও প্রচলিত কুসংস্কার অনুসারেই। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের সমালোচনার বক্তব্য ছিলো এই যে মেঘনাদবধকাব্য কবিত্বের কেরানিগিরি মাত্র, মাইকেল স্রেফ নকলনবিশি ছাড়া আর কিছুই করেননি, এপিকের বিভিন্ন লক্ষণ প্রাচীন সাহিত্য থেকে জেনে নিয়ে অন্ধ অধ্যবসায়ে তার প্রত্যেকটি প্রয়োগ করেছেন: ভাবখানা এইরকম যেন 'এসো একটা এপিক লেখা যাক' ব'লে সরস্বতীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে এপিক লিখতে ব'সে গেলেন।

বলা বাহুল্য, এ-সমালোচনা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। উত্তর-রবীন্দ্রের ভাষায় বলতে গেলে, মেঘনাদবধকাব্য হ'য়ে-ওঠা পদার্থ নয়, একটা বানিয়ে-তোলা জিনিশ। আয়োজনের, আড়ম্বরের অভাব নেই, সাজসজ্জার ঘটাও খুব, কিন্তু সমস্ত জিনিশটা আগাগোড়াই মৃত, কোথাও আমাদের প্রাণে নাড়া দেয় না, হৃদয়ে আন্দোলন তোলে না। পুরোপুরি নয় না হোক, অন্তত পাঁচটা-ছ'টা রস মেপে-মেপে পরিবেশন করেছেন কবি, কিন্তু তাঁর বীর রসে উল্লাস নেই, আদি রসে হৃৎস্পন্দন নেই; তাঁর করুণ রসে চোখ শুকনো থাকে এবং বীভৎস রস শুধুই বীভৎসতা। মহাকাব্যের কানুন সবই মেনেছেন তিনি, বড্ড বেশি মেনেছেন; কখনো মিল্টন, কখনো বা হোমরকে স্মরণ ক'রে নিয়ম-রক্ষার জন্য তাঁর অশ্রান্ত ব্যস্ততা: ফলে সমগ্র কাব্যটি হয়েছে যেন ছাঁচে-ঢালা কলে-তৈরি নির্দোষ নিষ্প্রাণ সামগ্রী; দোকানের জানলার

শোভা, ড্রয়িংরুমের অলংকরণ, কিন্তু অন্তঃপুরে অনধিকারী ; কিঞ্চিদধিক ছয় সহস্র পংক্তির মধ্যে দুটি চারটির বেশি নেই যা প'ড়ে মনে হয় কবি শুধু নিয়মমাফিক চলতে চাননি, কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

তারুণ্যের সত্যভাষণ' ভারতীতে প্রকাশিত হবার পঁচিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজ-নিন্দার প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করলেন 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে। ভারতীয় চিত্তবৃত্তির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য চিন্তার শুভপ্রসূ মিলনের উদাহরণরূপে তিনি যে মেঘনাদবধকাব্যকেই নির্বাচন করেছিলেন তার প্রকৃত কারণ কি এই নয় যে মানসী কি সোনার তরী কি কাহিনীর উল্লেখ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো? 'মেঘনাদবধকাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রামরাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রামলক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে-ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। ...যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে-মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিল।' এ-কথা মনে করা কি সম্ভব যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানতেন না তাঁর এই মন্তব্যে যাথার্থ্য নেই, আছে শুধু চলতি মতের পুনরুক্তি? মাইকেল সম্বন্ধে যে-ক'টি প্রবাদ বাঙালির মনে বদ্ধমূল, তার মধ্যে এইটেই প্রধান যে ঝিমিয়ে-পড়া ধমনীতে পাশ্চাত্ত্য রক্ত সঞ্চার ক'রে বাংলা সাহিত্যকে চেতিয়ে তোলেন তিনিই প্রথম। সত্যই যদি তা-ই হ'তো,

তাহ'লে মাইকেলের অনতিপরে এবং তাঁরই প্রভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎস খুলে যেতো, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষায় ব'সে থাকতো না। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মাইকেলের প্রভাব যে বলতে গেলে শূন্য, এমনকি মোহিতলালের প্রশংসনীয় উদ্যম সত্ত্বেও তাঁর প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর পর্যন্ত জাদুঘরের মূল্যবান নমুনা হ'য়েই রইলো, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-সাধনায় তাঁর ব্যর্থতার এইটেই প্রমাণ। বললে হয়তো কালাপাহাড়ি শোনায়, কিন্তু কথাটা একান্তই সত্য যে বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য ভাব মাইকেল আনতে পারেননি, এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; মাইকেলে শুধু আকাঁড়া অনুকরণ (যার সবচেয়ে লোমহর্ষক দৃষ্টান্ত অষ্টম সর্গের নরকবর্ণনা), রবীন্দ্রনাথে সমস্ত অনুপ্রাণনা। শুধু জনরব দ্বারা চালিত না-হ'য়ে মন দিয়ে মেঘনাদবধকাব্য পড়লে আজকের দিনের যে-কোনো পাঠক বুঝবেন যে প্রকরণের অভিনবত্ব বাদ দিলে তাতে 'অপূর্ব পরিবর্তন' বা 'বিদ্রোহ' কিছুমাত্র নেই, বরং সে-গ্রন্থ দৃষ্টিহীন গতানুগতির একটি অনবদ্য উদাহরণ। শুধু প্রহসন দুটিতে ছাড়া অন্য সর্বত্রই এই অনম্য গতানুগত্য মাইকেলের শক্তিকে পাংশু ক'রে দিয়েছে: নামে, পানাহারে, নিত্যকর্মে ও নিত্যকার ভাষায় প্রতিশ্রুত বিজাতীয় হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা সেইজন্যই, তাঁর রচনায় যে-মন প্রকাশ পেয়েছে তা তৎকালীন লোকধর্মের সংকীর্ণ সংস্কারে আবদ্ধ। যদি তিনি ব্যাস-বাল্মীকির নৈষ্ঠিক অনুসরণ করতেন, তাহ'লেও সংস্কার-পাষাণের শাপমুক্তি হ'তো; কিন্তু মূল পুরাণের কঠোর বাস্তবিকতা কাশীরাম-কৃত্তিবাসের কৃপায় সেই যে লোকাচার-প্রচারে অধঃপতিত হ'লো, বাঙালির পক্ষে তার প্রভাব এড়ানো আজ পর্যন্ত দুঃসাধ্য, এবং তার নির্জীবক সংক্রাম থেকে মাইকেলের দুর্দান্ত বিলেতিপনা তাঁকে বাঁচাতে পারেনি। হয়তো আদিকবির বিশ্বব্যাপী অনুকম্পা বর্তমান জগতে সম্ভবই নয়, আর তা-ই যদি হয়, তাহ'লে তো পুরাণের পুনর্জন্মই আধুনিক কবিকৃত্য, দেশে-দেশে, যুগে-যুগে তা-ই ঘটেছে, ইংরেজি সাহিত্যে চসর থেকে ইএটস পর্যন্ত, আমাদের

দেশে রবীন্দ্রনাথ থেকে…কোন পর্যন্ত তা আরো দু'চারশো বছর পরে কোনো সমালোচক বলতে পারবেন। এখানে অনুধাবনযোগ্য এইটুকু যে আমাদের সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্ম মাইকেল ঘটাননি, ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : পুরাণ বা ইতিহাসের কাহিনীকে বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারলে তবেই তা নিয়েই কাব্যরচনা সার্থক, এবং এ-কাজ প্রাক্-রবীন্দ্র বাঙালি কবিদের মধ্যে কেউ পারেননি, কোনো-একজন কোনো-একটি রচনাতেও না। বাংলা সাহিত্যে চিত্রাঙ্গদা যে কত বড়ো যুগান্তকারী গ্রন্থ সুদ্ধু সেইটে উপলব্ধি করবার জন্য, মাইকেল তো বটেই, উপরন্তু হেম-গিরিশচন্দ্রাদির সঙ্গেও কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় বাঞ্ছনীয়। আর অর্জুন-চিত্রাঙ্গদাই শুধু নয়, কর্ণ, গান্ধারী, দেবযানী, দুর্যোধন প্রত্যেককেই রবীন্দ্রনাথ নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন এমন মনোলোক, আদিকবির কল্পলোকের ত্রিসীমানায় যা ছিলো না। এরা প্রত্যেকেই বর্তমানের অন্তর্গত, আধুনিক বিশ্ববাসীর স্বজাতি, এদের মুখের কথায় আমাদেরই জীবনের স্পন্দন আমরা শুনি। অসম্ভব হ'তো দুর্যোধনের জয়োল্লাস, গান্ধারীর পতিভর্ৎসনা, দেবযানীর প্রণয়-সৌরভ, যদি না কবি উনিশ শতকী পাশ্চাত্য মনুষ্যধর্মে দীক্ষিত হতেন। রবীন্দ্রনাথের এ-সব কাব্য থেকে এই মহৎ শিক্ষাই আমাদের গ্রহণীয় যে চিরন্তনতা স্থাণুতার নামান্তর নয়, সাহিত্যে তাকেই চিরন্তন বলে যার মধ্যে অব্যক্ত ইঙ্গিতের পরিমণ্ডল সমস্ত ভবিষ্যৎকে আপন গর্ভে ধারণ করে, যুগে-যুগে অজাতের জন্মে, অব্যক্তের ব্যঞ্জনায় যার অপূর্ব রূপান্তর কখনোই শেষ হয় না। এই রূপান্তরের যাঁরা যন্ত্রী, বা যন্ত্র, তাঁরাও মহাকবি, এবং ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের পরে এ-আখ্যা শুধু রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। পুরাণের চিরন্তন চরিত্রগুলিকে রবীন্দ্রনাথ স্বকালের মুখপাত্র ক'রে তুলেছেন এমনভাবে যে তারা মহাভারতের অপভ্রংশ আর নেই, তাদেরও স্বাধীন সত্তা হয়েছে, তারাও স্বতন্ত্ররূপে চিরন্তন।

আর মাইকেল? রাম-রাবণ সম্বন্ধে আমাদের মনে যে-একটা

বাঁধাবাঁধি ভাব আছে, সত্যি কি তার শাসন তিনি ভেঙেছেন? সত্যি কি তাঁর রচনায় রামলক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো? সত্যি কি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলায় তাঁর আনন্দ? না, এর কোনোটাই না। কেননা মুখে যদিও তিনি সদম্ভে বলেছেন, 'I despise Ram and his rabble', কার্যত তিনি ভীরুতায় তাঁর অবজ্ঞাভাজন রামেরই সমকক্ষ, প্রভেদ শুধু এই (এবং এ-প্রভেদ মাইকেলের পক্ষে সর্বনাশী) যে রাম ধর্মভীরু আর তিনি প্রথাভীরু। মিল্টন সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে মনে-মনে তিনি শয়তানেরই সপক্ষে ছিলেন; বোধ হয় সেইজন্যই মাইকেল স্থির করেছিলেন যে রাবণের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করা তাঁর কর্তব্য। কিন্তু তা তিনি করেছেন শুধু বচনদ্বারাই, রচনাদ্বারা নয়; মেঘনাদবধকাব্যের পদে-পদে দেখা যায় যে রাম-সীতার লোকশ্রুত মহিমায় কবি অভিভূত, এবং রাবণের দুশ্চরিত্রতার ধারণাও তাঁর মনে বদ্ধমূল। তা-ই যদি না হ'তো, তাহ'লে ঐ সুদীর্ঘ কাব্যে এই অদ্ভুত রহস্যময় প্রশ্ন উত্থাপিত না-হ'য়েই পারতো না যে রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন কেন। সম্ভোগের জন্য? কিন্তু সম্ভোগ কোথায়? সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে এসেই রাবণ যে তাঁকে একাকিনী অশোককাননে রেখে দিলেন, রাবণ চরিত্রের এই মৌল দ্বন্দ্ব কারো চোখেই ধরা পড়েনি, যতদিন না রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখ দিয়ে কথাটা বলালেন। এ-রকম অনুমানের কোনো বাধা নেই যে রাবণ সত্যিই সীতাকে ভালবেসেছিলেন, আধুনিক অর্থে ভালোবেসেছিলেন;—তাহ'লেই রাবণের ব্যবহার আমাদের চোখে সংগত লাগে, এবং তাঁর চরিত্রে মহত্ত্বের সম্ভাবনাও দেখতে পাই। কিন্তু মাইকেলি কল্পনায় এ-অনুমানের আভাসমাত্রও ছিলো না। বরং তিনি সেই চিরাচরিত জনরবকেই মেনে নিয়েছিলেন যে রাবণের সীতাহরণ তাঁর আত্মহত্যার উপলক্ষ্য এবং উপায় ছাড়া কিছু নয়, মনে-মনে তিনি রামেরই প্রেমিক, রামের হাতে মৃত্যুতেই তাঁর মোক্ষ। সেইজন্য মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রাবণের বীরত্ব একবারও উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটলো না;

পৌনঃপুনিক দীর্ঘশ্বাস এবং অশ্রুমোচনের ফাঁকে-ফাঁকে তিনি আস্ফালন করেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে প্রকৃত শক্তিমত্তার এ-রকম কোনো কথা কখনোই বেরলো না, যেমন :

> 'সুখ চাহি নাই মহারাজ।
> জয়, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
> ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
> কুরুপতি,—দীপ্তজালা অগ্নিঢালা সুধা
> জয়রস—ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত—
> সদ্য করিয়াছি পান,—সুখী নহি, তাত,
> অদ্য আমি জয়ী।

মাইকেলের রাবণ প্রথম থেকেই জানেন যে তাঁর সর্বনাশ অবধারিত, সেটা উদ্দীপনার অনুকূল নয়, তবু সেটাকে আশ্রয় ক'রেই রাবণ সেই মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারতেন, যে-মহিমা ট্র্যাজিডির পুণ্যফল। কিন্তু ট্র্যাজিডির তপস্যা মাইকেলের পক্ষে অসম্ভব ছিলো ব'লে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন শুধু রক্ষোরাজের মনস্তাপ, পরাজয় নিশ্চিত জেনেও যে যুদ্ধ ক'রে যাচ্ছে তার মহত্ত্ব মূর্ত করতে পারেননি, যা রবীন্দ্রনাথ করেছেন কর্ণের মুখের একটি কথায় :

> যে-পক্ষের পরাজয়
> সে-পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।

সত্যি বলতে, রাবণের মহত্ত্বের আমন্ত্রণ মাইকেল একেবারেই গ্রহণ করতে পারেননি ; আবার প্রতিপক্ষের দুর্বলতার প্রত্যেকটি সুযোগ হেলায় হারিয়েছেন। শূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণের ব্যবহার যে অপৌরুষেয়, বালীবধ যে ধিক্কারযোগ্য, রামচন্দ্র যে কূটনীতিতে শ্রেষ্ঠ ব'লেই রাবণকে হারাতে পারলেন, 'ভিখারী রাঘবে'র বিরুদ্ধে এতগুলি অস্ত্র পেয়েও মাইকেল ব্যবহার করেননি ; এমনকি, মেঘনাদের হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুর অন্যায়টাকেও অনায়াসে আমাদের মন থেকে মুছে দিলেন স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের রামানুরাগ প্রকাশ ক'রে। রবীন্দ্রনাথের এ-কথাও গ্রাহ্য নয় যে নাস্তিক শক্তির স্পর্ধাকেই কাব্যলক্ষ্মী বিদায়কালে মালা

পরিয়ে দিলেন ; কেননা শেষ পর্যন্ত আমরা তো এই দেখলাম যে মেঘনাদ-প্রমীলা পাশাপাশি ব'সে রথে চ'ড়ে স্বর্গে গেলেন, আর মৃত্যুর পরে এতই যদি সুখ তাহ'লে আর মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করবো কেন, আর রাবণের জন্যই বা দুঃখ কিসের। এদিকে লক্ষ্মণ যখন ম'রেও বাঁচলো, তখনই জানলাম যে রাবণের চিতা জ্বলতে আর দেরি নেই, কিন্তু সেই অনির্বাণ আগুনও আমাদের মনকে ছুঁতে পারলো না, কেননা, ততক্ষণে দেব-দেবীদের কথাবার্তা শুনে আমরা বুঝে নিয়েছি যে রাম ভালোমানুষ আর রাবণটা বদমাস।

২

রবীন্দ্রনাথের পরে মাইকেল সম্বন্ধে বিচক্ষণ মন্তব্য করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বাঙালি সমালোচকদের মধ্যে তিনিই যেমন এই সুস্পষ্ট সত্যটা সাহস ক'রে উচ্চারণ করেছেন যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য 'সাধারণত অপাঠ্য', তেমনি এ-কথা বলতেও ভয় পাননি যে মাইকেল 'বাংলা ভাষাকে ভালবাসতেন বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি বুঝতেন না ; তাই তিনি বঙ্গভারতীর সেবক মাত্র, তার ত্রাণকর্তা নন।' আমিও একবার বলেছিলুম, মাইকেল বাংলা জানতেন না। বাংলা জানতেন না, এটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শোনায়, সুধীন্দ্রনাথের কথাটাই লক্ষ্যভেদী। বাংলা মাইকেলের মাতৃভাষা হ'লেও আবাল্য তিনি তাকে অবজ্ঞাই করেছেন, এবং সেই অবজ্ঞা হঠাৎ যখন জিগীষায় পরিণত হ'লো তখন যে আশ্চর্য অল্প সময়ে সেই জয়-যজ্ঞ সম্পন্ন ক'রে ফেললেন, এটা নিয়ে তাঁকে আমরা অপরিসীম বাহবা দিয়ে এসেছি। বাহবার যোগ্য কাজই বটে, কিন্তু মাইকেলের এই বঙ্গভাষাবিজয়ে জেদ যতটা ছিলো, সাধনা ততটা ছিলো না, শক্তির দৌরাত্ম্য যতটা ছিলো প্রেমের দৌত্য ততটা ছিলো না। এ যেন রাবণের সীতাহরণের মতোই ব্যাপার, একেবারে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয়া হ'লো বটে, কিন্তু 'একেই কি বলে পাওয়া' ? আবাল্য অফুরন্ত অনুশীলনের ফলে ভাষার সঙ্গে যে-অন্তরঙ্গতা জন্মে

তার অবকাশ মাইকেলের জীবনে হ'লো না ; বাংলা ভাষার অন্বয়বের অধ্যয়নেই কাটলো তাঁর অতিহ্রস্ব সাহিত্যিক জীবন, তার প্রাণের সন্ধান পেলেন না, কিংবা প্রাণের প্রান্তে আসতে-আসতেই মৃত্যু দিলো ছেদ টেনে। এইজন্যই তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাতে কলাকৌশল যেন কল-কব্জার মতো কাজ করে ; এইজন্যই তাঁর অনুপ্রাস শিশুতোষ, উপমা দ্যুতিহীন, পুনরুক্তি ক্লান্তিকর। তাঁর সমস্ত পদ্যরচনার অভিশাপ ভাষার সেই জীবনবিমুখ সুদূরতা, ইংরেজিতে যাকে বলে পোএটিক ডিকশন। মিল্টনের অনুসরণ ছিলো তাঁর প্রতিজ্ঞা, কিন্তু কার্যত তিনি পোপের খপ্পরেই পড়েছিলেন। পোপের রীতিতে প্যারাডাইস লস্ট লেখবার শ্রেষ্ঠ ফল যা হ'তে পারে, অমিত্রাক্ষর সত্ত্বেও মেঘনাদবধ-কাব্য তা-ই। পোপের যে-সমালোচনা ওঅর্ডস্বর্থ করেছিলেন তার মধ্যে এই কথাটাই একেবারে অকাট্য যে পোপ চোখে দেখে লিখতেন না—did not write with his eye on the object—মাইকেল সম্বন্ধে হুবহু সেই কথা। মাইকেল শুধু ভাষার আওয়াজ শুনতেন—আর আওয়াজটাও খুব কড়ারকমের হওয়া চাই—তার ছবিটা দেখতেন না, ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণ অনুভব করতেন না। সংস্কৃতে একই বস্তুর অনেকগুলি নাম ব্যবহার করবার রীতি ছিলো, অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষাতেও তা-ই ; কিন্তু সে-কথাগুলি পরস্পরের অবিকল প্রতিশব্দ নয়, প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র অর্থবহ, প্রত্যেকটিই একটি প্রচ্ছন্ন উপমা। অ্যাংলো-স্যাক্সন কবি সমুদ্রকে বলছেন তিমি-পথ, বলা বাহুল্য সেটা সমুদ্র কথার প্রতিশব্দ নয়, সমুদ্রের বিশেষ-একটি রূপের বর্ণনা। কালিদাসের যক্ষ মেঘকে ডাকছেন কখনো জলদ, কখনো সৌম্য বা সাধু, কখনো বা আয়ুষ্মান ; এগুলিও মেঘের ভিন্ন-ভিন্ন রূপের, এবং সেই সঙ্গে মেঘ সম্বন্ধে যক্ষের অনুভূতির অভিজ্ঞান। সংস্কৃতে বিশেষ্য-পদ মাত্রেরই কয়েকটি সেবক দেখতে পাই, যাদের বলা যায় বিশেষ্য-বিশেষণ ; সেই শব্দসম্ভারের যে-অংশ লুপ্ত হ'য়ে যায়নি বাংলায় তা এসে পৌঁচেছে নিতান্তই প্রতিশব্দরূপে, আর প্রতিশব্দ মাত্রেই অতিশব্দ ; অর্থাৎ হর্যক্ষ

শোনামাত্র যদি সিংহের হলুদ চোখ দেখতে না পেলাম, তাহ'লে সিংহকে হর্যক্ষ বলা শুধু অনর্থক নয়, রুগ্নতার লক্ষণ। বিশেষ অর্থটি যেখানে ফুটলো না, কিংবা বিশেষ অর্থটির প্রয়োজনই নেই, সেখানে ঐ সব শব্দ জড়পিণ্ডের মতো কাব্যের কণ্ঠরোধ করে। বারীন্দ্র বা সুধাংশু বললে সমুদ্র বা চাঁদের ছবি আমাদের মনে জেগে ওঠে না, বরং সঙ্গে-সঙ্গেই বাবু উপাধিধারী বঙ্গীয় ভদ্রলোককে মনে পড়ে। 'যাদঃপতিরোধ যথা চলোর্মি-আঘাতে' আওয়াজ দিচ্ছে জমকালো, কিন্তু এ-ধ্বনির কোনো অনুষঙ্গ নেই, কোনো উদ্বোধনী শক্তি নেই, কোনো স্মৃতি, কোনো স্বপ্ন, কোনো মনোলীন নামহীন অভিজ্ঞতাকে এ ডেকে আনে না, একটু কষ্ট ক'রে শাদা মানেটা বুঝে নিলেই ফুরিয়ে গেলো। মৃত শব্দরাজিতে আকীর্ণ ব'লেই মাইকেলি কলরোল আমাদের কানেই শুধু পৌঁছয়, কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না, এবং দেবভাষা তাঁর ক্ষেত্রে ভাষা-দানব হ'য়ে উঠেছিলো ব'লে তিনি তাকে সামলাতেই নিরন্তর ব্যস্ত ছিলেন, কখনোই চোখে দেখে লিখতে পারেননি। মাইকেলের সযত্ন-সজ্জিত সমস্ত বর্ণনা তাই তো সহস্রাক্ষ ছাপার অক্ষরে কেবলই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, কোনো-একটিও বাসা বাঁধতে পারলো না মনের মধ্যে।

শুধু যে বাংলাভাষার প্রকৃতি বোঝেননি তা নয়, সাহিত্যের আদর্শ নির্বাচনেও মাইকেল ভুল করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় পণ্ডিত হ'য়েও এ-কথাটা তাঁর উপলব্ধির অনায়ত্ত ছিলো যে বর্তমান কালে এপিকের জায়গা নিয়েছে গদ্য-উপন্যাস। তরুণ রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ-কাব্যকে পদ্য-উপন্যাস ব'লে তার জাতিনির্ণয় ঠিকই করেছিলেন : তিনি বুঝেছিলেন যে প্রকৃত এপিক পৃথিবীতে দুটি কি তিনটিমাত্র আছে, পরবর্তী কাব্যকাহিনীগুলি নামত মহাকাব্য হ'লেও আসলে পদ্য-উপন্যাস, রঘুবংশও তা-ই, ক্যান্টরবরি টেলসও তা-ই, এমনকি প্যারাডাইস লস্টও তা-ই। কিন্তু মাইকেলের ধারণায় মহাকবিমাত্রেই মহাকাব্যের লেখক ছিলেন ব'লে তিনি মহাকাব্য লিখতে তো পারলেনই না,

উপরন্ত মহৎ পদ্য-উপন্যাস লিখে মহাকবির মর্যাদালাভও সম্ভব হ'লো না তাঁর পক্ষে। যদি তিনি ভেবে দেখতেন, কেন প্যারাডাইস লস্টের পরেই ইংরেজি ভাষার উল্লেখযোগ্য 'মহাকাব্য' পিত্তপ্রবণ ডানসিআড, যদি ভেবে দেখতেন তাঁর উপাস্য মিল্টন আর উপহাস্য পোপে সত্যিকার প্রভেদটা কোথায়, তাহ'লে হয়তো অনেক পণ্ডশ্রম তাঁর বেঁচে যেতো। যদিও অনেকগুলি ভাষা শিখেছিলেন এবং পড়েছিলেন বিস্তর, তবু এ-কথা মনে করতে পারি না যে তিনি ঠিকমতো পড়াশুনো করেছিলেন কিংবা পড়াশুনোকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। তাঁর পত্রাবলী মিল্টন-ভজনায় উচ্ছল, কিন্তু শেক্সপিঅর সম্বন্ধে (এমনকি নাটকের প্রসঙ্গেও) স্বল্পভাষী; বায়রনকে তিনি কিঞ্চিৎ আমল দেন, কিন্তু কীটস, যাঁর সঙ্গে মিল্টনের আত্মীয়তা অপ্রতিরোধ্য, কীটসের নামও মুখে আনেন না। দান্তে, হ্যুগো, টেনিসনকে লক্ষ্য ক'রে যে-সব সনেট লিখেছেন তাতে উদ্দিষ্ট কবিদের বিশিষ্টতা কিছুই প্রকাশ পায়নি, প্রশস্তির মুখস্থ-পাঠে সকলকেই এক মনে হয়। এ থেকে এমন নিদারুণ সন্দেহও মনে উঁকি দেয় যে মাইকেল বিদ্যার অনুধাবন করলেও রুচি অর্জন করেননি: এবং এটা চিন্তনীয় যে বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভূত শক্তির প্রভূত অপব্যয়ের হেতু কি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যা বলেছেন তা-ই, অর্থাৎ চারিত্রগুণের অনটন, না কি রুচির অনিশ্চয়তা।

তাছাড়া, চারিত্র বা রুচির ন্যূনতা সিদ্ধির অনতিক্রম্য অন্তরায় হয়তো হ'তো না, যদি মাইকেল কোনো বিশ্বাসের বিশ্বস্তর আশ্রয় পেতেন। যে-বিশ্বাসের জোরে দান্তের নরক প্রভাবে অলৌকিক হ'য়েও প্রাকৃত-পন্থী উপন্যাসের মতো, এমনকি চলচ্চিত্রের মতো, প্রত্যক্ষ, যে-বিশ্বাসের জোরে মিল্টন বাইবেলের রূপকথা নিয়ে অমর কাব্য বানিয়েছেন, তার কণামাত্র অংশও যদি মাইকেলের থাকতো তাহ'লে তাঁর কাব্যের রূপ-প্রতিমায়, অন্তত মুহূর্তের জন্য, প্রাণসঞ্চার না-হ'য়েই পারতো না। বাংলা সাহিত্যের এটাই বোধহয় শোচনীয়তম দুর্ঘটনা যে মধুসূদন দত্ত

কোনো ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করতে পারলেন না, না স্বজাতীয়, না বিজাতীয়; যখন তিনি রাম-রাবণের যুদ্ধ নিয়ে কাব্যরচনায় লিপ্ত, তখনও এ-কথা ভেবে তাঁর আত্মপ্রসাদ যে তিনি একজন 'jolly Christian youth', হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি সূচ্যগ্র অনুকম্পা তাঁর নেই, ভাবখানা এইরকম যেন লক্ষ্মণ মেঘনাদ সীতা প্রমীলাকে নিয়ে তিনি লেখা-লেখা খেলা করছেন বটে, কিন্তু সত্যি-সত্যি তাঁর জীবনে তারা কিছুই এসে যায় না। পক্ষান্তরে, জন্মদোষে খৃস্টান ঐতিহ্যকে এতখানি শোষণ ক'রে নেবার সম্ভাবনাই তাঁর ছিলো না যাতে কাব্যের প্রেরণা সে-অঞ্চল থেকে আসতে পারে; মুহর্‌রমের কাহিনী নিয়ে কাব্যরচনার কথাও তাঁর মনে এসেছে, কিন্তু যীশুর জন্ম নিয়ে কখনোই না। ঐতিহ্যকে বাড়াতে কি বদলাতে হ'লে যতটা আছে তাকে অধিকার করা চাই, আর ঐতিহ্য যখন বাড়েও না, বদলায়ও না, তখনই তার অধঃপাত ঘটে প্রথার অন্ধকূপে। মাইকেল কোনো ঐতিহ্যকে পাননি ব'লেই তাঁকে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিলো প্রথার হাতে; তাই তাঁর রাম লক্ষ্মণ সীতা কিংবা রাবণ মেঘনাদ প্রমীলা কেউ জীবন্ত নয়, তাই এতগুলি কাব্যে ও নাটকে একটিও চরিত্রসৃষ্টি তিনি করতে পারেননি, তাই তাঁর নরকে দুঃখের অগ্নিশুদ্ধি নেই, আছে শুধু হুঙ্কার, স্বর্গে নেই সৌন্দর্যের অমরতা, শুধু আছে লিপি-পুস্তিকার নীতিকথা। (স্বর্গে সতীদের জন্য শুধু মনোরম প্রমোদ-কানন নয়, অপরিমিত চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র ব্যবস্থা করতেও তিনি ভোলেননি।) বীরাঙ্গনাকাব্য আকারে-প্রকারে অনেকটা অগ্রসর, তবু তারার খেদোক্তির প্রথম চার পংক্তি মনে যে-আশা জাগায়, সে-আশা শেষ পর্যন্ত চুরমার হ'য়ে যায় গতানুগতির পাষাণে, এবং কাব্যটি আদ্যোপান্ত প'ড়ে ওঠবার আগেই আমরা উপলব্ধি করি যে বীরাঙ্গনারা সকলেই আসলে পতিদেবতার অশ্রুসর্বস্ব সেবাদাসী, আর পড়তে-পড়তেই ভুলে যাই কে দুঃশলা, কে দ্রৌপদী, আর কে-ই বা শকুন্তলা; সকলেই এক কথা বলছে, এবং সকলের কথাই একই

রকম গতানুগতিক। ব্রজাঙ্গনার প্রেম-লীলা এবং চতুর্দশপদীর দেশপ্রেম আর প্রকৃতিবর্ণনাও—আবার সেই কথাই বলতে হয়—গতানুগতিকতারই পরাকাষ্ঠা, নাটক ক'খানাও তা-ই, উজ্জ্বল প্রহসন দুটির পরিসমাপ্তিও ব্যতিক্রম নয়।

৩

তবু এ-কথা অবিস্মরণীয় যে মাইকেল শক্তিধর পুরুষ, বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম প্রধান। কিন্তু তাঁর প্রাধান্যের স্বরূপ বুঝতে হবে, তবে তো তাঁকে আমরা নিজেদের কাজে লাগাতে পারবো। জীবদ্দশায় দেশব্যাপী জয়-জয়কার সত্ত্বেও এমন অনুমান অসংগত মনে হয় যে সমসাময়িকদের মধ্যে বিদ্যাধর আর সিদ্ধপুরুষের প্রভেদ সম্বন্ধে কেউই সচেতন ছিলেন না। রাজনারায়ণ বসুর বন্ধুতা বা বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব তাঁদের সমালোচক-দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করেনি; অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলি পর্যন্ত দত্তজর নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু এমন-একটি কাণ্ড মাইকেল করেছিলেন যার সামনে কোনো সন্দেহ টিকলো না, কোনো আপত্তি দাঁড়াতে পারলো না। সকলেই জানেন যে সেটি তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্‌ভাবনা। এ-উদ্‌ভাবনা যে ঠিক কী-কারণে মাইকেলকে অক্ষয্য যশের অধিকারী করলো তা অবশ্য সমসাময়িকেরা স্পষ্ট বোঝেননি, ভাবেননি যে মিলবর্জনটাই খুব বড়ো কথা নয়, কেননা মিল তো অনুপ্রাসেরই রকমফের, এবং কোনো-না-কোনো শ্রেণীর অনুপ্রাস পদ্য-গদ্য লিখিত-কথিত সর্বপ্রকার ভাষার মর্মমূলে প্রোথিত। পদান্ত অনুপ্রাসের অভাব মেটাতে গিয়ে মাইকেল যে-ধরনের বাক্‌বাদনের সাহায্য নিয়েছিলেন তাতে সরস্বতীর হাড়ে বাতাস লাগেনি:

অনুপ্রাসের পরিবর্তে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি শুধু নয়, * 'কড়মড়মড়ে' 'ঝক ঝক ঝকে' ইত্যাদি বালভাষিত পদাবলীও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিলো। মিলের কথাটা তাই খুব বড়ো কথা নয়; মাইকেলের যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের ভূত-ঝাড়ানো জাদুমন্ত্র। কী অসহ্য ছিলো 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'-র একঘেয়েমি, আর তার পাশে কী আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ-যতির ঊর্মিলতা। অবশ্য এ-বিষয়ে সমসাময়িক আলোচনা কম হয়নি, কিন্তু যতিপাতের এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে-সঙ্গেই যে ছন্দে প্রবহমাণতা এসে অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলো এ-কথাটা তৎকালীন অনুসন্ধানীর দৃষ্টিগোচর হয়নি, হেমচন্দ্রের না, মাইকেলের নিজেরও না। প্রকৃতপক্ষে, অন্য-কোনো কারণে যদি না-ও হয়, শুধু বাংলা ছন্দে প্রবহমাণতার জনক ব'লেই মাইকেল উত্তরপুরুষের প্রাতঃস্মরণীয়, এবং যদি অমিলতার দিকে অত্যন্ত বেশি জোর না-দিয়ে তাঁর সহজীবীরা প্রবহমাণতার তত্ত্বটা আবিষ্কার করতেন, তাহ'লে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শ বহুপূর্বেই স্বতঃসিদ্ধ হ'তো যে এ-ছন্দের যথার্থ নামকরণ অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর।

কিন্তু মাইকেলি অমিত্রাক্ষর বাংলা ছন্দের নবজন্মের যবনিকা-উত্তোলক মাত্র, আসল পালা আরম্ভ হ'লো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। মাইকেলের যে-কোনো কাব্যের যে-কোনো অংশের সঙ্গে মানসীর 'নিষ্ফল কামনা'র অমিত্রাক্ষরকে তুলনা করলে দুয়ের মধ্যে ব্যবধান

* যেমন:

ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা;

কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠ!

প্রবল পবন বলে বলীন্দ্র পাবনি

রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি
আবৃত, পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদামে;

ইত্যাদি। 'রঞ্জিত রঞ্জনরাগে,' অর্থাৎ কিনা 'রঙের রঙে রাঙানো'!

অন্তত একশো বছরের মনে হয়। কী-উপায়ে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে চৌদূনে চালিয়েছিলেন সে-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত হ'তে পারে, কিন্তু এ-কথা নিশ্চিত যে মাইকেলের তাতে কোনো হাত ছিলো না। এটা উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের কিশোর রচনায় হেমচন্দ্রের প্রভাব পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু মধুচক্রের মক্ষিকাবৃত্তির চিহ্নমাত্র নেই; তাঁর জন্মের অব্যবহিত পূর্বে মধুসূদন যদি যবনিকা উত্তোলন না-ও করতেন তবু রবীন্দ্রনাথের পালা যখন এবং যে-ভাবে আরম্ভ হবার ঠিক তা-ই হ'তো। আসল কথা, বাংলা ভাষার প্রাণের ছন্দের সঙ্গে মাইকেল তাঁর অমিত্রছন্দকে মেলাতে পারেননি, তাই তাতে শুধু আন্দোলন আছে, স্বাচ্ছন্দ্য নেই; বেগ আছে প্রবল, কিন্তু গতির অনিবার্যতা নেই; এ যেন নদী নয়, আবর্ত, সেখানে নৌকা ভাসালে ডুবে যদি না মরি তাহ'লে নিরাপদেই ঘরে ফিরবো, কেননা অলক্ষ্যে অসীমের দিকে তা টেনে নিয়ে যায় না। আমি বলতে চাই, মাইকেল পড়বার পর পুরোনো জীবনের নিশ্চিন্ত পুনরাবৃত্তি সম্ভব, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুর একবার যার প্রাণে লেগেছে, জীবনের মতো অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে সে। মাইকেল পড়া না-পড়ায় শিক্ষার তারতম্য ঘটে; রবীন্দ্রনাথ পড়া না-পড়ায় জন্ম-জন্মান্তরের ব্যবধান।

আমি ভুলিনি যে মাইকেল পুরোমাত্রায় সচেতন শিল্পী। শুধু যে বাংলা ছন্দে যুক্তবর্ণের পরম রহস্যের তিনি আবিষ্কর্তা তা নয়; বাংলা স্বর-ব্যঞ্জনের ফলদ প্রয়োগ সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন ব'লেই

> আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
> শর্বরী; বহিল চারি দিকে গন্ধবহ

তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি,

> আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
> শর্বরী, সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে

লিখে কঠিনতর ধ্বনিসন্ধানের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু যে-কোনো কাজ সর্বপ্রথম করতে গেলে তাতে আতিশয্য প্রায় অরোধ্য: প্রথম

কথা-বলা সিনেমায় যেমন সমস্তটাই ছিলো নিছক চ্যাঁচামেচি, তেমনি মাইকেলও যুক্তবর্ণের আশ্চর্য যন্ত্রটি প্রথম হাতে পেয়ে হৈ-চৈ আর ধ্বনিসৌষম্যের প্রভেদ ভুলেছিলেন। তা না-হ'লে অমিত্রাক্ষরের এই পূজারী মার্লো শেক্সপিঅর ওএবস্টরকে অবহেলা করতেন না, এবং এটাও বুঝতেন যে একই যন্ত্র থেকে তূরী-নির্ঘোষ আর সেতারের মীড় বের করতে পেরেছিলেন ব'লেই মিল্টন স্বর্গীয়। কেন চতুর্থ সর্গে সীতা সরমার সমস্ত সম্মিলিত ক্রন্দন

> But silently a gentle tear let fall

এই একবিন্দু মিল্টনী অশ্রুর সমকক্ষ নয়; পঞ্চম সর্গে

> ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে
> প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
> সুখালয়! চিত্রলেখা, উর্বশী, মেনকা,
> রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
> খুলিয়া নূপুর কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
> আর যত আভরণ; খুলিয়া কাঁচলি,
> শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
> রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
> পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
> কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে
> করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
> প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে!

ইন্দ্র-দম্পতীর বাসর-শয্যার এই বর্ণনা কেন কীটসের And Jove grew languid-এর তুলনায় মনে হয় যত অলংকৃত ততই দরিদ্র, তার কারণ শুধু ওঅর্ডস্বর্থ-উল্লিখিত প্রত্যক্ষদৃষ্টির অভাবই নয়, সেই সঙ্গে এ-কথাও জুড়তে হয় যে মাইকেলের ছন্দ ঢাকের বাদ্যির মতো, জোর আওয়াজ, কিন্তু রেশ নেই। মেঘনাদী ডঙ্কানাদে তাই আগামীর আগমনী বাজলো না, তার ঐশ্বর্যের নির্বীজতা ঘুচলো না কিছুতেই, এবং রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের ভাষা-পাষাণীর ঘুম ভাঙালেন, তখন দেখা

গেলো ছন্দের প্রবহমাণতার সঙ্গে মিলের কোনো মৌল বিরোধ নেই, বরং প্রবহমাণতাই সেই শক্তি, যাতে পদে-পদে মিল দিয়েও মিল লুকিয়ে রাখা যায়, আর সেই সঙ্গে এ-কথাও আমরা বুঝলাম যে যতিপাতের স্বৈরিতা শ্বাসনালীর চমকপ্রদ ব্যায়াম নয়, তার আসল কাজ কাব্য-ভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার ঘটকালি।

অবশ্য মাইকেলও মনে-মনে অনুভব করেছিলেন যে যতির যদৃচ্ছতা দরজা দিয়ে ঢুকলেই মিলের ঝাঁক জানালা দিয়ে উড়ে পলায় না, শুধু তা-ই নয়, মিল-সংস্থাপনের পাশ্চাত্ত্য বৈচিত্র্য প্রবহমাণতার স্বাধীনতাই দাবি করে; নয়তো সনেটগুচ্ছ তিনি লিখেছিলেন কেমন ক'রে। উপরন্তু, তাঁর পত্রাবলী প'ড়ে বোঝা যায় যে গদ্যের ভূভারতের সঙ্গে কাব্যের স্বর্ণলঙ্কার সেতুবন্ধই ছিলো তাঁর অচেতন প্রয়াস, এবং সেই অসম্পূর্ণ, অব্যবহার্য, পরিত্যক্ত সেতুরই আমরা নাম দিয়েছি মাইকেলি অমিত্রাক্ষর। যদিও রবীন্দ্রনাথের কোনো কীর্তির পক্ষেই মাইকেলের অগ্রগামিতা অপরিহার্য নয়, তবু এ-কথাও সত্য যে অনুজ যা-কিছু করেছেন তার কোনো-কোনো অংশ অগ্রজকে দিয়েও হ'তে পারতো, যদি তিনি সুস্থ মনে দীর্ঘজীবী হতেন। শুধু যে তথাকথিত অমিত্রাক্ষরকে সত্যিকার সার্থকতায় পৌঁছিয়ে দিতে পারতেন তা নয়, যাকে আমরা আজকাল তিনমাত্রার ছন্দ, অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত বলি, তাও তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিলো, * এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, কাব্যে যে-গুণ তাঁর

* যেমন:

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম রতনে
ব্রজের বালা?
(ব্রজাঙ্গনা—'কুসুম')

কখনো বর্তায়নি, সেই স্বাচ্ছন্দ্যকে অর্জন করেছিলেন গদ্য-মহাদেশের দুই বিপরীত সীমান্ত-প্রদেশে। প্রহসন দুটির প্রাণপূর্ণ সংলাপ প'ড়ে যেমন মনে হয় যে পদ্মাবতী কৃষ্ণকুমারীকে নিয়ে পণ্ডশ্রম না-ক'রে ব্যঙ্গবিদ্রূপের লীলাখেলাতে মাতলেই তাঁর প্রতিভার ধর্মরক্ষা হ'তো, তেমনি আবার হেক্টর-বধের গম্ভীর, উদার, সুশৃঙ্খল গদ্য প'ড়ে বলতে লোভ হয় যে দৈবাৎ গদ্যকাহিনীতে হাত দিলে ইনিই হতেন বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা— অন্তত, আদ্যন্ত হোমর অনুবাদ ক'রে উঠতে পারলেও সে-গ্রন্থ যে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের মতোই বাঙালির একটি রত্নখনি হ'তো তাতে সন্দেহ নেই। ...কিন্তু মাইকেল আমাদের হতভাগ্যতম কবি; ব্যস্ত, উদ্ধত, অব্যবস্থিত উৎসাহে এই প্রায়-প্রৌঢ় যুবক তাঁর সাহিত্যিক বিদ্যুৎ-যুদ্ধ চালিয়েছেন, এক-এক মাসে এক-একটা নতুন

এ-কবিতাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কবি অশোকবিজয় রাহা। এ-ছাড়া আরো দুটি রচনা লক্ষণীয়:—

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ দেবি!
কহো কি ছন্দ মনানন্দ দেবে
মনীষীবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে?
('দেবদানবীয়ম্')

এখন্ কি আর্ নাগর্ তোমার্
আমার্ প্রতি তেমন্ আছে,
নূতন্ পেয়ে পুরাতনে
তোমার্ সে যতন্ গিয়েছে।
(গান—'একেই কি বলে সভ্যতা?')

মাত্রাবৃত্তে যুক্তবর্ণের প্রয়োগ আর-একটু হ'লেই মাইকেলি আবিষ্কারের অন্তর্গত হ'তো, এমনকি 'বৈঠিক পথের পথিক'-এর ছন্দও তাঁর হাতে ধরা পড়তে পড়তে ফশকে গেলো।

দেশ জয় ক'রে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন রাজপুত্র থেকে জুতোওলা পর্যন্ত সকলকে···কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লো না। তাঁর কর্মসূচীতে দেখতে পাই শুধু পরীক্ষার পর পরীক্ষা, গদ্যে ও পদ্যে, নাট্যে ও কাব্যে; অনেকটা তার নিছক চর্চা, নিতান্তই লিখতে শেখা, প্রাক্-মানসী রবীন্দ্র-রচনার সগোত্র, অনেকটাই অবিমিশ্র অপব্যয়, যে-অপব্যয় যে-কোনো সৃষ্টিতে অপরিহার্য। যেদিকে তাঁর সহজাত ক্ষমতা সেদিকে যথোচিত মনোযোগ নেই; যেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, যেন বাজি রেখে সেইটে করবার দিকেই ঝোঁক। ট্র্যাজিডি তাঁর ধারণার মধ্যেই কোনোকালে আসেনি, অথচ ট্র্যাজিডি লিখতে গেলেন; পক্ষান্তরে, নাটকের ভাষা পদ্য হওয়া উচিত—এমন পদ্য যা কানে শোনাবে গদ্যের মতো অথচ মনের উপর কবিতার মতো কাজ করবে—এই অত্যন্ত উৎসাহজনক অভিমত ঘোষণা ক'রেও কেন যে কখনো কাব্য-নাট্য লিখলেন না, কিংবা লিরিক প্রেরণাকে আধুনিক কাব্যের বিশল্যকরণী ব'লে অনুভব করা সত্ত্বেও কেন কার্যত তাঁর সে-প্রেরণা আবদ্ধ রইলো শিশুপাঠ্য পদ্যসন্দর্ভে, তা মাইকেলের ভাগ্যবিধাতা ছাড়া সকলেরই অগোচর। তাঁর জয়যাত্রা অত্যন্ত অস্থির ব'লেই উত্তেজক; কেননা যে-ভাষার সওয়ার হ'য়ে বেরিয়েছেন সে সর্বদাই সচেষ্ট তাঁকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে, যেহেতু তাঁর প্রতিজ্ঞা গায়ের জোরেই তাকে অনভ্যস্ত পথে চালাবেন। যতদিনে ভাষাকে তিনি প্রায় বাগে এনেছেন, চোখের সামনে পথ দেখা যাচ্ছে, যতদিনে নিজের ব্যর্থতার কাছে শিক্ষা নিয়ে-নিয়ে প্রায় প্রস্তুত হয়েছেন সত্যিকার সফলতার জন্য, ততদিনে তাঁর জীবনে যে-দুর্ভাগ্য ঘিরে এলো তার অবসান হ'লো একেবারে মৃত্যুতে। যে-সত্যের আভাস তিনি পেয়েছিলেন তা আভাস হ'য়েই রইলো; সাহিত্যরচনার যে-সব রীতি-নীতি উপলব্ধি করেছিলেন, তার প্রয়োগের অন্তরায় হ'লো ভাষাকে আত্মকরণের অক্ষমতা; সাহিত্যশক্তির যে-বিভিন্ন উপাদানগুলিকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে পরখ ক'রে দেখেছিলেন, যথাযথমাত্রায় সেগুলির সমন্বয়ের সময়ই হ'লো না—তাঁর সমগ্র

সাহিত্যিক জীবন বলতে গেলে মাত্রই তো পাঁচ-সাত বছরের। তাই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সিদ্ধান্ত যদিও স্বীকার্য যে 'বাঙালি কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই' এবং এইখানেই তাঁর ঐতিহাসিক প্রাধান্য, তবু 'আন্তরিক বিচারে তাঁকে অপরিণত অকালমৃত কবির মতোই আমাদের লাগে—আজকাল, নিজের শক্তির ব্যবহার যে জানে না, নিজের উদ্দেশ্যকে নিজেই পরাস্ত করে, যাকে আমরা চড়া গলায় প্রশংসা করি, আর তাতেই আমাদের দায়িত্ব ফুরোয় ব'লে যার জন্য আমাদের দুঃখ হয়।

আলোচনা

বাংলা ছন্দ

রচয়িতা হিসেবে কবির উপরেই যে কাব্যের প্রকৃতিবিশ্লেষণে সবচেয়ে বেশী নির্ভর করা চলে তা যেমন নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা যেমন হতাশার অগ্রদূত, কাব্যের আকৃতির ব্যাপারেও তাঁদের কাছে আমরা বেশী ইঙ্গিত আশা করতে পারি না; তার জন্যে দ্বারস্থ হতে হবে বৈয়াকরণের।

হয়ত তাই, কবি যেন তাঁর রচনা শেষ করেই দায়মুক্ত। যা তিনি দিচ্ছেন, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের উপর তার কত কি প্রতিক্রিয়া, তাঁর কাব্যের প্রকৃতি কত কি ভাবে বিচার্য্য, আঙ্গিকের দিক থেকেই বা তিনি কি কৌশল নিয়েছেন, কি বিশিষ্টতা দিয়েছেন এ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন না তিনি। তাঁর নিজে কিছুমাত্র সচেতন ধারণা নাও থাকতে পারে—এ-সবে তিনি হয়ত 'পুষ্পসম অন্ধ'।

পক্ষান্তরে এ-কথাও হয়ত বলা যায় কবি যদি একটু সচেতন হন, কাব্যের প্রকৃতিগতই হোক কি আঙ্গিকের সম্পর্ক হোক, যে-কোনো তত্ত্বের মূল মর্ম্ম উপলব্ধি তাঁর পক্ষে যেমন সহজ, স্বাভাবিক, আর কারও পক্ষে তা নয়। সে ক্ষেত্রে আমরা অকবি সমালোচকের দান অস্বীকার না-করেও কবির কাছেই খোঁজ করব বিশেষ ইঙ্গিতটি।

এ-কথা কিছুটা উপলব্ধি করা যায় যখন কবি বুদ্ধদেব বসু আর কারও কাব্য সাহিত্য আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অনেক সমালোচকই চেষ্টা-করেছেন; তাঁদের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তত্ত্বভেদী আলো ফেলেও যে সব সৌন্দর্য্যের সন্ধান মেলেনি বুদ্ধদেববাবুর অনেক বিক্ষিপ্ত, অসমাপ্ত রবীন্দ্রালোচনায় তারা আশ্চর্য্য ফুটে উঠেছে। কবিদের সুবিধেই এই—কোথা থেকে এসেছে কোন সৌন্দর্য্য, কি কি কারণে সে সৌন্দর্য্য সম্ভব তা না বলতে পারেন; সৌন্দর্য্যটা আছে কোথায় এটা বিশেষ করে তাঁদের পক্ষেই ধরে দেওয়া সহজ—তাঁরা ঠিক চিনতে পারেন। জাত-সমালোচক না-হয়েও রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব প্রাচীন সাহিত্যের এত সৌন্দর্য্য উদ্ধার। কোনো কবি যখন কাব্যের প্রকৃতি বা আকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে উদ্যত হন তাতে তাই উৎসাহিত হবার কারণ থাকে।

কবি বুদ্ধদেব বসু কিছুকাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে কাব্যের আঙ্গিক নিয়ে কিছু আলোচনা করছেন। এর মধ্যে সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য এবং আমাদের আলোচ্য। সাহিত্য সম্পর্কিত অন্য অনেক বিষয়ের মত ছন্দশাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করেই বিচার করেছেন—ছান্দসিকের অনেক খুঁটিনাটি হয়ত তাঁর কাছে কিছুটা অবান্তর, হয়ত সবটাতে তাঁর মত না মিলতে পারে, হয়ত সবটার সঙ্গে তাঁর পুরোপুরি পরিচয়ও না থাকতে পারে। কিন্তু যে-কোনো ছন্দের মূল মর্ম্ম উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যতটা সম্ভব ছিল (ছন্দ বইটিতে যার ভূরি ভূরি নিদর্শন) কবি হিসাবে বুদ্ধদেববাবুর পক্ষেও তার কিছুটা অন্তত সম্ভব এবং সে পরিচয় ঐ প্রবন্ধটিতে, এও আমার বিশ্বাস।

বুদ্ধদেববাবুর ঐ প্রবন্ধে যে সমস্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমার মনে প্রশ্ন জাগে আগে জানাই। অমূল্যধনবাবুর 'যৌগিক অক্ষর' এবং প্রবোধবাবুর 'যুগ্মধ্বনির' পরে তিনি বিশেষভাবে 'যুক্তবর্ণ' কথাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই কারণে যে 'তার মূল্যভেদেই পয়ারের গাম্ভীর্য্য ও মাত্রাবৃত্তের ঝংকার'। কিন্তু এখানে তিনি হয়ত সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছেন যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দের লিখিত আর শ্রুত রূপ এক নয়—ছন্দ, পুণ্য ইত্যাদি শব্দের শ্রুত রূপ ছন্‌দ, পুণ্‌ন্য ইত্যাদি। সাময়িক বললাম এই কারণে যে কৌতুকের বিষয় বুদ্ধদেববাবুই বিষয়টির প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক প্রবন্ধে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যাই হোক, মূল্যভেদ (অন্তত মাত্রার বিচারে) যুক্তবর্ণের বললে হয়ত ঠিক হবে না। আর শব্দের সুরুতে যুক্তব্যঞ্জন যে নিঃসংশয়ে একমাত্রা সে ত ঐ প্রবন্ধের পাদটিকাতেই স্বীকৃত।

তারপর ছড়ার ছন্দে যথেষ্ট ফাঁক থাকে, এ-কথার সার্থকতা কেবলমাত্র তখনই যখন আমরা ছড়া আগেকার দিনের মত সুর করে টেনে-টেনে আবৃত্তি করি। কিন্তু এটাই কি ছন্দে গাঁথা কবিতা আবৃত্তির সঠিক পদ্ধতি? ইতিপূর্ব্বে দু'একটি প্রবন্ধে আমি এ-বিষয়ে আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে এখানে উত্তর করা যেতে পারে—না, নিশ্চয়ই নয়, অন্তত আজকাল আমরা এতে সুর সম্পূর্ণ বর্জ্জন করে চলি। 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধটিতে মন্তব্য করা হয়েছে স্বরবৃত্তের সঙ্গে মাত্রাবৃত্তের সাদৃশ্য যুগ্মধ্বনির মূল্যে আর পয়ারের সাদৃশ্য মাঝে-মাঝে ফাঁক থাকায়। উপরে যে আবৃত্তির কথা বিবেচনা করা হোল তাতে ঠিক বিপরীতভাবে মন্তব্য করা যায় যে ছড়ার ছন্দের পয়ারের সঙ্গে সাদৃশ্য যুগ্মধ্বনির মূল্যে (অতিরিক্ত সংশ্লেষপ্রবণতার) আর মাত্রাপ্রধান ছন্দের সঙ্গে সাদৃশ্য ফাঁকবিহীন সুরবর্জ্জিত ঝোঁকপ্রধান উচ্চারণে। ছড়ার ছন্দে যাকে বলা হয়েছে ফাঁক-ভরানো তাকে বরং

মনে করা যেতে পারে দৃশ্যত ফাঁপানো। এর প্রমাণ—বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর নদেয় আসছে বন্যা—পংক্তিটি 'দ্রুত তালে এক নিঃশ্বাসে স্বরবৃত্ত রীতিতে পড়ে ফেলা যায়'। বিশেষ করে এখানেই কি দ্রুত তালের প্রয়োজন? ছড়ার ছন্দে ঢংই হোল দ্রুততালে, স্বরাঘাত দিয়ে ফাঁপানো পর্বকে চেপে আবৃত্তি। দ্বিতীয় পংক্তি—শিব ঠাকুরের বিয়ে বাসরে দান হবে তিন কন্যা—এখানে 'বিয়ের বাসরে' এসে স্বরবৃত্ত যে টিকলো না তার কারণ পর্বটি এমনভাবে ফাঁপানো হয়েছে যে তাকে চেপে যথেষ্ট কমানো অসম্ভব; হলন্ত অক্ষরকে যেভাবে চেপে পড়া চলে স্বরান্ত অক্ষরকে তা নয়।

কিন্তু—মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠলো জ্বলে—একে স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ মনে করায় দোষ কি? তারপর—স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন সন্ধ্যাতারার সঙ্গী মরণযাত্রী দলে—সম্বন্ধেও একই মন্তব্য।

পক্ষান্তরে—বেঠিক পথের পথিক আমার—ইত্যাদিকে ধ্বনিমাত্রিক রীতিতে পড়তে কি অসুবিধে? 'নিফাঁক স্বরবৃত্ত লিখতে-লিখতে যদি কখনো একটিও স্বরান্ত শব্দ এসে পড়লো অমনি তা স্বরবৃত্ত আর রইলো না', এ-কথার কি তাৎপর্য্য আমি বুঝতে পারি না।

প্রবন্ধটির ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে চেষ্টা করা হয়েছে প্রমাণের যে ছড়ার ছন্দে পাঁচ সিলেবলের পর্ব যথেষ্ট ব্যবহার সম্ভব। কিন্তু এর সমর্থক দৃষ্টান্তগুলির প্রতিটিতেই লক্ষ্য করা যাবে 'ইয়ে', 'ইও', 'ইই', 'উও' ইত্যাদি ধরনের পাশাপাশি দুটে স্বরধ্বনি, যারা ছড়ার ছন্দে প্রকৃতপক্ষে একটি যুগ্মধ্বনিরই কাজ করে। সুতরাং সে সব ক্ষেত্রে ছন্দের ব্যবহারে ওগুলিকে যুগ্মধ্বনি বিবেচনা করাই সঙ্গত। পাঁচ syllable যে অচল তা ঐ দৃষ্টান্তগুলিতে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনির বদলে দুটো ভিন্ন রকমের syllable বসাতে গেলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। অবশ্যি রবীন্দ্রনাথ এভাবেও যে পাঁচ syllable ব্যবহার করেননি তা নয়—

শত্রু আমারে করগো জয়
তুমিই আমার বন্ধু
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়
তুমি আমার আনন্দ

কিন্তু এখানেও ছড়ার ছাঁদ ঠিক বজায় আছে কি?

অবশ্য তিন syllable-এর পর্ব্বকে ব্যতিক্রম স্বীকার না করাটা খুবই যুক্তি-সঙ্গত, এমন কি দু' syllable-এর পর্ব্বও যে এ ছন্দে চলে তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর—

...'এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে'
...'হও তুমি সাবিত্রীর মতো'

বুদ্ধদেববাবুর অনেক দোহাই সত্ত্বেও এগুলোকে

...এলো তার দৌ। রাত্ম্য নিয়ে
...হও তুমি সা। বিত্রীর মতো

এ রকমে ভাগ না করে উপায় থাকে না। আর 'মরি মরি অনঙ্গ দেবতা'—একে রবীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার এঁরা কেন অন্যভাবে পড়বেন জানি না, আমার ত মনে হয় ছড়ার ছাঁদ বজায় রাখবার জন্য যদি আমি 'মরি মরি। অনঙ্গ দে। বতা' এভাবে ভাগ করি অন্তত অমূল্যধনবাবুর সমর্থন পাব।

'চিরনিদ্রার', 'ওগো যৌবন' ইত্যাদি চার সিলেবল থাকা সত্ত্বেও যে শ্রুতিকটু তার কারণও অমূল্যধনবাবু দিয়েছেন। ছড়ার ছাঁদে পর্ব্বাঙ্গের প্রথম অক্ষরটি যৌগিক হলে তার উপর স্বরাঘাতের দরুণ বাগ্‌যন্ত্রের যে উত্তেজনা তা প্রথম যৌগিক অক্ষটির সংশ্লেষণে সহযোগিতা করতে পারে, কিন্তু ঠিক তার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় যৌগিক অক্ষরের সংশ্লেষণ যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। তাই ছড়ার পর্ব্বাঙ্গে 'নিদ্রার' শ্রুতিটুকু, 'ঘুমের' অনায়াসেই চলে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা। প্রবোধবাবুর অনেক মতামতে অসঙ্গতি দেখিয়ে বুদ্ধদেববাবু বিশেষভাবে মন্তব্য করেছেন, 'স্বরবৃত্তের স্বরূপ নিয়ে প্রবোধচন্দ্রকে নতুন করে ভাবতে হবে'। এ দাবী অযৌক্তিক নয়। তবে বুদ্ধদেববাবু লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, স্বরবৃত্তের স্বরূপ অমূল্যধনবাবুতে যা প্রকাশিত তাতে অনেকদিন আগেই এ সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে মনে করি।

কিন্তু এ-রকম কিছু-কিছু বাদ দিয়েও প্রবন্ধটিতে এমন অনেক জিনিষ আছে যা নিঃসংশয়ে আমাদের ছন্দোবোধের সহায়ক। প্রবোধবাবুর মন্তব্যের প্রতিবাদে 'হৃদয় যমুনা'কে যে রীতিমত পয়ার ছন্দে রচিত বলা হয়েছে তা অযৌক্তিক মনে হয় না। আর 'শব্দ'কে 'শবদ' লেখা ছন্দে মাত্রিক উন্মুখতার পরিচায়ক বলেও মনে করবার কারণ নেই। ব্যবস্থা যেখানে তিনমাত্রা, মাত্রাপ্রধানে নয়, বরং পয়ারেই 'শব্দ'কে 'শবদ' পড়তে পারলে ভাল।

দুর্বার রবীন্দ্রমোহ সত্ত্বেও বুদ্ধদেববাবু স্বরবৃত্তের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সাময়িক পক্ষপাত উল্লেখ করতে দ্বিধা না করে সত্যিকারের সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। পয়ারকে একটা ছন্দোবন্ধ মনে না করে একটা ছন্দ, (বিশেষ জাত না হোক, বিশেষ ঢংএর ছন্দ) বলবার সপক্ষে যে কারণ দেখানো হয়েছে তাতে অনেকেরই সমর্থন

আশা করা যায়। এক সময়ে যখন মূলত একই ছন্দ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হোত, প্রতি পংক্তিতে পর্ব্বসংখ্যাই ছন্দের বৈশিষ্ট্য বিবেচিত হতে পারত। কিন্তু আধুনিক কাব্যে নানা বিচিত্র ঢংএর ছন্দে পংক্তির পর্ব্বসংখ্যাকে বড় একটা বৈশিষ্ট্য মনে করা হয় না—বিশেষ ভাবের প্রতীক হিসেবে বিশেষ পর্ব্বসংখ্যাবিশিষ্ট পংক্তির উপরেই নির্ভর করা হয় না।

আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো 'বাউল গানের ছন্দে'র উপর যেটুকু আলো ফেলা হয়েছে। অমূল্যধনবাবুর ছন্দ বিষয়ক সব আলোচনার মধ্যে মাত্র যে দু'একটির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলবার মত কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি ছড়ার ছন্দে পর্ব্বের দৈর্ঘ্যবৈচিত্র্য তার একটি। কেবলমাত্র চারমাত্রার পর্ব্বই ছড়ার ছন্দে চলতে পারে এর ক্ষীণ প্রতিবাদ নিয়ে অনেক তিনমাত্রার পর্ব্ব আমার মনে উঁকি দিয়েছে এবং স্বয়ং অমূল্যধনবাবুকেও আমি বছর দুই আগে কঙ্কাবতী থেকে

মুখে মুখ রাখিই যদি এমন আর দোষ কী বল
মনেরে যায় না ছোঁয়া কেমনে চাখবো তারে···

ইত্যাদি তুলে পাঠাই যা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে তিনি তখনই স্বীকার করেন। অতুলপ্রসাদ এবং আরো অনেকের গানে, ছড়ায়, কবিতায় তিন আর চার মাত্রার পর্ব্বের সুন্দর মিশ্রণ লক্ষ্য করা যেতে পারে।

প্রবন্ধটির সপ্তম অনুচ্ছেদের বিষয়টিও আলোচনার বিশেষ উপযোগী। অবশ্যি এ নিয়ে এখনই বেশী কিছু বলে ফেলা কঠিন, যদিও ছান্দসিকেরা অনেকদিন থেকেই বিষয়টি চিন্তা করছেন। আপাতত মনে করতে পারি প্রথম দিকের দৃষ্টান্তগুলিতে প্রতিটি ধ্বনি পূর্ণমূল্য পাচ্ছে বলে ধ্বনিমাত্রিক ছাঁদে আবৃত্তিই সহজ স্বাভাবিক; যদিও কোনো কোনোটি আকৃতিগত বা শব্দসংযোজনজাত বাধা না থাকায় অন্য ছাঁদে আবৃত্তিকেও প্রশ্রয় দিতে পারে। তা সে যে ভাবেই হোক, আবৃত্তিতে পরিচিত তিনটি ঢংএর একটি নিশ্চয়ই বজায় থাকবে। আর তাই একে বিশেষ কোনো নতুন ঢংএর দৃষ্টান্ত বলবার সার্থকতা থাকে না।

সবশেষে গদ্যছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার যে স্পষ্টতা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, এক রবীন্দ্রনাথেই তা আশা করা সম্ভব, আমি ত আর কাউকে এ মহলে বেশী আলো ফেলতে দেখিনি। গদ্যছন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখযোগ্য আলোচনার মধ্যে অমূল্যধনবাবুর প্রবন্ধটি মূলত আকৃতিগত। আবার রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্যছন্দের প্রকৃতি বুঝিয়ে দিতে ভাবছন্দ কথাটির আমদানি করলেন তখনও একরকম

অস্পষ্টতা থেকে গেল হয়ত—কারণ ভাবছন্দ কথাটির দু'তিনরকম ব্যাখ্যা সম্ভব। অমূল্যধনবাবু যে 'অর্থবিভাগে'র উল্লেখ করেছেন সে কি ঐ ভাবছন্দেরই অনুসরণে? অনেকদিন মন প্রশ্ন করে উঠেছে। এ প্রবন্ধে ভাবছন্দের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে আমার বিশ্বাস সত্যিকারের কাব্যবোধসম্পন্নের পক্ষেই তা পরিবেশন করা সম্ভব। গদ্যছন্দের অন্তত একটি ভঙ্গির স্পষ্ট পরিচয় এখানে পাওয়া গেল। শুধু গদ্যকাব্যের নয়, পদ্যকবিতায়ও যে ভাবছন্দ বর্ত্তমান, পদ্যের ছন্দোরীতির মধ্যে ভাবছন্দই যে লীন হয়ে থাকে একথাটি নতুন একটি চিন্তার দোর খুলে দিল। বুদ্ধদেববাবু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিচিত পংক্তির নতুন মাধুর্য্য লক্ষ্য করে চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছি—আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ, যে থাকে থাক না দ্বারে, তোরা যে যা বলিস ভাই, আমি যতবার আলো জ্বালাইতে চাই নিভে যায় বারে বারে, আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে, ভ্রমর ওরে ভ্রমর তুই একটু চুপ কর, যত পংক্তি মনে ভিড় করে আসছে পদ্যছন্দের মহিমা আরও বেশী উপলব্ধি করছি তার ভাবানুবর্ত্তিতা লক্ষ্য করে। এ নিয়ে অবশ্যি প্রশ্ন উঠবে এর পর, পদ্যে ছন্দোরীতির মধ্যে ভাবছন্দ কি ভাবে মিলিয়ে থাকে, পদ্যছন্দ যে ভাবছন্দকে অনুসরণ করে সে কি প্রক্রিয়ায়, গদ্যছন্দকে যে অর্থে বলব ভাবছন্দের অবিকল প্রতিরূপ সে অর্থে পদ্যছন্দকে কি বলব, গদ্যছন্দ পদ্যছন্দ প্রত্যেকই নিজ নিজ পথে যে-কোনো ভাবের অনুসরণ করতে পারে কিনা এবং আরো অনেক। এ সব অনেক ভাববার কথা আছে পরে। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে যে কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে অর্থাৎ পদ্যছন্দ হোক কি গদ্যছন্দ, দুয়েরই কাজ ভাবছন্দের প্রতিরূপ সৃষ্টি, সেইটিই আমাদের আপাতত পরম লাভ।

তাপসকুমার ভৌমিক

ভ্রম-সংশোধন

'কবিতা'র আশ্বিন সংখ্যার 'আলোচনা' বিভাগে 'বাংলা ছন্দ' বিষয়ে দ্বিতীয় নিবন্ধটির লেখকের নাম মোফাজ্জল হায়দর। ভ্রমক্রমে মোয়াজ্জল হায়দর ছাপা হয়েছিল।

সমালোচনা

ক্রান্তি (শারদীয় সংকলন) ক্রান্তিভবন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অমৃতকুমার দত্ত সম্পাদিত। দেড় টাকা।

কয়েকটি কবিতা। শামসুল হুদা সম্পাদিত। নুর লাইব্রেরী কলকাতা। দু টাকা।

সাত সতেরো। সম্পাদক সুধাংশু চৌধুরী। বরিশাল থেকে আবুল কালাম শামসুদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত। আট আনা।

অগুন্তি সংকলন গ্রন্থ বেরোচ্ছে আজকাল। তার মধ্যে অধিকাংশই পড়ে ওঠা যে-কোনো পাঠকের পক্ষে শারীরিক কারণেই অসম্ভব। বলাই বাহুল্য যে তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। কেননা ভালোমন্দ কিছু রচনাকে কোনোরকমে একত্র ছাপিয়ে বের করলেই সংকলন হয় না। সংকলনের পিছনে সাহিত্যরসিক যে বিশিষ্ট মনটি কাজ করে তার পারদর্শিতার উপরেই সংকলনের সার্থকতার অনেকখানি নির্ভর। এক্ষেত্রে সম্পাদকের দায়িত্ব যে-কোনো লেখকের চেয়ে কম তো নয়ই, বোধ হয় বেশী। সার্থক সংকলনগ্রন্থের উত্তরখণ্ডগুলিও পরপর যাঁরা পাঠ করেন তাঁরাই সেকথা জানেন।

প্রভূত প্রকাশের মধ্যেও 'ক্রান্তি' উৎসাহী পাঠকের মন আকৃষ্ট করবে কেননা সুদৃশ্য এই সংকলনটি, কলকাতা নয়, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। আজ পর্যন্ত সাহিত্য শিল্প রুচি বৈদগ্ধ্যের অদ্বিতীয় কেন্দ্র তো কলকাতাই। অনিবার্য হ'লেও এ ঘটনা দুঃখের। মনে হয় কলকাতার বাইরে সারা দেশটাই যেন জঙ্গল। মাঝে-মাঝে মফস্বলে যে সব সাহিত্যবাসরের অধিবেশনে কলকাতা থেকে সংবাদপত্র-সম্পাদক বা রাজনৈতিক বক্তারা গিয়ে মহাসম্মানীয় অতিথি হ'য়ে ফিরে আসেন তাঁদের কথা স্মরণ রেখেই একথা বলছি। বাংলা সাহিত্য-শিল্পের একটি প্রাণবান উপনিবেশ কি আর কোথাও গ'ড়ে উঠবে না—এই বলে যাঁদের ক্ষোভ ছিল তাঁরা হয়তো ঢাকার 'ক্রান্তি'র দিকে তাকিয়ে আশা রাখবেন। কিন্তু যাঁদের লেখা এ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে দেখছি তাঁরা অনেকেই খ্যাতনামা। অগ্রজ আধুনিক বাঙালি কবিদের প্রায় সকলেই উপস্থিত। প্রত্যেকটি নিমন্ত্রণের আসরে সব ক'টিই চেনা মুখ দেখলে বেশীদিন ভালো লাগে না। যাই হোক, আমার কাছে এ সংখ্যার এই কবিতা কটিই ভালো মনে হোলো। নবীন উর্দু গাল্পিক কিষণচন্দরের

অনুবাদটি এবং গোপাল হালদার মশাইর "জাগরী" উপন্যাসের দীর্ঘ আলোচনাটিও ভালো। কিন্তু তাছাড়া অধিকাংশ প্রবন্ধই দুর্বল। তাহলেও সবটা মিলিয়ে উপভোগ্য রচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। 'ক্রান্তি'র যে প্রতিশ্রুতি আছে নবীনতরদের নিয়ে পরবর্তী সংগ্রহে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্ব সম্পাদকের।

একটা কথা। একাধিকবার অল্ডস হক্সলির প্রতি আক্রমণ চোখে পড়লো। বিশেষ প্রবন্ধলেখকের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা এখানে সম্ভব না হলেও সাধারণভাবেই বলছি, 'বিশেষ' কোনো একটি মতবাদে হক্সলির আস্থা নেই বলেই কি এ আক্রমণ? কিন্তু এ কথাই কি সত্য নয় যে লেখক যদি তাঁর প্রতিভার প্রতিশ্রুতি সত্যই রক্ষা করেন তাহ'লে 'বিপ্লবের পথে, কর্মের পথে পা না বাড়িয়ে' তিনি নিত্য নূতন রচনার পথেই পা বাড়াবেন? সেইটেই তো তাঁর 'কর্ম'। 'ধ্যানধারণা' (?) এবং 'গীতায় মনোনিবেশ' সত্ত্বেও (কিন্তু 'সত্ত্বেও'ই বা কেন?) হক্সলি যে একজন আশ্চর্য্য শিল্পীই আছেন—তাঁর অধুনা প্রকাশিত *Time Must Have a Stop* উপন্যাসই তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

'কয়েকটি কবিতা' শুধু মুসলমান কবিদের একটি সংগ্রহ। যে কবিদের রচনা সংগৃহীত হয়েছে তাঁদের অধিকাংশ কবিই 'এক সময়ে ঢাকার "মুশ্লিম সাহিত্য সমাজের" সভ্য ছিলেন' বলে কাজি আবদুল ওদুদ সাহেবের পরিচিতি থেকে জানা গেল। সে হিসাবে সংকলনটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য থাকা সম্ভব। নাহলে বিশেষ ক'রে এক সম্প্রদায়ের কবিদের সংগ্রহ বলে আমার ক্ষীণ কণ্ঠেও আমি আপত্তি জানাতুম। কবিদের শিল্পীদের যে কোনো জাত নেই একথাও কি নতুন করে বলবার? কাজি সাহেব লিখেছেন—'তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পর (বিশ্ববিদ্যালয়ের) মুশ্লিম হলে সাহিত্য সমাজের অধিবেশন নিষিদ্ধ হয় এবং এর প্রতি মুসলমান সমাজের ব্যাপক বিরোধিতা প্রবল আকার ধারণ করে প্রতিপক্ষের এই প্রচারের ফলে যে এই "সমাজ" মুসলমানের ধর্ম ও সমাজ নষ্ট করছে। সেই বিরোধিতার ইতিহাস দীর্ঘ, করুণ ও কৌতুককর।' এই বেদনাদায়ক ঘটনাই তো প্রমাণ করে যে কবিদের কোনো জাত নেই। কিংবা তাঁদের একমাত্র জাতের পরিচয়—তাঁরা নির্ভেজাল মানুষ। সমাজের ছোটো ছোটো ঘাঁটি আগলাতেই যারা ব্যস্ত তারা তাই কবিদের চিরকালই শত্রু মনে করে এসেছে। অথচ পরিচিতি থেকেই জানা গেল—'বুদ্ধির মুক্তি' ও 'জীবনের অশেষ সম্ভাবনা'—

এই দুইটি বাণীই এই কবিগোষ্ঠীর সম্মুখে ছিল। এবং 'কোরানের ইসলামের ক্লৈব্যবর্জিত অগ্রগতির সাধনার সঙ্গে এর নিবিড় যোগ' আছে।

একটি বিশেষ কবিগোষ্ঠীর পরিচিতি হিসাবে 'কয়েকটি কবিতা'র মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু কাজি সাহেবের কথা উদ্ধৃত করেই বলি— 'কাব্যকলার দিক দিয়ে নিখুঁত কবিতার সন্ধানী যাঁরা করবেন তারা মোটের উপর হতাশ হবেন।' কথাটি সত্য। এবং তাই যদি হয় তা'হ'লে এ গ্রন্থের প্রতি সাধারণ পাঠকের আকৃষ্ট হবার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু গ্রন্থের এখানে ওখানে কয়েকটি ভালো কবিতাও ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলি খুঁজে নিতে পাঠকের কষ্টই হবে।

বরিশাল থেকে আর একটি ছোটো কবিতার সংকলন বেরিয়েছে 'সাত সতেরো'। এগারো জন কবির উনিশটি নাতিদীর্ঘ কবিতা। কবিরা সকলেই নবাগত নন। শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী, বিমল ঘোষ, এমনকি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকেও পাওয়া গেল। কবিতা পত্রিকা বলেই ভুল হোতো। কিন্তু পূর্বপ্রকাশিত কবিতাও চোখে পড়লো ব'লে মনে হচ্ছে সংকলন। কিন্তু এত ক্ষুদ্র?

বয়োজ্যেষ্ঠদের কবিতা অন্তর্ভুক্ত করার একটা দুর্বল অ্যাপলজি সম্পাদকের ভূমিকায় আছে। কিন্তু সাধারণ সংকলন যখন নয় তখন তাঁদের না নিলেই হোতো। কাব্যের আসরে প্রবেশ করার জন্য কোনো পাসপোর্টেরই তো প্রয়োজন নেই। 'সাত সতেরো'র কয়েকটি কবিতা ভালো, আশা হয় নবাগতরা আরো ভালো কবিতা লিখবেন। জীবনানন্দকে অন্তর্ভুক্ত করে ভালোই হয়েছে। কেননা জীবনানন্দীয় রোমান্টিকতার আবহাওয়াতেই এ কবিগোষ্ঠীর অনেকে পরিপুষ্ট। আমাদের 'নির্জনতম কবি'কে কেন্দ্র ক'রে বরিশালে একটি আসর গড়ে উঠলে তো ভালোই। আবুল কালামের—

উত্তর করিল না কেহ
পৌষ রজনীর চারিদিক ভরা আত্মারা বিদেহ

নিশ্চয়ই ছন্দপতন?

অন্তরঙ্গ। বিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কবিতাভবন। চার আনা।

'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় আর-একখানি গ্রন্থ সংযোজিত হলো। এই গ্রন্থমালাতেই যে কয়েকজন কবি তাঁদের প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করেছেন বিভূতিপ্রসাদ বাবু তাঁদের একজন।

প্রথম যখন 'একপয়সায় একটি' বের হয়েছিল খুব একটি সাড়া পড়ে গিয়েছিল কবিতার পাঠকমহলে। গ্রন্থমালার নামকরণে পাঠকদের প্রতি যে বিদ্রূপের ইঙ্গিত

ছিল না তা বলতে পারি না। কিন্তু আধুনিক কবিজ্যেষ্ঠদের একাধিক কবিতা এত সুলভমূল্যে পেয়ে উৎসুক পাঠকেরা খুব খুসী হয়েছিলেন। বিদ্রূপটা তাঁদের গায়ে লাগেনি। অথবা বিদ্রূপটা আসলে যাঁদের প্রতি তাঁরা এতে বিচলিত হন নি। আধুনিক প্রধান কবিদের রচনা পাঠকসমাজে এভাবে পরিচিত করিয়ে দেওয়াতেই 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালা প্রকাশের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল বলা চলে।

কিন্তু যে কবিরা প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে প্রয়াসী তাঁদের পক্ষে 'একপয়সায় একটি'র মতো ছোট বই প্রকাশ না করাই বোধ হয় ভালো। ক'টা কবিতাই বা ষোলো পৃষ্ঠায় ধরে। একটু দীর্ঘ হ'লে ষোলোটি কবিতাও না। আর এত কম কবিতা পাঠ ক'রে সাধারণ পাঠকের পক্ষে নতুন কবির সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে ওঠা কঠিনই। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে সে-ব্যতিক্রম ক'টি?

বিভূতিপ্রসাদবাবুর কবিতা ক'টি আমার ভালো লেগেছে। কবিমাত্রই নির্জন। বিভূতিপ্রসাদ বাবু নির্জনতর, যেমন জীবনানন্দ দাশ। দলমার পাহাড়ের কোলে, নিরালা গাছের ছায়ায়, শাল সেগুনের বনে, হেমন্তের শিশির-শীতল নদীতীরে, যেখানে

এলোমেলো পাতার আড়ালে
রূপালী শঙ্খের বাঁকা চাঁদ
... ...
উত্তর হাওয়ায় কাঁপে কালো কালো পাতার আড়ালে।

কিংবা যেখানে ধানকাটা মাঠে

বনের চড়ুই আর অচিন পাখীরা মাঠে আসি
ছড়ানো ধানের গন্ধে ঘুরে ফেরে

সেইখানে ঘরছাড়া বহিঃপ্রকৃতিবিলাসী তাঁর মন ঘুরে বেড়ায়। জীবনানন্দর উল্লেখ করেছি। আধুনিক অনেক বাঙালি কবির উপরেই তাঁর ছাপ আছে। বিভূতিবাবুকে প'ড়ে সেকথা আরো বেশী ক'রে মনে হোলো। প্রভাব সার্থক হ'লে তা মঙ্গলকরই হয়।

অনেক নির্জন ছবি তিনি এঁকেছেন। মাঝে মাঝে দুএকজায়গায় সুর কেটে গেছে। যেমন

হিজল গাছের ছায়ায় অরণ্যের কি এক বিস্ময়
নিয়ে এলো সূর্য্যাস্তের আকাশের রৌদ্রের সৌজন্যে—

তাঁর পরবর্ত্তী রচনায় কোনো অভিযোগের কারণ তিনি রাখবেন না আশা করি।

আগামী কালের কবিতা। রমাপতি বসু। দেড় টাকা।

আমার দেশকে আমি ভালোবাসি। ফল্গু কর। এক টাকা।

কবিতা পড়বো অথচ সে কবিতা ভালোবাসতে পারবো না, থেকে থেকে তার বিচ্ছিন্ন কোনো পংক্তি মনে ঘুরে ফিরে আসবে না এ বড় নির্দয় শাস্তি। কবিতা লেখার মতো কবিতা পড়াও যাদের দুরারোগ্য ব্যাধি তারাই তো কবিতা পড়ে?

কবিতা পড়ার জন্য কারো কোনো মাথার দিব্যি নেই যেমন নাকি খবরের কাগজ পড়ার জন্য আছে। কোনো কবির এক লাইন না পড়েও, এমনকি রবীন্দ্রনাথের দুচারটি স্কুলে পাঠ্য কবিতা পড়েই যে-কোনো ভদ্রলোক সম্মান কুড়িয়ে আয়েসে এলিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন। কবিতা পড়ার অভ্যাস যাঁদের আছে, তাঁদের পক্ষে, তাই, কোনো কবিতা ভালোবাসতে না পারা কঠিন শাস্তি।

'আগামী কালের কবিতা'র বইএর জ্যাকেট থেকে জানা গেল কবি ইতিমধ্যেই 'বিপ্লবী কবি' বলে স্বীকৃত। তিনি যে বহুবার কারাবরণ করেছেন তাও জানা গেল। প্রেসিডেন্সি জেলে ব'সে লিখিত কটি কবিতাও এ বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় খুব কম লেখাই এ বইয়ে আছে যা পুরো কবিতা হয়ে উঠেছে। ভাষাব্যবহারের শৈথিল্য এবং ছন্দপ্রমাদ অনেকবার চোখে পড়লো। নির্ভেজাল সাংবাদিক কথাবার্তাও কবিতার অন্তর্গত করা হয়েছে।

রাজাজী হাজির এক নিয়ে প্রস্তাব,
বিবাদী নেতার মুখে বিজয়ের গান—
অস্ত্রোপচার হবে ভারতের পর
নাহ'লে আপোষ নেই। স্পষ্ট জবাব!

কিংবা

হাজার হাজার বুটের নিষ্পেষণে
পৃথিবীর প্রতিচ্ছবির রূপান্তর ঘটছে
নাৎসীজমের জৌলুষে—ইত্যাদি

এও কি কবিতা? নারী, অভিব্যক্তি, কাঠবিড়ালী, বুরুজ প্রভৃতি কবিতা কটি ভালো হ'তে পারতো। কর্মীর জীবন এবং কবির জীবনে দুরতিক্রম্য একটা দ্বন্দ্ব র'য়ে গেছে বলেই কি হ'তে পারে নি? একথা বললুম কেননা

এলো লোনা জল আলকে এলিয়ে দিয়ে—

এমন ভালো লাইনও এ বইয়ে আছে।

শ্রীযুক্ত ফল্গু করের ছন্দের হাতটি মিষ্টি। অনেক রকম ছন্দ নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন। সতেজ পরিচ্ছন্ন একটা প্রকাশের ভঙ্গী চোখে পড়ে। কিন্তু তিনি বিশেষ ক'রে তরুণ পাঠকদের উদ্দেশ ক'রে কবিতাগুলি লিখেছেন। ফলে অনেক কবিতাতেই তাঁকে উচ্চকণ্ঠ হ'তে হয়েছে এবং যা কবিতার কাজ নয় সেই মরাল প্রচারের কাজেও কবিতাকে তিনি লাগিয়েছেন। তাঁর প্রথম বই তরুণদের উদ্দেশে। তাঁর পরবর্তী রচনা সকলের উদ্দেশে হবে আশাকরি।

নরেশ গুহ

সম্পাদক ও প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
১৮ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট দি ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ডারি এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ থেকে শ্রী বীরেন্দ্রনাথ দে, বি. এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতা

দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা] চৈত্র, ১৩৫৩ [ক্রমিক সংখ্যা ৫৩

রামায়ণ

ছন্দের আনন্দ, কবিতার উন্মাদনা জীবনে প্রথম যে-বইতে আমি জেনেছিলাম, সেটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ'। ছোট্ট, সচিত্র, বিচিত্র-মধুর সে-বইখানা ছিলো আমার প্রিয়তম সঙ্গী: যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পদলালিত্যের আদর খেতুম, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রর 'শিশু' পত্রিকার পাতা-বাহারে চোখ জুড়োতো—কিন্তু এমন নেশা ধরতো না আর-কিছুতেই। বার-বার পড়তে-পড়তে সমস্ত বইখানা আমার রসনাগ্রে অবতীর্ণ হয়েছিলো—কিন্তু শুধু পদাবলী আউড়িয়ে আমার তৃপ্তি নেই, রাম-লীলার অভিনয়ও করা চাই। বাঁশের তীর-ধনুক হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনের রঙ্গমঞ্চে আমার লম্ফঝম্প: আমিই রাম এবং আমিই লক্ষ্মণ, আর ঐ যে মাচার লাউ-কুমড়ো ফোঁটা-ফোঁটা শিশিরে সেজে আছে—ঐ হ'লো তাড়কা রাক্ষসী। সীতাকে না-হ'লেও তখন আমার চলতো, এমনকি, রাবণকে না-হ'লেও—কেননা রাম-লক্ষ্মণের বনবাসের অমন অপরূপ ফুর্তিটা মাটি হ'লো তো সীতা-রাবণের জন্যই। কী ভালো আমার লাগতো সে-সব নদী, বন, পাহাড়—পম্পা, পঞ্চবটী, চিত্রকূট—ছবির মতো এক-একটি নাম—ছবির মতো, গানের মতো, মন্ত্রের সম্মোহনের মতো উপেন্দ্রকিশোরের মুখবন্ধ:

বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে,
ছায়া তায় মধুময়, বায়ু বয় ধীরে।
খড়ের কুটিরখানি গাছের ছায়ায়
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
সে বলেন সুন্দর কথা, শোনো মন দিয়া।

'চঞ্চল'-এর যুক্তবর্ণ নিয়ে আমার রসনা সুখাদ্যের মতো খেলা করতো, তার অনুপ্রাসের অনুরণনে বুক কাঁপতো আমার। যোগীন্দ্র সরকার পদ্য পড়িয়েছিলেন অনেক—কিন্তু কবিতার জাদুবিদ্যার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

কৃত্তিবাসের সঙ্গে পরিচয় হ'লো আরো একটু বড়ো হ'য়ে। কৃত্তিবাস আমাকে কাঁদালেন, বোধহয় দুই অর্থেই—কেননা যদিও মনে পড়ে সীতার দুঃখে চোখে জল এসেছে, তবু সে-রকম অসম্ভব ভালো-লাগার কোনো স্মৃতি মনে আনতে পারি না। বয়স যখন কৈশোরের কাছাকাছি তখন একখানা মূল বাল্মীকি উপহার পেয়েছিলুম—তার পাতা ওল্টাবার মতো উৎসাহ যখন আমার হ'তে পারতো তার আগেই বইখানা হারিয়ে গেলো। আর তারপর এই এত বছর তো কাটলো। এর মধ্যে অনেকবার মনে হয়েছে বাল্মীকি প'ড়ে দেখবো—অন্তত চেখে দেখবো—কিন্তু এই অপব্যয়িত জীবনের অনেক সাধু সংকল্পের মতো এটিও বিলীন হ'য়ে গেছে ইচ্ছার মায়ালোকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের কৃপায় মূল মহাভারতের স্বাদে আমার মতো অবিদ্বানও বঞ্চিত নয়, কিন্তু বাল্মীকি আর বাঙালির মধ্যে দেবভাষার ব্যবধান উনিশ-শতকী উদ্দীপনার দিনে কেন ঘোচানো হয়নি জানি না। হয়তো কৃত্তিবাসের অত্যধিক লোকপ্রিয়তাই তার কারণ। বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাস বাল্মীকির বাংলা অনুবাদক নন, তিনি রামায়ণের বাংলা রূপকার; তাঁর কাব্যে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা শুধু নন, দেব-দানব-রাক্ষসরা সুদ্ধু বাঙালি চরিত্র, প্রাকৃতিক এবং

মানসিক আবহাওয়া একান্তই বাংলার। এ-কাব্য বাঙালির মনের মতো হ'তে পারে, এমনকি বাংলা সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্মের প্রথম উদাহরণ ব'লে গণ্য হ'তে পারে, কিন্তু এর আত্মার সঙ্গে বাল্মীকির আত্মার প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী'র সঙ্গে মহাভারতের দেবযানী-উপাখ্যানের প্রভেদের মতোই, মাপে তত টা না-হ'লেও জাতে সে-ই। আমাদের আধুনিক কবি-ঠাকুরদের প্রশংসায় আমরা কখনো ক্লান্ত হবো না, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখবো যে আদিকবিদের চারিত্রলক্ষণ জানতে হ'লে আদিকবিদেরই শরণাগত হ'তে হবে। ভুল করবো, মারাত্মক ভুল, যদি মনে করি কৃত্তিবাসের রম্য কাননে আদিকবির, মহাকাব্যের, ধ্রুপদী সাহিত্যের ফল কুড়োনো সম্ভব। বাল্মীকিতে রামের বনবাসের খবর পেয়ে লক্ষ্মণ খাঁটি গোঁয়ারের মতো বলছেন, 'ঐ কৈকেয়ী-ভজা বুড়ো বাপকে আমি বধ করবো'; বনবাসের উদ্যোগের সময় রাম সীতাকে বলছেন, 'ভরতের সামনে আমার প্রশংসা কোরো না, কেননা ঋদ্ধিশালী পুরুষ অন্যের প্রশংসা সইতে পারে না'; এবং লঙ্কাকাণ্ডে যুদ্ধের পরে সীতাকে যখন রাম প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন সীতা তাঁকে বললেন প্রাকৃতজন অর্থাৎ ছোটোলোক;—এই সমস্তই, সতীত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও পুত্রত্বের আদর্শরক্ষার খাতিরে, বর্জন করেছেন ব'লে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কৃত্তিবাসকে তারিফ করেছেন। হয়তো তারিফ করাটা ঠিকই হয়েছে, হয়তো এর ঐতিহাসিক কারণ ছিলো, তৎকালীন বঙ্গসমাজে এর সমর্থনও হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব—কিন্তু সে-সব যা-ই হোক, এই বর্জনে আদিকবির আত্মা যে উবে গেলো তাতে তো সন্দেহ নেই। আদিকবির লক্ষণ, পৃথিবীর আদি মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য আমি যা বুঝেছি, তার নাম দিতে পারি বাস্তবিকতা, সে-বাস্তবিকতা এমন সম্পূর্ণ, নিরাসক্ত ও নির্মম যে তার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য রিঅ্যালিজম-এর চরম নমুনাও মনে হয় দয়ার্দ্র। অল্ডস হক্সলি যাকে বলেছেন সম্পূর্ণ সত্য, মহাকাব্য তারই নির্বিকার দর্পণ;

মহাকাব্যে ট্র্যাজেডির মত্ততা নেই, কমেডির উচ্ছলতা নেই; তাতে গলা কখনো কাঁপে না, গলা কখনো চড়ে না; বড়ো ঘটনা আর ছোটো ঘটনায় ভেদ নেই—সমস্তই সমান, আগাগোড়াই সমতল—এবং সমস্তটা ঈষৎ ক্লান্তিকর। বস্তুত, মহাকাব্য তো পৃথিবীর সেই কিশোর বয়সের সৃষ্টি, যখন পর্যন্ত সাহিত্য একটি সচেতন শিল্পকর্মরূপে মানুষের মনে প্রতিভাত হয়নি; এবং পরবর্তী কালে সাহিত্য-কলার বিচিত্র ঐশ্বর্য যুগ-যুগ ধ'রে অবিরাম উদ্‌ভাসিত হ'তে পারতোই না, যদি আদিকাব্যের সেই কৈশোর-সরলতাকে, সেই অচেতন সত্যনিষ্ঠাকে মানুষ চিরকালের মতো পরিত্যাগ না-করতো। মহাকাব্যের বাস্তবিকতা এমনই নির্ভীক যে সংগতিরক্ষার দায় পর্যন্ত তার নেই; তুচ্ছ আর প্রধানকে সে পাশাপাশি বসায়, কিছু লুকোয় না, কিছু ঘুরিয়ে বলে না, বড়ো-বড়ো ব্যাপার দু'তিন কথায় সারে, এবং সবচেয়ে বড়ো ব্যাপারে কিছুই হয়তো বলে না। মানব-স্বভাবের কোনো মন্দেই তার চোখের পাতা যেমন পড়ে না, তেমনি ভালোর অসম্ভব আদর্শকেও নিতান্ত সহজে নিতান্ত স্বাভাবিক ব'লে সে চালিয়ে দেয়। সেইজন্য মহাভারতে দেখতে পাই চিরকালের সমস্ত মানবজীবনের প্রতিবিম্বন: তাতে এমন মন্দেরও সাক্ষাৎ পাই যাতে এই ঘোর কলিতে আমরা আঁৎকে উঠি, আবার ভালোও অপরিসীম, অনির্বচনীয়রূপে ভালো; জীবনের এমন-কোনো দিক নেই, মনের এমন-কোনো মহল নেই, দৃষ্টির এমন-কোনো ভঙ্গি নেই, যার সঙ্গে মহাভারত আমাদের পরিচয় করিয়ে না দেয়। শুধু পৃষ্ঠা-সংখ্যায় নয়, জীবনদর্শনের ব্যাপ্তিতেও রামায়ণ অনেকটা ছোটো; কিন্তু কাব্যহিশেবে—এবং কাহিনী হিশেবেও—তাতে ঐক্য বেশি, এবং আমরা যাকে কবিত্ব বলি তাতে রামায়ণ সম্ভবত সমৃদ্ধতর। এটা ভালোই, যদি আধুনিক সাহিত্যের ঐশ্বর্যজটিল বিশাল প্রাসাদ ছেড়ে আমরা কখনো-কখনো বেরিয়ে পড়ি বাল্মীকির তপোবনে, পৃথিবীর কৈশোর-সারল্যে, মানবজাতির শৈশবিক স্বতঃস্ফূর্ততায়।

২

ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু যাতায়াতের পথ বিঘ্নবহুল। সে-পথ সম্প্রতি সুগম ক'রে দিলো শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ।* হাস্যরসিক আর ফলিত-বিজ্ঞানীর, ভাষাবিজ্ঞানী আর ভাষাশিল্পীর যে-সমন্বয় বসু-মহাশয়ে ঘটেছে এই বিশেষীকরণের যুগে তা রীতিমতোই বিরল; এবং অধুনা তাঁর ব্যঙ্গ-রঙ্গের স্রোত প্রায় রুদ্ধ ব'লে আমরা যতই না আক্ষেপ করি, সেই সঙ্গে এ-কথাও বলতে হয় যে তাঁর অবিশ্রান্ত সক্রিয়তাই আমাদের সৌভাগ্য। বিশেষত এইরকম সময়ে, যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর চিন-মার্কিন-রুশ লেখকদের বঙ্গানুবাদে বাঙালির লেখনী এবং দুর্লভ কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র ভূরিপরিমাণে ক্ষয়িত হচ্ছে, তখনও যে বাল্মীকি অনুবাদ করবার মতো মানুষ দেশে পাওয়া গেলো, উপরন্তু সে-গ্রন্থের প্রকাশকও জুটলো, তাতে এমন আশা করবারও সাহস হয় যে বইখানা কেউ-কেউ প'ড়েও দেখবেন। অন্তত, বসু-মহাশয় সাধারণ পাঠকের পথে একটি কাঁটাও প'ড়ে থাকতে দেননি: সংক্ষেপীকরণের নৈপুণ্যদ্বারা গ্রন্থের কলেবর সাধারণের সহনীয় করেছেন, অনুবাদ করেছেন গদ্যে, সহজ চলতি বাংলায়, না হ'লেই নয় এমন ফুটনোট শুধু দিয়েছেন, ভূমিকা-যে লিখেছেন, তাতেও পণ্ডিতম্মন্যতার ভার চাপাননি। বস্তুত, বইখানা উপন্যাসের মতো আরামে প'ড়ে ওঠবার কোনো বাধা যদি থাকে, সে শুধু মাঝে-মাঝে উদ্ধৃত বাল্মীকির শ্লোকাবলী; আর সেগুলিও, বসু-মহাশয় ভূমিকায় ব'লেই দিয়েছেন (বোধহয় আমাদের শ্রমবিমুখতাকে ঠাট্টা ক'রেই), পাঠক ইচ্ছা করলে 'অগ্রাহ্য করতে পারেন'। কিন্তু অগ্রহণীয় নিশ্চয়ই সেগুলি নয়; সংস্কৃতর নামেই যাঁরা ভয়ে চোখ বোজেন না, এমন পাঠকেরও একটু খোঁচাতেই সন্ধি-সমাসের ফাঁকে-

* বাল্মীকি-রামায়ণ: সারানুবাদ। রাজশেখর বসু। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। ৫৷৷০।

ফাঁকে রস ঝরবে, কেননা, সৌভাগ্যক্রমে, বাল্মীকির সংস্কৃত খুব সহজ। রাজশেখরবাবুকে ধন্যবাদ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষা ও শরৎঋতুর মধুর বর্ণনাটুকু বাল্মীকির মুখেই তিনি আমাদের শুনিয়েছেন—এ-বর্ণনা কৃত্তিবাস বেমালুম বাদ দিয়েছেন ব'লে তাঁকে প্রশংসা করা যায় না, কেননা কবিত্ব, নাটকীয়তা এবং চরিত্রণ—তিন দিক থেকেই এই ঋতুবিলাস সুসংগত ও সুন্দর। ঘনজটিল বর্নের মধ্যে চলতে-চলতে হঠাৎ যেন একটি স্বচ্ছ-নীল হ্রদের ধারে এলাম, সেখানে নৌকো আমাদের তুলে নিয়ে জলের গান শোনাতে লাগলো : ওপারে জটিলতর পথ, কুটিলতম কাঁটা,—কিন্তু এই অবসরটুকু এমন মনোহরণ তো সেইজন্যই। বনবাসের দুঃখ, সীতা-হারানোর দুঃখ, বালীবধের উত্তেজনা ও অবসাদ—সমস্ত শেষ হয়েছে, সামনে প'ড়ে আছে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা : দুই ব্যস্ততার মাঝখানে একটু শান্তি, সৌন্দর্যসম্ভোগের বিশুদ্ধ একটু আনন্দ। এই বিরতির প্রয়োজন ছিলো সকলেরই—কাব্যের, কবির এবং পাঠকের, আর সবচেয়ে বেশি রামের। বর্ণনার শ্লোকগুলি রামের মুখে বসিয়ে বাল্মীকি সুতীক্ষ্ণ নাট্যচেতনার পরিচয় দিয়েছেন: বালস্বভাব লক্ষ্মণের সীতা-উদ্ধারের চিন্তা ছাড়া আর-কিছুতে মন নেই; শান্ত শুদ্ধশীল রাম তাকে ডেকে দেখাচ্ছেন বর্ষার বৈচিত্র্য, শরতের শ্রীলতা। বিরহী রামের সঙ্গে বিরহী যক্ষের তুলনা করলেই আমরা আদিকাব্যের সঙ্গে উত্তরকাব্যের চারিত্রিক প্রভেদ বুঝতে পারবো: আদিকাব্যে সম্পূর্ণ সত্যের নিরঞ্জন প্রশান্তি, উত্তরকাব্যে খণ্ডিত সত্যের উজ্জ্বল বর্ণ-বিলাস। সীতার বিরহে রাম ক্লিষ্ট, কিন্তু অভিভূত নন; যদিও মুখে তিনি দু' চারবার আক্ষেপ করছেন, আসলে সীতার অভাব তাঁর প্রকৃতিসম্ভোগের অন্তরায় হ'লো না; আবার মেঘ দেখেই কালো চুল কিংবা চাঁদ দেখেই চাঁদমুখ স্মরণ ক'রে আকুল হলেন না তিনি। অথচ যক্ষের বিরহের চাইতে রামের বিরহ অনেক নিষ্ঠুর, রামের দুঃখ লক্ষ্মণের দুঃখের শতগুণ। সীতা কাছে নেই ব'লে প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপর রাগ করলেন না রাম, তার গলা

জড়িয়েও কাঁদলেন না; সৌন্দর্যে তাঁর নিষ্কাম নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ, যেমন শিল্পীর। এর আগে এবং এর পরে নিসর্গ-বর্ণনার আরো অনেক সুযোগ ছিলো, কিন্তু মনে হয় বাল্মীকি সে-সমস্তই উপেক্ষা ক'রে গেছেন, কেননা এর আগে এবং পরে রাম নিরন্তর কর্মজালে জড়িত—এইখানেই, এই যুদ্ধযাত্রার পূর্বাহ্ণে রামের একটু সময় হ'লো: ভাবখানা এইরকম যেন নিরিবিলি ব'সে ঘাস, গাছ, আকাশ দেখতে তাঁর ভালোই লাগছে; যেন দীর্ঘ, হিংস্র, অর্থহীন যুদ্ধ আসন্ন জেনেই এই বিরল অবসরটুকুতে সীতার কথা তিনি ভাবছেন না, রাবণ বা সুগ্রীবের কথাও না—কিছু ভাবতে গেলেই যুদ্ধের কথা ভাবতে হয়, তাই কিছুই ভাবছেন না তিনি, মনকে শুধু ছড়িয়ে দিচ্ছেন সেই সবুজ সহজ বনে, যে-বনভূমি

> ক্বচিৎ প্রগীতা ইব ষট্পদৌঘৈ-
> ক্বচিৎ প্রনৃত্তা ইব নীলকণ্ঠৈঃ।
> ক্বচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রৈঃ···*

৩

আরো একটি কারণে কৃত্তিবাস যথেষ্ট নন, বাল্মীকির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের প্রয়োজন। সে-কারণ কী, রাজশেখরবাবু ভূমিকাতেই তা ব'লে নিয়েছেন, এবং বইখানা আদ্যন্ত প'ড়ে আমরা শুধু সকৌতুকে

* '—কোথাও ভ্রমরকুল গুঞ্জন করছে, কোথাও ময়ূর নাচছে, কোথাও গজেন্দ্র প্রমত্ত হ'য়ে রয়েছে।' বসু-মহাশয়ের এই ভাষান্তরে সাধারণ পাঠককে একটু বেশি খাতির করা হ'য়ে গেছে; বাংলা যথাসম্ভব সরল হয়েছে, কিন্তু মূলের জোরটুকু গেছে হারিয়ে। বনভূমি ভ্রমরকুলদ্বারা প্রগীত, ময়ূরদলদ্বারা প্রনৃত্ত এবং গজযূথদ্বারা প্রমত্ত—ভাষার এই বিশেষ ভঙ্গিতেই এর সরসতা। বিভক্তিহীন বাংলা ভাষায় এর যথাযথ অনুবাদ অবশ্য সম্ভব নয়, তবে কোনো বাঙালি কবিকে যদি কথাটা বলতে হ'তো তাহ'লে তিনি বোধহয় এইরকম কিছু বলতেন :—কোথাও ভ্রমর তাকে গাওয়াচ্ছে, কোথাও ময়ূর তাকে নাচাচ্ছে, কোথাও তাকে পাগল ক'রে দিচ্ছে হাতির পাল।

নয়, সহর্ষেও জানি যে রাম-লক্ষ্মণেরা প্রচুর মাংস খেতেন, সবরকম মাংস খেতেন, গোসাপের মাংসও বাদ যেতো না—এমনকি অমাংসভোজনকে তাঁরা বলতেন উপবাস। সুরাতেও বিমুখ ছিলেন না তাঁরা—রাম নিজের হাতে সীতাকে মৈরেয় মদ্য পান করাচ্ছেন ; আর হনুমান সীতার খবর নিয়ে লঙ্কা থেকে ফেরবার পর বানরদল যে-মাৎলামিটা করলো, রাম সেটার শাসন করলেন কিন্তু নিন্দা করলেন না। এই মধুবনের বৃত্তান্তটা—বোধহয় ভোক্তারা বানর ব'লেই—কৃত্তিবাস গোপন করেননি ; কিন্তু রামান্বেষী ভরতের সৈন্যদলকে ভরদ্বাজ যে-রকম আপ্যায়ন করলেন, সেটা কৃত্তিবাস সহ্য হ'লো না। পাশাপাশি দুটি অংশ তুলে দেখালেই আমার বক্তব্য বোঝা যাবে :

> এমন সময় ব্রহ্মা ও কুবের কর্তৃক প্রেরিত বহু সহস্র স্ত্রী দিব্য আভরণে ভূষিত হয়ে উপস্থিত হ'ল। তারা যে পুরুষকে গ্রহণ করে তারা উন্মাদের তুল্য হয়। কাননের বৃক্ষসকল প্রমদার রূপ ধারণ ক'রে বলতে লাগল,
>
> —সুরাপায়িগণ সুরা পান কর, বুভুক্ষিতগণ পায়স ও সুসংস্কৃত মাংস যা ইচ্ছা হয় খাও।
>
> এক এক জন পুরুষকে সাত আট জন সুন্দরী স্ত্রী নদীতীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে অঙ্গসংবাহন ক'রে মদ্যপান করাতে লাগল। পানভোজনে এবং অপ্সরাদের সহবাসে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ রক্তচন্দনে চর্চিত হয়ে বললে,
>
> —আমরা অযোধ্যায় যাব না, দণ্ডকারণ্যেও যাব না, ভরতের মঙ্গল হ'ক, রাম সুখে থাকুন।
>
> যারা একবার খেয়েছে, উৎকৃষ্ট খাদ্য দেখে আবার তাদের খেতে ইচ্ছা হ'ল। সকলে বিস্মিত হয়ে আতিথ্যের উপকরণসম্ভার দেখতে লাগল—স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে শুভ্র অন্ন, ফলরসের সহিত পক্ব সুগন্ধ সূপ, উত্তম ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস, স্থালীতে পক্ব উত্তপ্ত মৃগ ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস, দধি-দুগ্ধ-পূর্ণ অসংখ্য কলস, স্নান ও দন্তমার্জনের উপকরণ, দর্পণ, বস্ত্র,পাদুকা, শয্যা, প্রভৃতি। ভারতের

> সৈন্যেরা মদ্যপানে মত্ত হ'য়ে নন্দনকাননে দেবগণের ন্যায় রাত্রি যাপন করলে। গন্ধর্ব অপ্সরা প্রভৃতি নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেল।
>
> (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)

ভোজনে বসিল সৈন্য অতি পরিপাটি। স্বর্ণপীঠ স্বর্ণথাল স্বর্ণময় বাটি॥
স্বর্ণের ডাবর আর স্বর্ণময় ঝারি। স্বর্ণময় ঘরেতে বসিল সারি-সারি॥
দেবকন্যা অন্ন দেয় সৈন্যগণ খায়। কে পরিবেশন করে জানিতে না পায়॥
নির্মল কোমল অঙ্গ যেন যূথিফুল। খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু মনে হৈল ভুল॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স। নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস॥
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ। যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ॥
কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে। আচমন করিয়া ঠাট কষ্টে উঠে খাটে॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে সুললিত। কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় কুহু গীত॥
মধুকর মধুকরী ঝংকারে কাননে। অপ্সরারা নৃত্য করে গীত আলাপনে॥
অনন্ত সামন্ত সৈন্য সেই গীত শুনি। পরম আনন্দে বঞ্চে বসন্তরজনী॥
সবে বলে দেশে যাই হেন সাধ নাই॥ অনায়াসে স্বর্গ মোরা পাইনু হেতাই॥
এত সুখ এ সংসারে কেহ নাহি করে। যে যায় সে যাউক আমি না যাইব ঘরে॥

(কৃত্তিবাস)

কত দূরে বাল্মীকি থেকে কৃত্তিবাস, দুয়ের আত্মায় ব্যবধান কী দুস্তর। অন্য-সব প্রসঙ্গের মতো, ইন্দ্রিয়সুখের প্রসঙ্গেও বাল্মীকি একেবারে বিকুণ্ঠ, তাই—যদিও ক্ষণিক, যদিও অলীক—বৈকুণ্ঠকেই আমাদের চোখের সামনে এনেছেন তিনি, কাম-কল্পনার পরমতাকে ; আর কৃত্তিবাসের মনে সংকোচ আছে ব'লে ভরদ্বাজের আশ্চর্য আতিথ্যে তিনি শুধু দেখেছেন ঔদরিকতার আকণ্ঠ উদারতা। বাল্মীকি ভরতসেনার মনে দেবত্বের বিভ্রম জন্মিয়েছেন, রাম-ভরত সম্বন্ধে তাদের উদাসীনতা যেন পদ্মভুকের আবেশ ; আর কৃত্তিবাসের সৈন্যসামন্ত যেন প্রাকৃতজন, শাক-ভাত খেয়ে মানুষ, হঠাৎ বড়োদরের নেমন্তন্ন পেয়ে এত খেয়ে ফেলেছে যে আর নড়তে পারছে না। বাল্মীকির ভোজ্য-তালিকা সুষম, সম্পূর্ণ এবং রাজকীয় ; মদ্য-মাংস বাদ দিতে গিয়ে কৃত্তিবাস সুবৃহৎ ফলারের বেশি কিছু জোটাতে পারেননি। আজকাল

২

যাকে জীবনের 'বাস্তব' দিক বলা হয়, সে-দিকে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যে উদাসীন বা অনিপুণ ছিলো না, বাল্মীকিতে তার প্রমাণ প্রচুর—কিন্তু সেটা কিছু জরুরি কথা নয়, আর সে-কথা প্রমাণ করবার গরজই বা কিসের। শুধু এটুকু ব'লে এ-প্রসঙ্গ শেষ করা যায় যে কৃত্তিবাস যে-সভ্যতার প্রতিভূ তার অশন-বসন রীতি-নীতি ধর্ম-কর্ম সবই অনেকটা নিচু স্তরের; যদিও তপোবনবাসী ব'লে কথিত, তবু বাল্মীকি রাজধানীরই রচনা, শ্রেষ্ঠ অর্থে নাগরিক, আর কৃত্তিবাস রাজবৃত হ'য়েও প্রাদেশিক, কেননা তাঁর রাজা নিজেই তা-ই। বিশ্ববাসী বাল্মীকির তুলনায় কৃত্তিবাসকে মনে হয় শুধুমাত্রই বাঙালি; ভাষান্তরে, বাঙাল।

৪

রামায়ণের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা রাম-চরিত্র। যে-রামের নাম করলে ভূত ভাগে, সেই রাম নিষ্ঠুর অন্যায় করেছেন একাধিকবার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে রামকে 'অন্য সমালোচনার আদর্শে' বিচার করাই চলবে না, ভেবে দেখতে হবে, যুগ-যুগ ধ'রে ভারতীয় মনে কোন মূর্তিটি তাঁর গ'ড়ে উঠেছে। রামচন্দ্রের এই প্রতিপত্তির মূল কোথায় তাও রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র দেখিয়েছেন: তিনি বালীবধ ক'রে সুগ্রীবকে রাজা করলেন, রাবণ-বধ ক'রে বিভীষণকে; কোনো রাজত্বই নিজে নিলেন না: এই উপায়ে, অভ্রান্ত কূটনীতির দ্বারা, আর্য-অনার্যে সম্পূর্ণ মিলন ঘটিয়ে বিশাল ভারতের ঐক্যসাধন করলেন, সম্ভবত ভারতীয় ইতিহাসে প্রথম ঐক্যসাধন। কালক্রমে তাঁর আদি-কাহিনীর 'মুখে-মুখে রূপান্তর ও ভাবান্তর' হ'তে লাগলো; গণ-মানসে তিনি প্রতিভাত হলেন লোকোত্তর পুরুষরূপে, এমনকি অবতার-রূপে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অনুসরণ ক'রে বলা যায় যে আদি-রামের মহিমা অনেকটা জুলিঅস সীজরের অনুরূপ; যে রাম-রাজ্য আর সাম্রাজ্য আসলে অভিন্ন; যে সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্চতম আদর্শের মহত্তম

ব্যঞ্জনা যেমন সীজর-জীবনে, তেমনি রাম-চরিতে। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞ, বাল্মীকি প'ড়ে তা ভালোই জানা যায়, শ্রেষ্ঠ এই কারণে যে কূটনীতির সঙ্গে ধর্মনীতিকে মোটের উপর মেলাতে পেরেছেন, যদিও মুমূর্ষু বালীর কানে তার নিধনের সমর্থনে যে-কথাগুলি তিনি জপলেন তাতে প্রকারান্তরে এই কথাই বলা হ'লো যে রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লে অন্যায় থেকে অবতারেরও ত্রাণ নেই।...কিন্তু এইজন্যই কি রাম এত বড়ো? মস্ত বীর, মস্ত রাজা ব'লে? সাম্রাজ্যের অতুলনীয় স্থপতি ব'লে?

অনেকটা রবীন্দ্রনাথের কথাই মেনে নিয়ে বসু-মহাশয়ও ভূমিকায় বলেছেন যে আধুনিক যুগের সংস্কার নিয়ে রামায়ণ বিচার সম্ভব নয়। যেমন, তিনি যুক্তি দিয়েছেন, রাজ্যের খাতিরে ভার্যাত্যাগ আমাদের দুঃসহ, তেমনি রামচন্দ্রের আজীবন একপত্নীকত্ব যে সেই হারেমবিলাসী যুগে কত বড়ো আদর্শের প্রতিরূপ, সেটাও আমাদের উপলব্ধির বহির্ভূত।...কিন্তু রামচন্দ্রকে কি আমরা বিচার করবো শুধু তৎকালীন সমাজব্যবস্থা অনুসারে? তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের চিরকালের আদর্শই যদি দেখতে না-পেলাম, তবে তিনি রাম কিসের। একটি বই স্ত্রী তাঁর ছিলো না, সেইজন্যই কি তিনি বড়ো? না কি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ শত্রু ব'লে?

আধুনিক পাঠকের চোখে রাম রীতিমতো অরাম হ'য়ে ওঠেন তাঁর সীতা-বর্জনের সময়। অগ্নি-পরীক্ষা তো সীতার নয়, রামের, আর সে-পরীক্ষার বিচারক আমরা। যুদ্ধ শেষ হ'লো; রাবণ মরলো; রাম বিভীষণকে বললেন, সীতাকে নিয়ে এসো আমার কাছে, সে স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'য়ে আসুক। সীতা বললেন, স্নান? তাতে দেরি হবে—আমাকে এখুনি নিয়ে চলো। কিন্তু স্নান তাঁকে করতে হ'লো, সাজতেও হ'লো, পালকি থেকে নামলেন রামের সভায়, বানর-রাক্ষস ভল্লুকের ভিড়ে। কতকাল পরে দেখা! কত দুঃখের পরে! 'লজ্জায় যেন নিজের দেহে লীন হ'য়ে' স্বামীর মুখের উপর চোখ রাখলেন সীতা, আর

তখন, তক্ষুনি, সেই রাক্ষস বানর ভল্লুকের ভিড়ে সীতাকে প্রথম কী-কথা বললেন রাম? বললেন:

> আমি যুদ্ধে শত্রু জয় ক'রে তোমাকে উদ্ধার করেছি, পৌরুষ দ্বারা যা করা যায় তা আমি করেছি। আমার ক্রোধ ও শত্রুকৃত অপমান দূর হয়েছে, প্রতিজ্ঞা পালিত হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি চপলমতি রাক্ষস কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলে তা দৈবকৃত দোষ, আমি মানুষ হ'য়ে তা ক্ষালন করেছি।···তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম—সুহৃদ্‌গণের বাহুবলে যা থেকে মুক্ত হয়েছি—এ তোমার জন্য করা হয়নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন, এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্যই এই কার্য করেছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে, নেত্ররোগীর সম্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ কষ্টকর। তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখেছে, এখন যদি তোমাকে পুনর্গ্রহণ করি তবে কি ক'রে নিজের মহৎ বংশের পরিচয় দেব? যে উদ্দেশ্যে তোমাকে উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি মতি স্থির ক'রে বলছি—লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তাঁর কাছে যাও, অথবা তোমার যা অভিরুচি কর। সীতা, তুমি দিব্যরূপা মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্যাবলম্বন করেনি।
>
> (রাজশেখর বসুর অনুবাদ।)

ছী-ছি—আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা কলরোল ক'রে ব'লে ওঠে—ছী-ছি! বিশেষ ক'রে ঐ শেষের কথাটা—লক্ষ্মণ ভরত সুগ্রীব বিভীষণ যার কাছে ইচ্ছা যাও—কী ক'রে রামচন্দ্র মুখে আনতে পারলেন, ভাবতেই বা পেরেছিলেন কী ক'রে! এ তো শুধু হৃদয়হীন নয়, রুচিহীন; 'নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে যেমন বলে', এ তো তেমনি, সীতার এই উত্তর আমাদের সকলেরই মনের কথা। আর এখানেই শেষ নয়; অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর আবার সীতাবিসর্জন; যদিও রামচন্দ্রের অন্তরাত্মা জানে যে সীতা শুদ্ধশীলা, তবু বাজে লোকদের

বাজে কথা কানে তুলে সীতাকে তিনি নির্বাসনে পাঠালেন—পাঠালেন ফাঁকি দিয়ে, যেন সীতার আশ্রম-দর্শনের ইচ্ছা পূর্ণ করছেন, এইরকম ভাণ ক'রে। আবার বিরহ! কিন্তু রামের বিরহদুঃখের কোনো কথাই এবার আমরা শুনলাম না; রাজকার্যেই নিবিষ্ট দেখলাম তাঁকে; যতদিন না অশ্বমেধ-যজ্ঞসভায় লবকুশকে দেখে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হ'লো। তাঁর আহ্বানে স্বয়ং বাল্মীকি এলেন, সীতাকে নিয়ে সেই সভায়। সেবার লঙ্কায় দর্শক ছিলো শুধু রাক্ষস বানর ভল্লুকের দল; এবার রাজসভায়, যজ্ঞভূমিতে, সকল গুরুজনেরা উপস্থিত, শ্রেষ্ঠ মুনিগণ উপবিষ্ট, রাক্ষস বানর এবং 'বহু সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কৌতূহলী হ'য়ে এল', শেষ পর্যন্ত স্বর্গের দেবতারাও না-এসে পারলেন না। ত্রিলোকের অধিবাসীর সামনে আবার সীতার পরীক্ষা—কিন্তু এ-পরীক্ষাও রামচন্দ্রের, আর বিচারক আমরা। সীতা মুখ নিচু ক'রে নিঃশব্দ, তাঁর হ'য়ে কথা বললেন বাল্মীকি। উত্তরে রাম বললেন:

> ধর্মজ্ঞ, আপনি যা বললেন সমস্তই বিশ্বাস করি।···লোকাপবাদ বড় প্রবল, তার ভয়েই এঁকে অপাপা জেনেও পুনর্বার ত্যাগ করেছিলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।···জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাবা মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হ'ক।

রাম সীতাকে গ্রহণ করবেন, সে-জন্য অনুমতি চাচ্ছেন জগতের! এত দুঃখ সইতে পেরেছেন যে-সীতা, এ-দুঃখ তাঁর সইলো না,

> রাম ভিন্ন আর কাকেও জানি না—এই কথা যদি আমি সত্য ব'লে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হ'য়ে আমাকে আশ্রয় দিন—

এই ব'লে পৃথিবীর বিবরে তিনি প্রবেশ করলেন।

সীতার দুঃখে পুরুষানুক্রমে আমরা কেঁদে আসছি। শ্রীযুক্ত বসুও তাঁর ভূমিকায় প্রশ্ন করেছেন: 'দু-দুবার সীতাকে নিগৃহীত করবার কী দরকার ছিল?' উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচনা নয়, এই পণ্ডিত-পোষিত অনুমানে সান্ত্বনা খুঁজেছেন তিনি। কিন্তু উত্তরকাণ্ড না-থাকলে রামায়ণ এত বড়ো কাব্যই তো হ'তো না। লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা

লক্ষ্মী মেয়ের মতো রামের কোলে ব'সে পুষ্পকে চ'ড়ে অযোধ্যায় এলেন, আর তারপর ঘরকন্না ক'রে বাকি জীবন সুখে কাটালেন—এই যদি রামায়ণের শেষ হ'তো, তাহ'লে কি সমগ্র ভারতীয় জীবনে, শতাব্দীর পর শতাব্দী, রামায়ণের প্রভাব এমন ব্যাপক, এমন গভীর হ'তে পারতো? বাল্মীকি যদি উত্তরকাণ্ড না-লিখে থাকেন, তবে সেইটুকুই বাল্মীকিত্বে তিনি ন্যূন। উত্তরকাণ্ড যে-কবির রচনা তিনি বাল্মীকি না হোন, বাল্মীকিপ্রতিম নিশ্চয়ই: বস্তুত, রামায়ণকে মৃত্যুহীন মহাকাব্যে পরিণত করলেন তিনিই। যে-সীতার জন্য এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এমন সুদীর্ঘ সুতীব্র উদ্যম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হ'লো, ছাড়তে হ'লো স্বেচ্ছায়, এই কথাটাই তো রামায়ণের আসল কথা। যে-রাজ্য নিয়ে অত বড়ো কুরুক্ষেত্র ঘ'টে গেলো, সে-রাজ্য কি পাণ্ডবেরা ভোগ করেছিলেন? যে-মুহূর্তে সব পেলেন সে-মুহূর্তে সব ছাড়লেন তাঁরা, বেরিয়ে পড়লেন মহাপ্রস্থানের ভীষণ নির্জনে। যেই যুদ্ধে জয় হ'লো, রামও তক্ষুনি সীতাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত।…কর্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে নয়।…রামের যুদ্ধ, পাণ্ডবের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ তো এইজন্যই। তা না-হ'লে লোভীর সঙ্গে লোভীর যে-সব দ্বন্দ্ব মানুষের ইতিহাসে চিরকাল ঘ'টে আসছে, তার সঙ্গে এ-সবের প্রভেদ থাকতো কোথায়। লোভীর বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ধরে, সে নিজেও লোভী ব'লে আধুনিক যুদ্ধে শুধু বীভৎসতা, শুধু হত্যার বীভৎসতা; কিন্তু পাণ্ডবের যুদ্ধে, রামের যুদ্ধে ফলে অধিকার নেই, অধিকার শুধু কর্মে—আর তাই তাতে চিত্তশুদ্ধি, অসীম চিত্তশুদ্ধি।

৫

রাম তাঁর কর্মকে মেনে নিয়েছেন। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কোন ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ তা তিনি জানেন, আর জীবনের প্রত্যেক অবস্থায়, সুখে এবং দুঃখে, সম্পদে এবং সংকটে সেই ভূমিকাটি সুসম্পন্ন করতে যথাসাধ্য তিনি সচেষ্ট। তাই তিনি অধৈর্যহীন, অক্লিষ্টকর্মা,

শান্ত, শ্যামল, নিষ্কাম। বিপদে তিনি বিচলিত, কিন্তু বিহ্বল নন, সৌভাগ্যে তিনি প্রমত্ত নন, যদিও প্রীত। স্বর্ণমৃগ যখন মৃত্যুকালে স্বরূপ ধারণ করলো, তখনও, রাক্ষসের মায়া বুঝতে পেরেও, রাম খুব বেশি ব্যস্ত হলেন না, 'অন্য মৃগ বধ ক'রে মাংস নিয়ে' তবে বাড়ি ফিরলেন। সীতা-উদ্ধারের উদ্যোগ আরম্ভ হবার আগেই বর্ষা নামলো মাল্যবান পর্বতে, এই নিদারুণ সংকটে চার মাস চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে ব'লে মুহূর্তের জন্যও উদ্‌ভ্রান্ত হলেন না, বরং এই অনভিপ্রেত নিষ্ক্রিয়তাকে বর্ষা-শরতের লীলাক্ষেত্র ক'রে তুললেন, আর শরতের শেষে যুদ্ধারম্ভের জন্য লক্ষ্মণকেই দেখা গেলো বেশি উদ্‌গ্রীব। রাম অধৈর্যহীন, বৈক্লব্যহীন, রাম ধীর স্নিগ্ধ গম্ভীর; যা করতে হবে সব করেন, কিন্তু এটা কখনো ভোলেন না যে এ-সমস্তই রঙ্গমঞ্চে তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকার অংশ মাত্র। বালীর মৃত্যুশয্যায় রাম নিজের সমর্থনের যে-চেষ্টা করলেন তা একেবারেই অনর্থক হ'তো, যদি না তাঁর মধ্যে এ-কথাটি থাকতো: 'তোমাকে আমি ক্রোধবশে বধ করিনি, বধ ক'রে আমার মনস্তাপও হয়নি।' এই পবিত্র অপার্থিবতা, এই ঐশ্বরিক উদাসীনতার মুখোমুখি আবার আমরা দাঁড়ালাম যুদ্ধকাণ্ডের শেষে, রাম যখন সীতাকে বললেন: 'তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম…এ তোমার জন্য করা হয় নি।' তোমার জন্য করিনি—তার মানে, আমার নিজের জন্য করিনি, শুধু করতে হবে ব'লেই করেছি। শুধু একবার, শেষবারের মতো সীতা যখন অন্তর্হিত হলেন, সেই একবার তিনি 'মৈথিলীর জন্য উন্মত্ত' হলেন, 'জগৎ শূন্যময় দেখতে লাগলেন, কিছুতেই মনে শান্তি পেলেন না।' তবু তো তার পরেও—যদিও, যেহেতু তিনি নররূপী বিষ্ণু, স্বর্গে সীতার সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন তিনি ইচ্ছা করলে তখনই হ'তে পারতো—তার পরেও রাজত্ব করলেন 'দশসহস্র বৎসর,' সকল রকম ধর্মানুষ্ঠান করলেন, ভরত লক্ষ্মণের পুত্রদের রাজত্ব দিলেন, আর সর্বশেষে (এ-ঘটনাটা সর্বসাধারণে তেমন সুবিদিত নয়) প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে ত্যাগ করলেন প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য।

'সৌমিত্রি, তোমাকে বিসর্জন দিলাম,' রামকে এ-কথাও বলতে হ'লো নিজের মুখে। প্রতিজ্ঞা-পালন তো উপলক্ষ্য মাত্র ; আসল কথাটা এই যে, যেমন সীতাকে, তেমনি লক্ষ্মণকেও, স্বেচ্ছায় ছাড়তে হবে— নয়তো মর্ত্যের বন্ধন থেকে রাম মুক্ত হবেন কেমন ক'রে। স্বর্গারোহণের পথে যুধিষ্ঠিরকেও একে-একে ছাড়তে হ'লো নকুল সহদেব অর্জুন ভীম আর প্রিয়তমা পাঞ্চালীকে। স্বর্গের পথ নির্জন।

বাল্মীকিতে এ-কথাটা একটু জোর দিয়েই বার-বার বলা হয়েছে যে রাম অবতার হ'লেও মানুষ, নিতান্তই মানুষ। মনুষ্যত্বের মহত্তম আদর্শের প্রতিভূ তিনি, বিশেষ-কোনো একটি দেশের বা যুগের নয়, সর্বদেশের, সর্বকালের। দেহধারী মানুষ হ'য়ে, স্থানে ও কালে সীমিত হ'য়ে যতটা মুক্ত, শুদ্ধ, সুন্দর হওয়া সম্ভব, রামচন্দ্র তা-ই। যদি তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণই হবেন, তবে মারীচের রাক্ষসী মায়ায় মজবেন কেন। মানুষ তিনি, নিতান্তই মানুষ, এবং সম্পূর্ণ মানুষ, তাই মানুষের দুঃখ সম্পূর্ণ তাঁকে জানতে হবে, এমনকি মনুষ্যত্বের অবমাননা থেকেও তাঁর নিস্তার নেই। তাই তো তাঁকে স্বীকার ক'রে নিতে হ'লো বালী-হত্যার হীনতা, সীতা-বর্জনের কলঙ্ক, শম্বুক-বধের অপরাধ। যদি এ-সব না-ঘটতো, যদি তিনি জীবনে একটিও অন্যায় না-করতেন, তবে তাঁর নর-জন্ম সার্থক হ'তো না, মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকতো, তবে তিনি হতেন নিয়তির অতীত, প্রকৃতির অতীত, অর্থাৎ আমরা তাঁকে আমাদের একাত্ম ব'লে মনে করতে পারতাম না—আর তাহ'লে রামায়ণের কাব্যগৌরব কতটুকু থাকতো ? রাম করুণাময়, পতিতপাবন, তিনি পা ছোঁওয়ালে অহল্যা বাঁচে, রাবণ সুদ্ধু তাঁর হাতে মরতে পেরে ধন্য ; তবু তো কারুরই—কোনো অন্ধ ভক্তেরও—বুদ্ধ বা যীশুর মতো লাগে না তাঁকে। আদিকবির নির্ভুল বাস্তবিকতা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে মহামানব তিনি নন, কিন্তু তিনি-যে মানব, এই সত্যটাই মহান।

রামায়ণের ঘটনাচক্র এই মনুষ্যত্বের বহুল-বিচিত্র ব্যঞ্জনার উপলক্ষ্য

মাত্র। 'মাইকেল' প্রবন্ধে আমি এ-প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম : রাবণ সীতা-হরণ করেছিলেন কেন। শ্রীযুক্ত বসুর বইখানাতে এ-প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করলাম ; যে-উত্তর আমার মন চেয়েছিলো, তা সে পেলো না। সমস্তটাই ছল ; সমস্তটাই লীলা। রাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ মুখস্থ ক'রেই রঙ্গমঞ্চে নেমেছেন, কিসের পর কী। তা তিনি সবই জানেন, তবু যেন জানেন না ; মহৎ অভিনেতার মতো আমাদের মনে এই মোহ জন্মাচ্ছেন যে ঘটনাবলী তাঁর অপ্রত্যাশিত, নিয়তি তাঁর কাছেও স্বৈরিণী, যেন এটা অভিনয় নয়, জীবন। জটায়ুকে পরাস্ত ক'রে রাবণ যখন সীতাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন 'দণ্ডকারণ্য-বাসী মহর্ষিগণ রাবণবধের সূচনায় তুষ্ট হলেন' : সীতাহরণটা আর-কিছু নয়, শুধু রাবণবধের ছল। আর রাবণবধও আর-কিছু নয়, শুধু রামের কর্ম-উদ্‌যাপনের উপলক্ষ্য। সীতা-উদ্ধারের জন্য এত পরিশ্রমই বা কেন, ইচ্ছা করলে রাম কী না পারেন। কিন্তু ঐ ইচ্ছা করাটা তাঁর ভূমিকায় নেই, কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করেন না তিনি, তাঁকে মেনে নিতে হয় বর্ষার বাধা, সমুদ্রের ব্যবধান, ঘটনার অলঙ্ঘ্য প্রতিকূলতা ; বালীকে মেরে সুগ্রীবকে রাজত্ব দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় বানর-সেনা, যে-বানর মানুষেরও অধম ; দীন, দুর্বল, বর্বর সৈন্যদল নিয়ে এগোতে হয় চতুর, সুসংবদ্ধ, যন্ত্রনিপুণ দানবের বিরুদ্ধে। কেন ? না, এটাই মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতার উপায়। হনুমান অনায়াসেই সীতাকে পিঠে ক'রে নিয়ে আসতে পারতেন, তা তিনি চেয়েওছিলেন, যুদ্ধের তাহ'লে দরকারই হ'তো না, কিন্তু তা তো হ'তে পারে না, তাতে রামের পূর্ণতার হানি হয়। সীতা-উদ্ধার হ'লেই তো হ'লো না, সেটা সবচেয়ে দীর্ঘ, বঙ্কিত দুঃখের পথে হওয়া চাই : সীতা-উদ্ধার তো উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হ'লো রামের সর্বাঙ্গীণ মরত্ব-ভোগ। তাই হনুমানের প্রস্তাবে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন না সীতা, প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন :

> …সমস্ত রাক্ষসদের বধ ক'রে যদিও তুমি জয়ী হও, তাতে রামের যশোহানি হবে। রামের সঙ্গে তুমি এখানে এস, তাতেই

> মহৎ ফল হবে। যদি রাম এখানে এসে দশানন ও অন্য রাক্ষসদের বধ ক'রে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান তবেই তাঁর যোগ্য কাজ হবে।...তুমি একাই কার্য সাধন করতে পার তা জানি, কিন্তু রাম যদি সসৈন্যে এসে রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁর উচিত কার্য করা হবে।

রামায়ণের চরিত্র সাধারণত পুনরুক্তি করে না, কিন্তু সীতা হনুমানকে এই কথাটি দু বার বলছেন। তাঁর এ-আগ্রহ কি উদ্ধারের জন্য? তা যদি হ'তো তবে তো তিনি তক্ষুনি হনুমানের পৃষ্ঠারূঢ় হতেন। না, আগ্রহ এইজন্যই যাতে রামচন্দ্রের পূর্ণিমতা অবরুদ্ধ না হয়; আর সে-আগ্রহ শুধু সীতার নয়, কাব্যের স্রষ্টার, কাব্যের ভোক্তার।

৬

রামায়ণে অসংগতি অসংখ্য। অনেক ক্ষেত্রেই কবি আমাদের সম্ভাব্য কৌতূহলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে গেছেন। উপেক্ষিতা উর্মিলাকে বিখ্যাত করেছেন রবীন্দ্রনাথ; শ্রীযুক্ত বসুও ভূমিকায় কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। আদিকবির অবহেলার তালিকা ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছও নয়। উদাহরণত, বালীপত্নী তারাকে তিনি এমন ক'রে এঁকেছেন যেটা রীতিমতো মর্মঘাতী। পতির মৃত্যুতে চীৎকার ক'রে কাঁদতে শুনলাম তাঁকে, আর তার পরেই দেখা গেলো ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সামনে তিনি বেরিয়ে এলেন সেই অন্তঃপুর থেকে, যেখানে 'সুগ্রীব প্রমদাগণে বেষ্টিত হ'য়ে রুমাকে আলিঙ্গন ক'রে স্বর্ণাসনে ব'সে আছেন', 'মদবিহ্বলা' তিনি, স্খলিতগমনা, এসে লক্ষ্মণের কাছে তৈলাক্ত ওকালতি করলেন সেই সুগ্রীবের পক্ষ নিয়ে, যে-সুগ্রীব যথার্থ বালীহন্তা। আমাদের অবাক লাগে বইকি।...কিন্তু আদিকবি উদাসীন, আধুনিক কালে আমরা যাকে শিল্পী বলি, তা তিনি নন; শিশুর শিল্পহীনতায় তিনি অধিকার করেন আমাদের, কত বাদ দিয়ে যান, কত ভুলে যান, কত এলোমেলো, কত অতিরঞ্জন, অবান্তরতা;

কোনো কৌশল জানেন না তিনি, সাজাতে শেখেননি; আমাদের ধ'রে রাখে শুধু তাঁর সত্যদৃষ্টি, তাঁর মৌল, সহজ, সামগ্রিক সত্যদৃষ্টি। তাঁর বাস্তবিকতা এতই বিরাট ও সর্বংসহ যে একদিকে যেমন ঘটনাবর্ণনে কি চরিত্রচিত্রণে নিছক বাস্তবসদৃশতার জন্য তিনি ব্যস্ত নন, তেমনি ডিকেন্স বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রত্যেকটি পাত্র-পাত্রীর শেষ পর্যন্ত কী হ'লো, তা জানাবার দায় থেকেও তিনি মুক্ত। যে-রকম একটি সুযোগ পেলে আমরা আধুনিক লেখকরা ব'র্তে যাই, সে-রকম কত সুযোগ হেলায় হারিয়েছেন—সেগুলি কোনোরকম সুযোগ ব'লেই মনে হয়নি তাঁর। শুধু যে উর্মিলাকে একেবারে ভুলে গেছেন তা নয়, লক্ষ্মণকেও ভুলেছেন, কেননা একবার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো না লক্ষ্মণের, বনবাসযাত্রার সময় স্ত্রীর কাছে একটু বিদায় পর্যন্ত নিলেন না। আর কৈকেয়ীকেও বলতে গেলে সেই একবারই আমরা দেখলাম, পরে কি তাঁর অনুশোচনা হয়নি? আমাদের এ-সব জিজ্ঞাসার উত্তর বইতে নেই, আছে আমাদেরই হৃদয়ে। সে-হৃদয়লিপির রচয়িতাও রামায়ণের কবি। আমরা যে উর্মিলার কথা ভাবি, লক্ষ্মণের হ'য়ে আমাদের যে মন-কেমন করে, কৈকেয়ীর হ'য়ে আমরা যে অনুশোচনা করি—এ-সমস্তই কি বাল্মীকির বলা নয়? আদিকবির শিল্পহীনতার চরম রহস্য তো এইখানেই যে আমরা তাঁর পাঠক শুধু নই, তাঁর সহকর্মী, তিনি নিজে যা বলতে ভোলেন, সে-কথা রচনা করিয়ে নেন আমাদের দিয়ে। কেউ হয়তো বলবেন যে রাম ছাড়া অন্য সকলেই তাঁর কাছে উপেক্ষিত: অন্য সব চরিত্রই খণ্ডিত, মাত্র একটি লক্ষণসম্পন্ন; লক্ষ্মণ শুধুই ভাই, হনুমান শুধুই সেবক, রাবণ শুধুই শক্তিশালী—একমাত্র রাম সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ। কিন্তু রামের সম্বন্ধেই কবির উপেক্ষা কি কম! রাম প্রেমিক, রাম-সীতা দাম্পত্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, কিন্তু তাঁদের যুগল-জীবনের পরিধি কতটুকু! বলতে গেলে সারা জীবনই রামকে সীতাবিরহে কাটাতে হ'লো। এ-বিরহে সীতার প্রতি কবির করুণা প্রচুর, কিন্তু রাম সম্বন্ধে তাঁর মুখে বেশি

কথা নেই। যখন সীতাহরণ; যখন পুনর্জিতার প্রত্যাখ্যান, যখন গণরঞ্জনী সীতাবর্জন;—এই তিনবারের একবারও রামকে তেমন শোকার্ত আমরা দেখলাম না; মনে-মনে বললাম, রাজ-রীতির খাতিরে না-হয় বাধ্যই হয়েছিলেন, তাই ব'লে দুঃখও কি পেতে নেই!...কিন্তু রামের উদাসীনতায়, কিংবা রামের প্রতি কবির উদাসীনতায়, আমাদের মনে যে-দুঃখ, সেই দুঃখই তো রামের; যে-রাম সীতার জন্য কাঁদছেন, সে-রাম আমরাই তো। নাটক রঙ্গমঞ্চে আরম্ভ হ'য়ে শেষ হ'লো প্রেক্ষাগৃহে; রঙ্গমঞ্চে একজন রাম যা করলেন, তার জন্য প্রেক্ষাগৃহের লক্ষ-লক্ষ রামের কান্না আর ফুরোয় না। হয়তো উদাসীনতাই অভিনিবেশের চরম; হয়তো উপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষা; হয়তো শিল্পহীনতার অচেতনেই শিল্প-শক্তির এমন-একটি অব্যর্থ সন্ধান ছিলো, যা ফিরে পেতে হ'লে সমস্ত সভ্যতা লুপ্ত ক'রে দিয়ে মানবজাতিকে আবার নতুন ক'রে প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হবে।

নেপথ্যনাটক

বুদ্ধদেব বসু

তাব'লে সত্যি তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সে কি স্বপ্নে ভেবেছি!

অনেক পড়েছি তোমার লেখা, সদলে, সরবে কমনরুমে,
রাত্তিরে নিঃশব্দে একা—তাব'লে সত্যি-সত্যি দেখা!
আর তাও উজ্জ্বলা দত্তর মাল-পত্তরে দম-আটকানো ড্রয়িংরুমে!
তোমারও কি উজ্জ্বলা দত্তর রুজ-জ্বলা গাল, গালা-গলা ঠোঁট,
        চড়া গলা আর ঢ'লে-পড়া চোখ ভালো লাগে তবে?
ভালো লাগে নয়নাঞ্জনী জিন, বিজ্ঞাপনিক শিফন, সাটিন,
        গাত্রবরন গাত্রাবরণ, হল্লা, জেল্লা?
ভালো লাগে ভিড় তাহ'লে কবির?
সত্যি?—যখনই তোমার লেখা পড়েছি রাত্রে ঘুমের আগে,
ভেবেছি তুমি একান্ত একা শীতের আকাশে চাঁদের মতো:
আমরা কুয়াশা-ধোঁয়ায় বন্দী কিংবা ঘুমের আরামে অন্ধ,
জানলা-বন্ধ আবছা আকাশে আপন আভায় জড়ানো, মগ্ন,
লক্ষ ঘুমের রাত ভ'রে তুমি একলা-আলোর শুক্লপক্ষ,
স্বপ্নই শুধু সঙ্গ তোমার—সত্যি কি তা-ই?
আমাদের আচ্ছাদন দেহের মেদের মোমের নরম আরাম,
        তা-ও তুমি চাও?
তুমি না উদাস, তুমি না উধাও?
শরীরের নীড়ে ছোট্ট উষ্ণ সুখের শাবক পুষতে কি চাও,
যার নাম নেই তারে কি নামের ক্ষণিক খেলার খাঁচায় নাচাও,
সে নেই জেনেও তার জন্যে কি আঁচল বিছাও
হাঁপানো কাঁচুলি ফাঁপানো চুলের কোঁকড়া রেখায়,
কঙ্কণ-নিক্কণিত হাতের সূক্ষ্ম-ত্রিকোণ চিকন নখের রক্তলেখায়,

সঙ্গসুখের অঙ্গলিখন নখের রেখার চন্দ্রলেখায়,
বাঁকানো চোখের বিবশ বিশদ চক্রান্তের ঈষৎ-নেশায় ?
যে-নাম তোমার গানের প্রাণের, বানিয়ে নিতে কি চাও সে-বাগ্মীর
ছায়াচ্ছন্ন ছন্দ কখনো অঙ্গে-অঙ্গে রম্য রঙ্গে রক্তমাংসে ?
—তুমিও ?

কিন্তু তাতে কী।. . .
সবার মধ্যে আছে মানুষের সত্তা, তাব'লে সবার উপরে মানুষ সত্য,
এ-কথা মানিনি কখনো মানিনি আজও মানবো না।
ঐ উজ্জ্বলা কলেজে আমার সঙ্গে পড়তো।
ফ্যাশন-নিশেনি, বুকনি-বোঝাই, কিন্তু বোকা—
উঃ, কী বোকা !
রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যিশ ইংরেজিতেও কিছু লিখেছিলেন, তা-
না-হ'লে কি আর তাঁর নামও কেউ করতো ওরা !
তা অবশ্য দেখতে ভালো, তারউপর বাপ মেঅর ছিলেন,
তাই চটপট করলো আলো লক্ষ্মীর বরপুত্রের ঘর।
তাই আজ তার ড্রয়িংরুমের বাহার বাড়ায় যামিনী রায়ের
ছবি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ; যদিও বেচারা আজও বুঝলো না,
কোনটা যে কবি-ঠাকুরের আর কোন পদ্যটা কামিনী রায়ের।
তাই আজ তার ডিনারে বণিক সৈনিক রাজমন্ত্রীর ভিড়ে
টেবিল সাজায় ফিল্মের সম্রাজ্ঞীর পাশে কবিকে বসিয়ে।
এতে মনে-মনে ধন্য হবে এমন কবি তো অনেক আছেন,
কেননা সবারই আছে মানুষের সত্তা, শরীর, কবিরও আছে—
কিন্তু তুমিও ?

ঈর্ষা ? আমার ঈর্ষা কি এটা ?. . . নিশ্চয়ই !
ঈর্ষা তোমার দেহকে, যে-দেহ দেয়াল তুলে

রেখেছে তোমারে রেখেছে ঢেকে আমার ক্ষুধার দৃষ্টি থেকে ;
ঈর্ষা সে-ঈশ্বরকে, যিনি এ-শরীর বানিয়ে শরীরে দিলেন
এমন ক'রেই বেঁধে আমাদের যে তার সীমার শাসন ছাড়ায়ে
জীবিতকে দেখা যায় না, যায় না। আরেকজনের আয়না আমরা
যদি হ'তে পারি, সবচেয়ে বেশি মেশামেশি তা-ই,
একজন হবে আরেকজন তা অসম্ভব।
তাই তো তোমারে যত ডাকি তার নেই উত্তর ;
দূরে এককোণে ভিড়ের মধ্যে একা ব'সে দেখি, তুমি আছো
উজ্জ্বলা দত্তর অঞ্চল-তল-উত্তাপে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ;
যে করে তোমার খ্যাতিরে খাতির, আর কিছু না,
তোমার কীর্তি ভাঙিয়ে গায়ের গয়না গড়ায়, আর কিছু না ;
যে তোমার দিকে ফিরে তাকাতো না, যদি হ'তে তুমি আপাতবেকার
যুবক-কবি;
জনতার মুখে ধিক্-জ্ঞাপনের বিজ্ঞাপনও যে পায়নি, এমন
প্রৌঢ় কবি,
যে তোমার লেখা কিছুই পড়েনি, কিছুই পড়ে না ;
যে তোমার কিছু জানে না, বোঝে না, কখনো খোঁজে না
তোমার তোমারে;
যে-তোমারে আমি খুঁজি তার অস্তিত্ব জানে না,
যে-তোমারে আমি জানি তার কোনো আভাস কখনো দেখতে পেলে
চীৎকার ক'রে আঁৎকে উঠবে
যে-উজ্জ্বলা। সেই উজ্জ্বলা আমাকে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে
দিলো,
একটু পরেই ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে গেলো।
এক কোণে একা চুপ ক'রে ব'সে দেখলুম তুমি দিব্যি মানিয়ে গেছো
এই ভিড়ে,
বাহারে, শহুরে, মোলায়েম তুমি, দেখলেম ;

মধ্যবয়সী মেয়েদের মুখে কাকাতুয়া-কথা কাতুকুতু-হাসি বেশ ভালো
লাগে,
চটুল ঠাট্টা তৈরি ঠোঁটে, লাজুক ভাবুক মোটেও নও।
আমি-যে ভেবেছি আর কারো মতো নও তুমি নও, তা নয়, তাহ'লে?
তবে যে তোমাকে শান্ত-শাণিত, নির্মম-নিঃসঙ্গ ভেবেছি,
শীতের রাতের চাঁদের আলো যেমন আকাশে মগ্ন একা।
তাহ'লে তোমার সঙ্গে দেখা না-হ'লেই ছিলো সত্যি ভালো?—
তুমি যে কেমন জেনেছি স্বপ্নে, তুমি যে এমন স্বপ্নে ভাবিনি।

পার্টি ভাঙলো রাত্তির এগারোটায়, বরুণ মিত্তির এসে বললে, 'চলুন
আমার গাড়িতে।'
ঠোঁট তার ঠিক কমলালেবুর কোয়ার মতো, গাল ছুটো তার চর্বির ঢিপি,
গর্বিত ঘাড় গোলাপি রঙের,
লালচে চোখের ট্যারচা চাউনি—মন্দ কী,
তা মন্দ কী।
চুপচাপ একা ব'সে-ব'সে হাই উঠছিলো, তাই বাধ্য হ'য়েই ককটেল
খেয়েছিলুম একটা,
মাথাটা একটু ঝাপসা, যেমন আবছা শীতের ফাঁকা রাস্তায়
গাড়ির মধ্যে অন্ধকারের সন্ধানী হাত। গাড়ির চলনী চাকায় একহাত,
বরুণ আরেক হাতে চুপচাপ কোমর জড়িয়ে ধরলো—আচ্ছা।
কী এসে যায়।
অ্যাক্সিডেণ্ট না-করলেই বাঁচি।
স'রে গেলুম না, বরং একটু স'রেই এলুম—
কী এসে যায়।
হাতের সাহস বাড়লো ক্রমে রমেশ মিত্র রোডের কোণে
আবছা রাতের আচ্ছাদনে—আচ্ছা বেশ।

বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকেই চমকে দেখি হঠাৎ
জানলা খোলা, আকাশ খোলা,
রাতের রূপের ঘোমটা তোলা,
নিখিল-নীলের মুক্ত খিল,
মুক্ত চাঁদ, একলা চাঁদ, শান্ত রাত হালকা-নীল।
তক্ষুনি মনে পড়লো তোমার কবিতা, কে যেন হানলো দারুণ
ছুর্বার হাত
বুকের মধ্যে, হৃৎপিণ্ডের রুদ্ধ কপাট
খুলে দিলো কোন মত্ত আঘাত, স্বপ্ন-প্রপাত
নামলো বুকের শিরায়-শিরায়—এ কী উন্মাদ
অনিদ্রা, এ কী উদ্দাম হাত, উন্মাদ রাত!
...শাড়ি না-ছেড়েই আলো না-জ্বেলেই ব'সে পড়লুম বুকের উপর
ছু'হাত চেপে,
বুকের মধ্যে উঠলো কেঁপে তোমার সঙ্গে একটু দেখা।
অবশ্য কোনো কথাই বলোনি আমার সঙ্গে—কিন্তু তাতে কী।
অঙ্গে, রঙ্গে, রক্তমাংসে সুখ তুমি পাও,
ছোট্ট নরম পাখিরে নাচাও দেহের মেদের উষ্ণ খাঁচায়,
মধ্যবয়সী মত্তবিলাসী পুরুষের বাঁকা হাসির পিছল আমোদ
তোমার মন্দ লাগে না,
মধ্যবয়সী ঈষৎ-মত্ত মেয়েদের কাকাতুয়া-কণ্ঠের চটুল ঠাট্টা
বেশ ভালো লাগে,
বেশ নেশা লাগে রেশমি সবুজে, আঁটো সাটিনের হাঁপানো হলুদে,
প্যাঁচানো চুলের ঠমকে, ঠোঁটের চ্যাঁচানো লালে;
আনন্দহীন উত্তেজনায়, উল্লোল উল্লাসের ফেনায়,
হুল্লোড়ে, ভিড়ে, তীব্রতায় দিব্যি তোমাকে মানিয়ে যায়।
—কিন্তু তাতে কী, তাতে কী, তাতে কী, তাতে কী।

আমারি ভুল।
আমার মনের ছবির সঙ্গে ঠিক মিলে যাবে, ভাবাই ভুল।
যা দিয়ে তোমাকে বানিয়েছিলুম, সাজিয়েছিলুম,
সেটা তো আমার ইচ্ছাই—ছি-ছি,
কী ছেলেমানুষি।
সে-ইচ্ছায়
কী এসে যায়।
আমিও শীতের রাত্তিরে দিলুম বরুণ মিত্তিরে
আমার দেহের একটু তাপ—কী এসে যায়।
তাব'লে বরুণ আমার কী জানে!... আর তুমি, কবি, হে কবি আমার,
হে কবি, তোমার
কী আর জানবো চোখে দেখে আর কানে শুনে আর ডিনারে তোমার
পাশে বসলেও!
আমার পরান যা চায় তুমি যে তা-ই, তুমি তা-ই ; তোমারে কি
আমি করবো যাচাই
প্রাত্যহিকের বাধ্য-বাঁচায়, বন্দী দেহের ক্ষুদ্র খাঁচায়,
ইচ্ছার সম্মোহিত নাচায়? করবো বাছাই
মানুষের ভিড়ে? তাও কি হয়।
তুমি যে নও
আর কারো মতো, সেটা কি জানবো মুখের রেখায়, মুখের কথায়,
চোখের ক্ষণেক দেখায়, কিংবা দেহের অনেক আবশ্যিকের
বদভ্যাসে, মুদ্রাদোষে?
আমিও কি তবে আর-সবার
মতো সহজেই মানবো হার
সবারই মধ্যে আছেই আছে
যে-মানুষ, তার ছলের কাছে।

তোমার মধ্যে কবিকে দেখতে পেলে উজ্জ্বলা দত্তর দল আঁৎকে উঠবে—
তাই কি কবিকে রেখেছো দূরে মানুষে মুড়ে?
তাই কি আমারও চোখ সেখানেই আটকে গেলো?
দেখেও তোমারে হ'লো না দেখা,
দেখলুম শুধু মুখের রেখা?
অথচ যখনই তোমার লেখা
পড়েছি একলা রাত্তিরে,
জেনেছি তুমি একান্ত একা,
আর কারো মতো নও তুমি, নও।
—কিন্তু তা-ই তো, সত্যি তা-ই তো, তা-ই তো!

চাঁদ চ'লে গেছে চোখের বাইরে, আবছা আকাশে চাঁদের আভায়
ছড়ানো আমার মনের ভাবায়
যেন চোখে দেখি তোমারে, যে-তুমি তোমার, তোমার স্বপ্নের।
সে-ই তো তুমি।
অনেক ভিড়েও তুমি-যে একা,
কেউ কি জানে।
একলা-তোমার লক্ষ সঙ্গী,
কেউ কি জানে।
মুখে সিগারেট তুলে দেশলাই জ্বালবার আগে তুমি কী ভাবো,
কেউ কি জানে।
মুখের সাবানে চলতে-চলতে ক্ষুর-ধরা হাত কেন যে হঠাৎ
থেমে যায়, তা তো কেউ জানে না,
তুমিও না।
তোমার কবিতা উঠছে যে কোন গূঢ় গোপন উৎস থেকে,
তুমি কি নিজেই জানো তা, কবি?

তোমার জীবনে কত-যে জীবন, তোমার চিত্তে কত-যে চেতনা,
তোমার রক্তে আদিম অসীম সমুদ্র কত ঢেউ তুলে যায়,
তুমি কি নিজেই জানো না, ভাবো তা ?
তোমার কবিতা যখনই পড়েছি, চিনেছি তোমারে, ভাবিনি
সে-তুমি কে ?
আমার পরান যেমতি কহিছে তেমতি, তেমতি সে।
আবছা রাতের চাঁদের ছায়ায় ব'সে-ব'সে তাই ভাবছি তুমি-যে
তা-ই, তুমি তা-ই,
আমার পরান যা চায় তুমি-যে তা-ই,
যে-তুমি তোমার কবিতা, তুমি তো তা-ই ;
সবার উপরে মানুষ সত্য এ-কথা মানি না, কেননা জেনেছি মানুষের
'পরে কবি-যে সত্য। ভালোই হ'লো,
তোমার সঙ্গে দেখা-যে হ'লো।
যে-তুমি আছো দেশে ও কালে,
যে-তুমি বাঁচো দেহের সীমায়,
সে কোন দূরে রইলো প'ড়ে ;
তবু তো রাত, তবু তো চাঁদ
তোমাকে চায়, তোমাতে ছায়। এই তো হাত
পড়লো আমার বুকের মধ্যে, কী উন্মাদ,
কী উন্মাদ ! তোমারই হাত, তুমি সে-হাত !
তুমি এ-মুক্ত মত্ত রাত, নির্মম-নিঃসঙ্গ চাঁদ ;
আজ রাত্রির স্বপ্নময় আনন্দের অনিদ্রায়
তোমাকে আমি যা ভাবছি তা-ই, তুমি তো তা-ই, সত্যি তা-ই।

ক্ষীণ আশা

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তোমরা বলিতে পারো ?
—আকাশের তারায় তারায়
মানুষের ক্ষীণ আশা জ্ব'লে ওঠে রাত্রির আঁধারে
কোটি কোটি মানুষের কোনো আশা মানে নাকো বাধা
সমস্ত রাত্রিতে জ্বলে, নিবে যায় প্রভাতবেলায় ?

সে-আশা কি সঙ্কুচিত ম্রিয়মাণ দীপ্ত দিবালোকে ?
আপনার ক্ষীণতায় সে-আশা কি সম্ভ্রমে লজ্জিত
সূর্য্যের দাক্ষিণ্য হ'তে আপনারে লুকাইতে চায় ?

ক্ষীণ আশা ক্ষীণতর নক্ষত্রের কম্প্র আঁখিপাতে
ফুটেও ফুটে না যেন—তাই বুঝি আবেগে চঞ্চল
প্রতীক্ষা-কাতর চিত্ত
আর যেন সহিতে পারে না
তাই বুঝি খ'সে পড়ে সর্ব্বসহা পৃথিবীর বুকে ?

তোমরা শুনেছ রাতে
অগণিত তারায় তারায়
একটি প্রচ্ছন্ন সুর স্তব্ধতার সীমানা ছাড়ায়ে
কোথায় ভাসিয়া চলে ?
দিগন্তের দূরত্বের মোহ
অথবা বিশ্রামহীন নিরুদ্দেশ-যাত্রার আহ্বান

কে তারে বিহ্বল করে,
কে দেখায় মধুর স্বপন ?
নক্ষত্র-সভায় নাই আলোকের উদ্দাম জৌলুস
ধ্যান-মৌন আকাশের স্তরে-স্তরে উঠে না কম্পন
বাতাস নির্লিপ্ত সেথা
নির্ব্বিকার জ্যোতির্ম্ময়ী বাণী !
তবু আশা—ক্ষীণ আশা তারায়-তারায় কেন জ্বলে
জ্বলে আর নিবে যায় উপেক্ষিত দীপশিখা সম ?

দুর্লভ বিস্ময়

রাজলক্ষ্মী দেবী

কোনো-এক চাঁদে-ধোয়া রাতে যদি অকস্মাৎ আমারি কবিতা
তোমার অন্তরে দোলা দেয়—তবে, বন্ধু, বলো কম বিস্ময়ের কি তা ?
হয়তো তোমার চোখ, কোমল সুন্দর চোখ মমতায় হবে ছায়াময়,
আমার ছন্দের সুর উন্মন গুঞ্জনসম ভ'রে দেবে একটু সময় ।
হয়তো শুনিতে পাবে অবুঝ পরির দল করে কানাকানি,
শত জনমের আগে এই মেয়ে তোমারেই ভালোবেসেছিলো,
আমি জানি ।

তবু তুমি জানিবে না, কোনোদিন এই মেয়ে এই জনমেই
তোমারে বেসেছে ভালো, হৃদয় ভরেছে তার শুধু স্বপনেই ।
অনেক দূরের তুমি সেদিন অলীক ছিলে সে-মেয়ের কাছে,
তবুও তোমার গান, তোমার ছায়ার মায়া তার মন মুগ্ধ করিয়াছে ।
শঙ্কিত অক্ষরে তার উন্মুখ অন্তর যবে করেছে ইসারা,
তুমি খোঁজ রাখো নাই : ব্যর্থ হোলো সেদিনের সব কবিতারা ।
তারা তাই ঝ'রে গেলো ;—কোথায় হারালো ?—আজ
তাদের ঠিকানা গেছি ভুলে ।
তবুও তোমার মন আজকের কবিতায় ওঠে যদি একবারো দুলে,
সেই কি অনেক নয় ? সে-ই কি আশ্চর্য পাওয়া নয় ?
বলো দেখি আছে নাকি এ-জীবনে কোনোখানে এরও চেয়ে
দুর্লভ বিস্ময় !

অজাতশত্রু গান

নরেশ গুহ

কতো না ভেবেছি আমার এই যে সাধনার বীণাকাব্যে
এমন রাগিণী বাজাবো যে সারা বিশ্বের লোক ভাববে
হাটে যেতে কাজ ভুল ক'রে—
—মন
কাজ থাক। ওরে চুপ ক'রে ব'সে শোন, গান শোন।
কেউ দেবে হাসি, চোখের ছু ফোঁটা জল দেবে কেউ।
পার হ'য়ে যাবো সময়ের ঢেউ।
—শিশুর চোখের লাল পরি নীল পরি
আমার গানের ফাঁদ পেতে যেন ধরি।
আমার গানের ঘাসে
ছুখানি তপ্ত কোমল চরণ বার-বার যেন আসে।

রাত্রিশেষের আকাশের যতো তারা
জেগে ব'সে র'বে হেমন্তে শীতে নিঃঝুম ঘুমহারা।
মেঘ নেমে এসে ধুয়ে নিয়ে যাবে অজয়নদীর বালি।
ছুই তীর থেকে অন্ধ শ্রাবণ ছুই হাতে দেবে তালি।
সাতপুরুষের ভিটে মাটি ফেলে পার হ'য়ে যাবে চাষী
সন্ধ্যায় খেয়া। মুছবে চোখের কান্না, ঠোঁটের হাসি।
তবু আর-বার নবজাতকেরা এসে
সব জেনে-শুনে পড়শিকে তার কানে-কানে ক'বে—
কে সে?

আমার প্রিয়ার কালো ছুই চোখে—কখনো চিনি না যাকে—
—কাজল এঁকেছে কী ছুঃসাহস—ছুই শতাব্দী আগে।
কতো না ভেবেছি মৃত্যুর পরে হয়তো হব না তারা।
কিন্তু আরেক আকুল কামনা করেছে আত্মহারা
আমার প্রাণকে। করেছি শপথ ছুঃসহ হোক যতো
প্রাণধারণের কঠিন চাবুক, গ্রহতারকার মতো
মানুষের মনে হাসি-কান্নায় তবু যেন আমি থাকি।

আজ চেয়ে দেখি দেহে যৌবন বেশি আর নেই বাকি।
এখনো তো বুকে রক্তের ঢেউ উঠে
মূঢ় তরঙ্গে আকাশে-আকাশে ভেঙে পড়লো না লুটে?
গানে-গানে আজো জ্বললো না, জ্বললো না
কালো মেঘ ছুঁয়ে শুক্লচাঁদের কোণা?
অনায়াসে কবে মুখ ঢেকে কালো চুলে
হে স্বয়ম্বরা, তুমিও গিয়েছো ভুলে!

পথহারা পথে পৃথিবী এসেছে আশা নিয়ে ফিরে-ফিরে:
আমি কি চলেছি বিস্মরণের কৃষ্ণসাগর তীরে?
জলে নাম লিখে চ'লে যেতে হবে?
—আজো
আমার গানের বীণাকে বলছি, বাজো রে যন্ত্র বাজো
ভেঙে হও খান্‌খান্‌
দিয়ে যাও মোর অজাতশত্রু গান।

আমি যে ভেবেছি মৃত্যুকে দিয়ে মৃত্যুকে হবো পার।
কবিতা আমার, কবিতা আমার।

বার্তা

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

হে রাজকন্যা ! তোমার মদির কনক-কাঁকন
শুনেছি আমরা প্রাসাদ-পুরীর-উপবন-ছায়,
রূঢ় আলোর তলায় উঠলো কান্না তখন
আর হাহাকার দিগন্ত-ছোঁয়া উত্তাল বায় !
তেপান্তরের ঈশানে তখন জমেছিল মেঘ,
ছুটলো রাজার হাজার প্রহরী ঘোড়-সওয়ার,
উঠলো দারুণ দাউ-দাউ জ্বলা দীপ্ত আবেগ
অসির ফলকে ঝলসানো লাল আগুন-জোয়ার।

বিদেশী বণিক চতুর সাহসে একদা হঠাৎ
রাজার কাননে কমল-হীরের কনক-কেয়ূর
অনুপম যেথা, বাড়ালো সেথায় উদ্ধত হাত :
নবনী-কান্তা রাজকুমারীর স্বর্ণ-ময়ূর
মেললো দু'পাখা, সুদূরে উধাও হ'লো নীলনভে ;
এদিকে বৈশ্যকুমার ফিরছে আজো তার লোভে
দিক্‌বিদিকে।　　শূন্য কাননে গুঞ্জন যবে
শুনি, শুধু ভাবি প্রাসাদ-তনয়া কোথা কতদূর।

শাশ্বত নারী

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তোমায় আমি করব কি না ক্ষমা
　　সেই কথাটা ভাবছি মনে মনে,
দুইটি চোখে দুষ্টু হাসি জমা,
　　আভাস তারি দেখছি ঠোঁটের কোণে।
কাঁকন হাতে করছে কিনিকিনি
নূপুর পায়ে বাজছে রিনিঝিনি,
"হৃদয় নিয়ে খেলব ছিনিমিনি"
　　এই কথা কি বলছ, মনোরমা !
আভাস তারি ভাসছে ঠোঁটের কোণে,
　　দুইটি চোখে দুষ্টু হাসি জমা।

জানো নারি ! ওই যে দুটি হাতে
　　সেবা-কমল ফুটল ধীরে ধীরে,
সৌরভে তার কোন সে আদিম প্রাতে
　　মানব-শিশু বাঁচল মরু-তীরে।
মরুর পরে—জীবন-মরুর পরে—
স্নেহের ধারা ঢালছ দুটি করে,
তাইতে কুসুম ফুটছে থরে থরে
　　প্রাণের শাখী দুলছে সাথে-সাথে।
সেবা-কমল ফুটল কেন ধীরে
　　জানো নারি ! ওই যে দুটি হাতে !

জানো নারি! ওই যে দুটি আঁখে
কিশোর-কালে জ্বল্‌ল যে-দুই বাতি,
জীবন-নদীর আঁধার বাঁকে-বাঁকে
রশ্মি তাদের করল উজল রাতি।
জীবন-নদীর তরীর 'পরে-'পরে
রাখলে তোমার দৃষ্টি লীলাভরে,
তাইতে ছায়া রবির করে করে
ছন্দ তোলে বালুর বাঁকে-বাঁকে।
কিশোর-কালে যেমন যে দুই বাতি
জানো নারি! জ্বলল দুটি আঁখে!

জানো নারি! ওই যে হিয়াখানি
পূর্ণ ফোটা শুভ্র শতদলে,
কোন সে দিশা-উজল-করা বাণী
সৌরভে তার ছড়ায় পলে-পলে।
কোন সে আদিম কালের গুহা হ'তে,
মানব-শিশু ভাসল কালের স্রোতে,
জয়ের মালা গাঁথল হাজার ব্রতে
ঐ হিয়ারই সৌরভেরে টানি'।
পূর্ণ কেন শুভ্র শতদলে
জানো নারি! ওই যে হিয়াখানি!

করবো না গো করবো না তাই ক্ষমা—
এই কথাটি বলছি মনে-মনে,
দুইটি চোখে দুষ্টু হাসি জমা,
আভাস তারি দেখছি ঠোঁটের কোণে।

কাঁকন হাতে করছে কিনিকিনি
নূপুর পায়ে বাজছে রিনিঝিনি ;
হৃদয় নিয়ে খেলবে ছিনিমিনি,
এই কথা কি ভাবছ মনোরমা ?
তাই তো আমি বলছি মনে-মনে—
তোমায় আমি করবো না আর ক্ষমা।

'পরিস্থিতি'

কানাই সামন্ত

সিত গজদন্তের উচ্চ মিনার
চুমিছে নীলোজ্জ্বল গগন-কিনার,
সেখানে বাঁধবো বাসা হেন আশা নাই।

জনক বা পরাশর রোডে যদি পাই
পায়রা-খোপের মতো ঘর দেড়খানা
দ্বিতলে বা তিনতলে, বাক্স বিছানা
বেঁধে ছেঁদে, ট্যাক্সি বা ঘোড়াগাড়ি ডেকে
ধাই যে উপস্থিত আস্তানা থেকে
পড়ি আর মরি।
সিত গজদন্তের চূড়া, হরি হরি,
কোথাও পড়ে না চোখে যে দিকেই চাই!
আকাশে বাঁধবো বাসা হেন আশা নাই।

২

পায়রার খোপ মানে কপোত কপোতী
দুজনের কূজনের স্থান, সম্প্রতি
এমনটি না হলেও চলে।

পায়রার খোপ মানে দিশেহারা হলে
কৌচ আর কেদারার গোলক ধাঁধায়
হুঁচোট খেতেই হবে; কোনো সন্ধ্যায়
(খেটে খেটে দশ থেকে পাঁচটা অবধি)
আপিস-ফেরতা তুমি ক্ষেপে যাও যদি
ঘরে বা বারান্দায় দিতে পারো ছুট
জোর বিশ ফুট—

না হলেই বাস্তবে মস্তক ঠুকে
জ্ঞান হবে থেঁতলিয়ে নাসা ও চিবুক,
ঘোড়দৌড়ের মাঠ এটা নয় ঠিক
(আনাচে কানাচে পাছে আছে পাবলিক)—
মনে হবে, সুসভ্য গোটা ফ্ল্যাটখানা
কংক্রীট গাঁথুনির মানা একটানা।

৩

তা হোক। জানলা খুলে আকাশ আলোক
কখনো তো ঘরে ঢোকে। ছুটে যায় চোখ—
তেল-কল ঘেঁষে ঐ যেথা গুল্‌মোর
রক্তরাগের মদে বেহুঁশ বিভোর
পাপড়িতে ঢেকে দেয় রাস্তার ধুলো;
যেন বরযাত্রী রে দেবদারুগুলো
কচি সবুজের সাজে করে ঝল্‌মল্‌,
চূর্ণ আলোক লয়ে খেলে চঞ্চল।

এমন দিনেই যদি কাজে থাকে ছুটি,
সুরভি চায়ের সাথে মোরব্বা রুটি,
তাম্রকূটের কটু ধূম,
দিবসের এই পারে
চাইনে অন্য কারে,
চাইনে অন্য কোনো আকাশকুসুম।

৪

শনিবার বৈকালে আড্ডা ও গল্প—
দেদার চায়ের পাট, শর্করা অল্প।

নিরিবিলি রবিবার, হাঁপছাড়া স্বস্তি—
সচ্চিদানন্দের অন্তত 'অস্তি'
বোধে বোধ,
রোক্‌শোধ,
আর কিছু চাইনে।
সপ্তাহে একদিন বাধা যেন পাইনে
খেয়ে-দেয়ে ঘুম দিতে। বাড়ুক-না মাইনে
বৎসরে একবার। বেশী কিছু চাইনে।

ভৃত্য হয় গো যদি
রন্ধনে দ্রৌপদী
(বহুস্বামিত্বে নয় নয়)
(সকল-কর্মা যদি হয়)—
হিসেবের গর্‌মিল হয় হোক দৈবে,
অথবা নিত্য হোক, অক্লেশে সইবে ;
বাজার বজেট নিয়ে বিতর্ক চাইনে—
বৎসরে একবার বাড়ে যদি মাইনে,
জমা ও খরচ মেলে বাঁয়ে আর ডাইনে।

৫

সিত গজদন্তের উচ্চ মিনার
কোথায় উঠেছে ফুঁড়ে গগন-কিনার,
সেখানে বাঁধবো বাসা হেন আশা নাই।

স্থূল দুঃখের কথা শুনবে কি, ভাই—
ভোজন তো যথাতথা, শয়ন তো হাটে,
নানান গণ্ডগোলে দিনগুলো কাটে—
পরাশর রোডে যদি বাসাটি না পাই
মরণে গঙ্গাতীরে শান্তি কি, ছাই,
মিলবে ভাগ্য জানে, জানেন ধাতাই—
তাইরে নাইরে তারে নাই।

আলোচনা

'কবিতা' সম্পাদক সমীপে—

আশ্বিনের 'কবিতা'য় সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পড়লাম। প'ড়ে আশ্বস্ত হ'লাম না। যে কথাগুলো বলেছেন, ভেবেছিলাম চক্রান্ত এমন নিশ্ছিদ্র হয়েছে, যে কথাগুলো বেরুবার পথ পাবে না। আশা করুন, আপনার কথাগুলো বেরুবার ছিদ্রপথ বুজিয়ে ফেলতে রাজনৈতিক মিস্ত্রীরা রিইনফোর্সড্ কংক্রীট নিয়ে ছুটে আসবে।

কবিতার স্বাধিকার আন্দোলন আপনাদের 'কবিতা' পত্রিকায় সুরু। গাড়ীকে আপনারা জুড়তে গিয়েছিলেন ঘোড়ার পিছনে, লেখনীর পিছে রাখতে চেয়েছিলেন হাতকে। চেয়ে দেখছেন ঘোড়া পেছ-পা দৌড় কসরৎ করছে, হাত চেপে ধরেছে কলমের নির্ঝর।

ব্যাপারটা আমরাও লক্ষ্য কচ্ছিলাম। বেশ খানিকটা অতীত থেকে বাংলা সাহিত্যের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে অনুসরণ ক'রে ভেবেছিলাম, যা ঘটছে তা অনিবার্য্য :—পৌরুষে এখন আর সে জৌলুস নেই যে নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাবে।

এখন বাংলা সাহিত্যে যা ঘটছে, মনে আছে আপনারা তার সূচনা ক'রে দেন। আপনারা এলেন :—মনে এবং দেহে এবং গেহে, আপনারা যে রবীন্দ্রনাথ নন, জানতেন, এবং সে কথাটা আপনাদের লেখা কবিতায় এতোই বারবার ঘোষণা করলেন আমাদের ভয় হ'ল বুঝি বা রবীন্দ্রনাথ আপনারা নন, এ যুক্তি কবিতার নতুন জাত তৈরি করতে আপনারা প্রয়োগ করবেন।

আরও পনের বছর পরে—আপনাদের উদ্ভব মোটামুটি ত্রিশ সালে ধ'রে নিই—সেই আপনারা এরা আর ওরা এবং আরো অনেকের চাপে প'ড়ে 'ত্রাহি' ডাক ছাড়ছেন, এবং সেজন্য আমি দুঃখিত হতাম না একটুও, যদি না আপনার ত্রাহির মধ্যে বাংলা কাব্যসরস্বতীর আবেদন চোখে পড়ত।

ঢুকেছে বেকাররা, ঢুকেছে রাজনৈতিক দল,—কাব্যের কারখানা বসেছে, মালিক সম্পাদক—দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, এবং নিপীড়িত চাষী মজুর—সেন্টিমেন্টের কাঁচা মাল সরবরাহের কন্‌ট্রাক্ট নিয়েছে এরা,—ব্যস, রাশি রাশি ভারা ভারা-কবিতা উৎপন্ন হচ্ছে—

এবং আপনি 'কবিতা'র পৃষ্ঠায় বলছেন, গগনে গরজে মেঘ নাহি ভরসা'—

দেখে শুনে আমার কী আনন্দই যে হচ্ছে!

৬

কবিতার মর্য্যাদা দিতে গিয়ে এখন কবিতার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সদিচ্ছার এমন মহতী বিফলতা! যার ফলে কাব্যের স্বাধিকার-আন্দোলনের নায়ক আপনারা সংগ্রামের ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করে আজ বলতে বাধ্য হচ্ছেন, বাজিয়ে যাব বারবার, বাজিয়ে যাব বরাবর—

এবং এই এক-তারা হাতে বাউল মূর্ত্তিতে আপনার রূপান্তর আপনার বর্ম্ম এবং ক্ষতচিহ্নকে যথাক্রমে উত্তরীয় এবং চন্দনচিহ্নে পরিণত করেছে।

কাব্যসাধনার এই আশ্রমমুখিতা রাজনীতিক্ষেত্রেও দেখেছি। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের সাধকরা অনেকেই এখন আশ্রমবাসী। কংগ্রেসের মঞ্চের প্রবেশ নিষ্ক্রমণের দুই দুয়ারই খোলা:—স্বাধিকার সংজ্ঞার রূপবদলের সঙ্গে সংগ্রামের জাত-বদল—সৈনিকদেরও গুণ ও সংখ্যা বদল।

ফিরে তাকান আরেকবার রবীন্দ্রনাথের দিকে। কবি কাব্য মিলে যে জ্যোতির্মণ্ডল, উনিশশো ত্রিশে আপনাদের বিদ্রোহ কি এই মণ্ডলকে আরও উজ্জ্বল করে তোলার জন্য? নিশ্চয়ই নয়! সে চেষ্টার কল্পনাও বাতুলতা।

রবীন্দ্রকাব্য নিহিত বিরোধী শক্তি কী, যা আপনাদের জীবনে লেখনীতে এসে ভর করেছিল?—যে শক্তি, আপনারা জানেন, রবীন্দ্রকাব্যজগতের শোধন সম্মার্জ্জন বা পরিপূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়নি—যা রবীন্দ্রকাব্য প্রেরণারই অন্তরঙ্গ অভিন্নতা থেকে ক্রমবিকাশের নির্দ্দিষ্ট কালে এসে লেখনী দিয়েছিল আপনাদের হাতে, প্রকাশ খুঁজেছিল মর্য্যাদায় রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনেক লঘু আপনাদের মত একদল যুবকের জীবনে।

সে শক্তিকে আপনারা ব্যাখ্যা করেন নি। খ্যাতির সু এবং কু ঘিরে ধরল আপনাদের:—রবীন্দ্রকাব্যের বিরোধী শক্তিকে কেউ অভিনন্দন জানাল না, সে অভিনন্দন লুফে নিলেন আপনারা:—সমাজের সে-শক্তিকে উপোসী রেখে মধুর এবং অম্ল তিক্ত সকল প্রকার ভোজ্য উদরসাৎ হ'ল আপনাদের।

তখনই জানতাম বিপদ আসছে এবং আসবে।

উত্তরাধিকার, যোগ্যতা, কৃতিত্ব, সফলতা, যেটা দিয়েই বিচার করুন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা হয় না আপনাদের, তবুও বাংলা সাহিত্যে আপনারা এলেন—মনে করেন কি সে-কৃতিত্ব আপনাদের, মনে করেন কি বাঙালী পাঠক আপনাদের সহ্য করেছে, কাব্যভোজ্যের চাটনি আপনাদের লেখায় মিলেছে ব'লে?

না,—বাঙালীর সামাজিক সংস্থিতি ক্রমবিকাশের সন্ধিক্ষণে অন্তর্নিহিত যে-বিরোধের ফলে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, আপনাদের জীবনে চেতনায় এবং লেখনীতে স-বিরোধের ঘোষণা দেখে।

এখানে কোনো মোহ থাকলে চলবে না। কাব্য হ'লেও তার ইতিহাস আছে, এবং ইতিহাসমাত্রেই নির্ম্মম। অগণিত ব্যক্তির জীবন দিয়ে গড়া বলেই ইতিহাস নৈর্ব্যক্তিক।

ইতিহাসের সেই দৃঢ় নির্ভরের উপর আপনারা নিজেরা দাঁড়াননি, দাঁড় করাতে পারেননি আপনাদের কবিতাকে, কাব্যশিল্পের সাধনাকে।

ব্যক্তির বিদ্রোহ, ব্যক্তিলেখনীর বৈশিষ্ট্য আরও গালভরা কথা প্রতিভা ইত্যাদি দ্বারা আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করেছেন এক যুগ থেকে অন্য যুগে চ'লে যাওয়ার কৃতিত্ব। কাব্যের ইতিহাস রয়েছে অতর্পিত।

সেই যুগবদল—যেটা রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে আপনাদের কয়েকজনের হাতে হাতবদল নামক একটা ঘরানা ব্যাপার ব'লে আপনারা ভুল করেছিলেন, আজ তার বিকাশশীল প্রাণবেদনার ঊর্দ্ধ উৎক্ষেপে যখন শ্মশানের ছাই ছড়িয়ে দিচ্ছে ঝংলার আকাশে বাতাসে, যখন emotion intellectionয়ের দুই কোটি বাঁকিয়ে ধ'রে বাংলার প্রাণের ছিলার কাব্যটঙ্কার স্তব্ধ হ'য়ে গেল, যেহেতু রাষ্ট্রিক আর্থিক উপপ্লব ছিন্ন করে দিয়েছে সেই সুচিররোপিত জ্যা, তখন একদা বিদ্রোহী আপনি বলছেন, 'বাজিয়ে যাব বারবার, বাজিয়ে যাব বরাবর,' এতে—আপনি বলুন, আমার মত পাঠকের চিত্তে কী রকম আবেগদ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে!

রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখনী নাড়িয়ে দেওয়া হরধনুভঙ্গের মতই ব্যাপার। অহল্যাকে সে উর্ব্বরা করবে, সমুদ্রে সেতু বাঁধবে—নির্ব্বাসন যুদ্ধ রক্তপাতের মধ্য দিয়ে তার পথ।

বাংলাদেশে সেই যুদ্ধ রক্তপাতের লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর সামাজিক অস্তিত্ব, তার পরবর্ত্তী উৎক্রমণের সঙ্কটস্থানে এসে রাষ্ট্রিক আর্থিক সংঘাতে চৌচির হ'য়ে ফেটে যাচ্ছে।

লেখনীর মুখে মুখে জীবনচেতনা রক্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে: শিক্ষিত বাঙালীর intellect এক বৃহত্তর জীবনাধিকারের যুক্তি-সমর্থন খুঁজে পেয়ে চেষ্টা করছে তার emotionয়ের সঙ্গে মেলাতে। কাব্যে জেগেছে যুগপ্রসবিনী ব্যথা।

এহেন অবস্থায়, রবীন্দ্রযুগের বিরোধীশক্তিধর আপনার লেখনী, আপনার জীবন—যেন এক আশ্রমবাসিক পর্ব্বাধ্যায় রচনা না করে। সে হবে আপনার অস্তিত্বের সব চেয়ে বড় যুক্তির বিরুদ্ধে সব চেয়ে অকাট্য প্রতিবাদ!

সুধাংশু চৌধুরী

সমালোচনা

চিত্রোৎপলা : আড়াই টাকা।
গীতমঞ্জরী : এক টাকা।
কানাই সামন্ত
সাহিত্যিকা, কলকাতা

শান্ত বৃষ্টির ধারার মতো চিত্রোৎপলার কবিতাগুলি। শেষ পর্যন্ত এলাম, কোথাও দুরারোহ চড়াই, পার হ'তে হল না। তেমন কবিতা চিত্রোৎপলায় নেই যা বিদ্যুতের মত মনকে আঘাত করে, কি চকিত দিগন্তের নূতন বাতায়নের বিস্ময় উন্মোচিত করে। কবিতার ভাষা ব'লে আলাদা কোনো ভাষা যদি থেকে থাকে, তাও নেই। এখানে স্তবকে স্তবকে স্বচ্ছন্দ ভাষায় যে-শান্ত আত্মসম্পূর্ণ সুর বেজেছে, সে-সুর শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশের। প্রয়াসটা এতই সামান্য যে কবিতাগুলিকে প্রাত্যহিক স্মরণোক্তি বলেই মনে হতে পারে। তার মধ্যে চায়ের দোকানের যোগীন, বিভূতিভূষণের গল্পগ্রন্থ, কণ্টকারী, বন নটে, মুক্তোবর্ষীর পাতা, ফুল ফল, চার ছেলের মা, গুরুমশায়, চীন-জাপানের যুদ্ধ সকলেরই স্থান হয়েছে। আর সব ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে বিশ্বপ্রকৃতির অক্ষুণ্ণ দাক্ষিণ্যের আনন্দবেদনাবিদ্ধ বিষণ্ণ একটি কবি-মন। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের আভা পড়েছে চিত্রোৎপলায়, তবু কবিকে স্পষ্টই চেনা যায়।

শান্তিনিকেতনের প্রসন্ন প্রকৃতির আতিথ্যে এতদিনের মধ্যে যে দু'একজন ছাড়া আর কবি হলেন না এটা একটু বিস্ময়কর লাগে। কানাইবাবুর এই গদ্য-কবিতাগুলিতে তবু শান্তিনিকেতনের সেই সুর-রসায়ন বিধৃত হ'য়ে থাকলো। কবিতা যাঁরা ভালোবাসেন এবং কবিতায় কবিত্ব যাঁদের কাছে লজ্জাজনক নয় চিত্রোৎপলা তাঁদের ভালো লাগবেই। রচনার প্রায় আট-দশ বছর পরে কবিতাগুলি প্রকাশিত হ'ল। কানাইবাবু কি ইতিমধ্যে আর-কিছু লেখেননি? 'স্বপ্নভাবুক' এবং 'কবি'র গদ্যভূমিকার বাধাটা অপসারণ করাই ভালো মনে হয়।

গীতমঞ্জরী গান। সুরে না শুনলে গানের অঙ্গহানি হয় (অবশ্য রবীন্দ্র-সংগীতের হয় না)। তবে অন্যান্য কবিতার মতো এই গানগুলিও প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় আলোকিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে, সম্পূর্ণ নূতন গান রচনা যে কী দুরূহ গীতমঞ্জরীই তার প্রমাণ। দুখানি গ্রন্থেরই প্রচ্ছদপট এঁকেছেন নন্দলাল।

আমরা বাঙালী : দুই টাকা।
পথের বাঁশী : এক টাকা চার আনা।
কাজী আকরম হোসেন
ইতিকথা বুক ডিপো, কলকাতা

কাজী আকরম হোসেন সাহেবের অনেক রচনার মধ্যে আমাদের অধুনা-পরিচিত আধুনিক পল্লীকবির একটি বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস আছে। বাংলার ভাঙন-ধরা পল্লীর জন্মদুঃখী সমাজ, বিশেষত মুসলমান সমাজের জীবন কাজী সাহেবের মনকে যেভাবে স্পর্শ করেছে, সরল ভাবে ছন্দে গেঁথে তাই তিনি বলতে চেষ্টা করেছেন। সুকুমার একটি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের রচনার প্রতি যথাযোগ্য নির্মম হ'তে না-পারলে কোনো কবিই নিজের প্রতিও সুবিচার করতে পারেন না। দীর্ঘপয়ার ছন্দে রচিত 'গোরস্থান', আর 'নদী', এবং আর দু'একটা রচনা ছাড়া এ বইয়ের একটিও কি প্রকাশযোগ্য? দীর্ঘশ্বাস, সমবেদনা এবং কবিপ্রাণ থাকলেও রচনা যে সব সময় কবিতা হয় না, এমনকি পাঠযোগ্য পদ্যও হয় না—কাজী সাহেব তার একটি উদাহরণ স্থাপন করলেন। মলাটের ছবিটাই বা কেন? মাড়োয়ারির ভুঁড়ি দিয়ে কবিতার প্রচ্ছদ প্রসাধন—এও কি সহ্য হয়?

পথের বাঁশীর কবিতাগুলি হৃষীকেশ, লক্ষ্ণৌ, জার্মানী, ইতালী ইত্যাদি নানা স্থানকে উদ্দেশ ক'রে occasional কবিতা। আমার তো মনে হয় পাঠযোগ্য occasional কবিতার চেয়ে প্রশংসনীয় লিরিক রচনা করাও সহজ।

> …'ঘোড়াদীঘি' নামে দীঘি অদূরেতে রাজে,
> কোন ঘোড়া কেন তারে কোন সে অতীতে
> দিয়েছিল নাম হেন কেহ নাহি জানে।…

ছাপার অক্ষরে এ ধরনের রচনা তিনি কী ক'রে প্রকাশ করতে পারলেন? প্রামাণ্য একটি কাব্যের আদর্শ কি বাংলায় এতদিনেও গ'ড়ে ওঠেনি?

যৌবনোত্তর : আট আনা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

কখনো বলতে ইচ্ছে হয়—যৌবনকে ঘিরেই জীবনের আবর্তন, কবিতার আবর্তন। যৌবনের জানালায় বসার জন্য শৈশবের কী আকুল আকুতি! সেই জানালা ছেড়ে উঠে এসে প্রৌঢ়ের কী অতৃপ্ত বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস! বার্ধক্যেই জীবনের পূর্ণতা বলে যাঁরা গৌরব করেন তাঁরাও কি আর কথাটা না জানেন!

অথচ 'সময়ের অক্লান্ত নিয়মে', যৌবন একদিন ইতিহাস হ'তে বাধ্য। দেহ-মনের যে-রোদের আঁচে একদিন দুহাত গরম করা গিয়েছিল, আজ সেই

রোদ প্রাকৃতিক সূর্যালোকেও বুঝি আর নেই। যৌবনবেদনারসে উচ্ছল এই দিনগুলি সকল কবির কাব্যেই হাহাকার করছে—সেই সকল কবির, যৌবন পার হওয়ায় ভাগ্য যাদের হয়েছে, এবং তারপরেও যাঁরা কবিতা লিখেছেন। কাব্য যদি জীবনের মন্তব্য হয় তাহ'লে জীবনের এই নির্ধারিত বেদনার মতো কাব্যবস্তু তো আর নেই; সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের নূতন কবিতাগ্রন্থ 'যৌবনোত্তর' উত্তরজীবনের সেই দীর্ঘশ্বাস। ছোট্ট বই, আটটি কবিতা, এক স্বরে গাঁথা।

সঞ্জয়বাবুর কবিতা আমার ক্রমেই ভালো লাগছে। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে তাঁর বিষণ্ণ মধুর সুরটি দিনে-দিনে যথাযথ রূপকল্প খুঁজে পাচ্ছে, প্রতীকী ভাষার দুরূহতাও অনেকটা দূর হয়েছে।

কিন্তু তাও বলি, ঈষৎ দীর্ঘ হলেই কেমন যেন প্রবাহের অবিরলতা ছিন্ন হ'য়ে যায়, দীর্ঘস্থায়ী তৃপ্তির পক্ষে সেটা তো একটা বাধাই। এই আধুনিক অভিশাপ সঞ্জয়বাবুও উত্তীর্ণ হ'তে পারেননি। অথচ এই ছোট কবিতাটি কী সুন্দর:

রাত্রিকে কোনোদিন মনে হতো সমুদ্রের মতো;
আজ সেই রাত্রি নেই।
হয়তো এখনো কারো হৃদয়ের কাছে আছে সে রাত্রির মানে;
আমার সে-মন নেই
যে-মন সমুদ্র হ'তে জানে।

একবার ঝ'রে গেলে মন
সেই ঝরাফুল আর কুড়োবার নেই অবসর;
তখন প্রখর সূর্য্য জীবনের মুখের উপর—
তখন রাত্রির ছায়া জীবনের স্নায়ুর উপর—
জীবন তখন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক জীবন।

নরেশ গুহ

সম্পাদক ও প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন: ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯
১৮ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট দি ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ডারি এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ থেকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে, বি. এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতা

দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা] আষাঢ়, ১৩৫৪ [ক্রমিক সংখ্যা ৫৪

তারা-চাষের স্বপ্ন

অশোকবিজয় রাহা

স্বপ্ন দেখি
ধবধবে জ্যোৎস্নারাতে সাদা দুই বলিষ্ঠ বলদ
চাষ করে শূন্য মাঠ।
কে যেন হঠাৎ এসে বলে—
'এখানে তারার চাষ হবে,'
তারপর ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় মন্ত্র প'ড়ে যায়,
দু'হাতে ছিটায়
মুঠো-মুঠো পাথরের কুচি।

হঠাৎ একটা কুচি গায়ে এসে পড়ে
ঘুম ভেঙে যায়।
দুই চোখে গাঢ় অন্ধকার,
হাসপাতালের ঘড়ি ঢংঢং বাজে
রাত দুটো!

ধড়ফড় উঠে বসি,
এক-গা ঘেমেছি—
অবু ক্ষেরে নি কি?

টর্চ খুঁজি—এ কী!
বালব্‌-টা ফিউজড?
দেশলাই?—সেও খালি?
মশারিটা আলগোছে তুলে
বেরোই সুড়ুৎ ক'রে—
ভন ক'রে ডেকে ওঠে নাকে-মুখে এক-ঘর মশা!

মিনিট খানেক
কাঠের প্যাকিং বাক্সে মাথা ঠুকে-ঠুকে
দরজাটা খুঁজি,
একগাদা চুনবালি ঠেলে
ঘর থেকে যেমনি বেরোই
অমনি পায়ের নিচ থেকে
কিচকিচ ছুটে যায় ছোটো এক ছিঁচকে ইঁদুর।

ঘুটঘুটে অন্ধকার,
কালো এক চামচিকে কপালে খামচি কেটে যায়,
চোখ পড়ে দূরে—
ওখানে মাঠের পারে দপদপ জ্বলে
মস্ত এক আগুনের ফুল—
চিতা ওটা!

কার চিতা?
ঝাঁকড়া বটের নিচ থেকে
আবছায়া অন্ধকারে কুচকুচে কুকুরের মতো
কী-একটা উঠে আসে গুটি মেরে কুটকুট ক'রে,
হাঁক দিই—'হেঁই!—'

অমনি আওয়াজ আসে চিঁ-চিঁ নাকি সুরে—
'মুই বাবুদাদা!'

'কে রে? দুখু?'
দুখুই তো!
ভজুয়া মুচির ছোটো ছেলে
থাকে ঐ খালের কিনারে
নেংটি প'রে ঘোরে সারাদিন
কাঠি-কাঠি হাত-পা—পেটে মস্ত পিলে
হ্যাংলা কুকুরের মতো সারাদিন খাই-খাই করে!'

দুখু এত রাতে?
'কী রে দুখু? এত রাতে তুই?'
দুখু কেঁদে ফেলে:
'বাপ ম'রে গেছে, বাবুদাদা!'
'ম'রে গেছে?—কখন রে?'
দুই হাতে চোখ মোছে দুখু:
'এখুনি মরেছে, বাবুদাদা,
দিন ভর তাপ ছিল—'
'দিন ভর তাপ ছিল?—তোরা কোথা ছিলি?
তোর ভাই ভিখু কোথা?'
ডুকরিয়ে কেঁদে ওঠে দুখু:
'ভিখু ম'রে যাবে, বাবুদাদা,
মা কাঁদছে—'
ওরও জ্বর নাকি?
মুচি-পাড়া ধরেছে তা হ'লে!
রক্ষে নেই—কেউ বাঁচবে না!

'চল দুখু, যাই চল !'
অন্ধকারে ঘরে ঢুকে এটা-ওটা হাতড়িয়ে ফিরি,
একটু পরেই
জামা কাঁধে ব্যাগ হাতে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ি পথে।

ভজুয়ার ঘর থেকে বের হ'য়ে সোজাসুজি ছুটি
বামুন-পাড়ার দিকে।
ওদিকের খবর জানি নে,
অবুটারও খোঁজ নিতে হয়,
হতভাগা !
নাকে-মুখে ছাই-পাঁশ গুঁজে
সেই বেলা দশটায় বেরিয়েছে সাইকেল নিয়ে
ফেরবার নাম নেই !
হয়তো থেকেই গেছে সোনারামপুরে !
এত-যে বারণ করি পই-পই ক'রে
থাকবি নে কোনোখানে—ক্যাম্পেই ফিরে আসা চাই,
একবারো যদি শোনে !
মাসের তিরিশ দিন এই !

ছুটে চলি হনহন ক'রে,
বুকের ভিতরটাতে এইবার ধ্বক ক'রে ওঠে,
রাতের বাতাস চিরে কাঁদে দূরে ভজুয়ার বৌ !
ছেলেটা কি ম'রে গেলো ?
মরবে তা জানি,
ঘিনুকে এসেছি রেখে—
কী করবে ঘিনু ?

ভজুয়া মরেছে,
ভিখুটাও গেলো,
দুখুটারও এমনি যা হাল !
সর্বনেশে আগুন লেগেছে
যাবে—যাবে—সব যাবে—
ঘিনু—চানু—সবার ঘরেই
ছড়াবে আগুন !
স্পষ্ট দেখি চোখে
মুচি-পাড়া দু'দিনে উজাড় !
জেলে-পাড়া, তাঁতি-পাড়া কবে ছারখার—
ক'জন বেঁচেছে ?

এতদিন তবু বীরু ছিল।
দিনরাত ঝড়ের মতন
কী অদ্ভুত খেটেছে ছেলেটা !
ক্লাসের সবাই ওকে 'ভীম' বলে খেপিয়েছি কত,—
মিথ্যে নয় !
তবু কী হয়েছে ?
খাওয়া নেই, ঘুম নেই,—অনিয়ম কত আর সয় ?
শেষটা তো জোর ক'রে পাঠাতেই হ'লো
কলকাতায়,
হীরেন—সেও তো কবে দেশে চ'লে গেছে,
ভালোই হয়েছে,
এতদিনে কী হ'তো কে জানে !

আছি শুধু অবু আর আমি !

বাঁক ঘুরে আবার সে-মাঠ—
চোখে পড়ে এইবার আরো দুটো চিতা
আরো দুটো মৃত্যুর মশাল!
অদ্ভুত স্বপ্নটা মনে আসে:
ধবধবে সাদা রাত—ধূ ধূ ফাঁকা মাঠ,
সাদা দুই প্রকাণ্ড বলদ
শক্ত মাঠে ঢেলা ভেঙে যায়—
'এখানে তারার চাষ হবে!'

হঠাৎ চমকে উঠি—মাথার ওপরে
একজোড়া পেঁচার চীৎকারে।
ওদিকে মাঠের পারে বাঁকের কিনারে
কারা আসে?
গুনগুন কথা শোনা যায়।
গলা ছেড়ে হাঁক দিই—'কে হে!—
কারা যায়?—'
'আমরা হে—'
মোটা এক হেঁড়ে গলা হাঁকে,
'আসছি পিরিজপুর থেকে
হাসপাতাল যাই।'
থমকে দাঁড়াই
ওরা কাছে আসে,
দেখেই চিনতে পারি, হিরু-মোড়লের বড়ো ছেলে,
সঙ্গে জনাবালি।

'কী খবর জনাবালি? কী খবর হিরু?'
'এই যে!—সালাম ভাই সা'ব,
ভালো হ'লো, পথেই পেলাম!

আগে চলো দেখি!'
'কী খবর জনাবালি? তোমাদের গাঁয়ে—'
'আগে চলো ভাই সা'ব, পরে কথা হবে।'

সব কথা শেষ হয় এক কথাতেই,
পা দুটো হঠাৎ থেমে যায়,
হাতেমপুরের পথে অবিনাশ জ্বরে মূর্ছা গেছে,
হিরু-মোড়লের ঘরে আলিশেখ এনেছে অবুকে—
একেবারে জ্ঞান নেই!

ঝাড়া এক ক্রোশ পথ কী ক'রে এসেছি
কিছু মনে নেই।
শুধু মনে পড়ে
হিরু-মোড়লের ঘরে মিটমিট কেরোসিন-ডিবে,
ভাঙা তক্তাপোশটাতে প'ড়ে আছে সংজ্ঞাহীন অবু,
গায়ে খৈ ফোটে,
মুখে বিড়বিড়
মাথায় জলের ধারা চলে।
নাড়ি ধ'রে ঠায় ব'সে আছি
অবুর প্রলাপ বেড়ে চলে—
'জেলে-বৌ, কিচ্ছু ভেবো না—
ছেলে ভালো হবে—
ভালো ভালো ভালো—
আমিনা মরেছে?—
হিরণটা বেজায় ফাজিল—
মা-কে জিভ কাটে—
মা-কে—ঐ যাঃ—'

অবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে যাই :
'ও অবু, ভ্যাখ্ না !
চেয়ে ভ্যাখ,—আমি সিধু !—'
অবু হেসে ওঠে :
'হিহি হিহি হিহি !
কাঠবিড়ালির লেজ ওটা !
বিড়ালকে ভয় ?
চল চল চল !—'

শেষরাতে সব শেষ হয়।
অবু চ'লে গেলো।

যাবার একটু আগে একবার ডেকেছিল অবু
একটু জড়তা নেই মুখে,
স্পষ্ট স্বাভাবিক কণ্ঠে দ্রুত ব'লে গেলো—
'সিধু, সিধু,—চল চল—
ঢের কাজ বাকি—'

'ঢের কাজ বাকি !'
ঢের কাজ বাকি অবু, জানি !
কী বলব তবু তোর মা-কে,
কী বলব অবু ?

মনে পড়ে মিহিজাম—অবুদের বাড়ি—
এই তো সেদিন
দু'জনে বেড়াতে গেছি দু'মাস আগেই,

দিন ছয়-সাত
কাটিয়েছি হৈ হৈ ক'রে,
সকাল-বিকাল
ছবির ক্যামেরা নিয়ে ঘোরা,
চারদিক ঘুরে-ঘুরে দেখা,
যখনি ফিরেছি
সব ক'টি ভাই-বোন ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে ঘিরে
ছোটো বাড়িটাতে
প'ড়ে গেছে উৎসবের ধুম,
অবুর মায়ের মুখে দিনরাত হাসি লেগে আছে !

*

গিরিজপুরের মাঠে রাত ভোর হয়।
গোরুর গাড়িতে ক'রে জনাবালি কাঠ ব'য়ে আনে
চিতা রচে হিরু-মোড়লেরা,
কিছু দূরে খালি-গায়ে অস্থিসার কয়টি মানুষ,
ছোটো এক ভিড়।

শূন্য চোখে চাই
বুকের পাঁজরগুলো মনে হ'লো ফাঁপা হ'য়ে গেছে,
এত বড়ো মিথ্যা কথা কী ক'রে বিশ্বাস করি আজ
—অবু নেই !
জ্ব'লে ওঠে দাউ-দাউ চিতা,
লাল সূর্য্য মেঘ চিরে উঠেছে আকাশে
কাঁকুড়-খেতের মরা মাটি
জ্ব'লে ওঠে জ্বলজ্বল ক'রে,
সমস্ত মাঠের বুকে বুক-ফাটা এ কী লাল হাসি ?

২

অবুর দেহের চিহ্ন মুছে নিয়ে নিভে যায় চিতা।
গাঁয়ের সবার কাছে শ্মশানেই নিয়েছি বিদায়,
ছিরু আর জনাবালি সঙ্গে যেতে চায়,
মানা করি—'থাক ভাই থাক,
কাল নয় যেয়ো একবার
ক্যাম্পেই যেয়ো।'

পথ চলি সঙ্গীহীন একা,
হু-হু ক'রে কেঁদে ওঠে মন
সারা বুকে চেপেছে পাথর
—অবু নেই!
একা-একা কতদিন আর?

হঠাৎ কানের কাছে স্পষ্ট শুনি ডেকে গেলো অবু—
'সিধু, সিধু, চল চল!—'
একবার চমকে তাকাই
পিছু ফিরে চাই,
কেউ নেই—সব ফাঁকা—
পিরিজপুরের মাঠ বহু দূরে খাঁ-খাঁ করে রোদে।

আবার এগিয়ে চলি,
পথের দু'ধারে
শুয়ে আছে নির্বিকার মাঠ
উঁচু-নিচু পোড়ো জমিগুলি
শূন্যে চেয়ে আছে।

হঠাৎ চমক ভাঙে
সামনেই বাঁধ—
রাশি-রাশি সাদা বালি হাসে
দুই দিকে লম্বা হ'য়ে আছে
সর্বগ্রাসী চড়া!

চারিদিকে অদ্ভুত স্তব্ধতা,
তারি মাঝখানে
কোথা থেকে শুনি এক ক্ষীণ কণ্ঠ আসে,
চোখ পড়ে দূরে
চিকচিক বালির ওপরে
ছোট এক কালো ছায়া নড়ে,
মনে হয় এই দিকে আসে,
সেই সঙ্গে ডাক শোনা যায়—
'বাবু দাদা—!'

ও কে? দুখু?
থমকে দাঁড়াই,
হঠাৎ অদ্ভুত মনে হয়,
চারিদিকে মৃত্যুর স্তব্ধতা
তারি মাঝখানে
শিশুকণ্ঠে প্রাণের স্পন্দন!

দুখু ছুটে আসে—
সেও আজ মৃত্যুকে চিনেছে,
কী করুণ কান্না ফোটে ওর দুটি অসহায় চোখে!

দুই চোখ জ্বালা করে—শক্ত হ'য়ে দাঁতে দাঁত চাপি,
চারদিকে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ কাঁপে
সারা দেহ ঝিমঝিম করে।

মুহূর্ত্তে হঠাৎ
অদ্ভুত স্বপ্নটা মনে আসে :
ধবধবে সাদা রাত—ধূ-ধূ ফাঁকা মাঠ |
সাদা দুই প্রকাণ্ড বলদ
শূন্যমাঠে ঢেলা ভেঙে যায়—

'এখানে তারার চাষ হবে!'

কোনোদিন

মৃণালকান্তি দাশ

পাহাড়ের বুকে রাত্রির স্তব্ধ নীরবতা।
গাছপালা অন্ধকারে গাঢ় নিঝুম,
ঝিঁঝিঁর শব্দ;
আর মাঝে-মাঝে রাতচরা পাখীর ডাক।
চোখে ঘুম নেই!

একটানা অন্ধকারের ছন্দ
বিস্তীর্ণ চা-বাগানে,
একটি নীল তারা দপদপ করে জ্বলছে
ধূসর বনের মাথায়—
অনেক রাত ধরে,
অনেক রাত।

ঐ নীল তারার মত আমার নিঃসঙ্গতায়,
আমার স্তব্ধ অন্ধকারে
কোনোদিন—কোনোদিন কি হবে না
তোমার অপরূপ আবির্ভাব।

হে সুদূর

মৃণালকান্তি দাশ

যে নামে কেউ তোমাকে ডাকেনি
সেই নামে ডাকি,
যে রূপে কেউ তোমাকে দেখেনি
সেই রূপে দেখি।
তোমাকে ঘিরে অনাদি বিস্ময়!
তোমাকে ভালোবেসে ভালোবাসি
এই পৃথিবীকে
আর প্রাণে লাগে সুর।
হে সুদূর, আমার গান দিয়ে ছুঁতে চাই
তোমার মন,
তোমাকে ভালোবেসে এতো ছন্দ গান
আর স্বপ্নের বুনন।

নিরীক্ষা

বিরাম মুখোপাধ্যায়

জানি, নিখর্ব বৎসরের পরমায়ু এই পৃথিবীর,—
আর উদ্দাম নিরবধি সময়ের সমুদ্রে।
জবরদস্ত নাবিকের তরঙ্গ-টল্‌মল্ নেশায়
গর্জমান প্রলয়ের দুরন্ত প্রতিধ্বনি।
তবু দুর্ভেদ্য নয় কুণ্ডলিত কুয়াশা,—
মাঝে-মাঝে ধ্যানী-দৃষ্টির লাল সূর্য ওঠে
অনাবিষ্কৃত দ্বীপে।

*

আজ রাত্রি-নিবিড় আত্মার গহনে
ভ্রূকুটি-ভয়াল মৃত্যু-মলিন দুঃস্বপ্ন;
অস্তগিরির গর্ভে কি ডুবে যাবে
সভ্যতার কনক-কিরীট সকাল?
রক্তপিপাসু দানব-মত্ততা
সুধু কি সার সত্য?
হয়তো নিষ্কৃতির অমোঘ নির্দেশ আছে
সমুদ্র-শঙ্খের সংকেতে;
হয়তো বিপ্লবী-মনীষা বধির।

*

জানি, বিজ্ঞান দিয়েছে অকণ্টক বরমাল্য;
মহিমার সৌরভে
মানুষ আজ স্বয়ম্ভু বিধাতা।
রাজনীতির অক্ষক্রীড়া চলেছে কৌতুনে,
আর বিষকুণ্ডলীর জীবন-জ্যামিতি
বিজ্ঞানের বেনামিতে কীর্তির মহিমা-লোলুপ,—

সত্যের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে গগনস্পর্শী বাচালতা,
স্বয়ংসিদ্ধ যুগ-পৌরুষ,
নমস্যা চিত্রিণী নারীর নাভিপদ্মের অর্ঘ
কামকলার ষোড়শোপচারে বিফল,
বিরল তাই পুরুষোত্তম।

*

আজ উর্বর বুদ্ধির নিচে নবস্থষ্টির শিকড় ;
আর সে-শিকড়ের আমূল আঁধারে
নিঃশস্য বন্ধ্যত্ব বাড়ে।
তবুও নির্বোধ খুসির করতালি বাজে,—
আর স্থষ্টির এই ভাণ বুঝি-বা চরিতার্থ
পশ্চিম দিগন্তে যদি সূর্য ওঠে,
খররৌদ্র হয় চাঁদের দাক্ষিণ্য
আর অমাবস্যার চেয়ে কালো মাধবী পূর্ণিমা।
ব্যভিচারী বুদ্ধির কী অবিকার বাহবা!
পৃথিবী কি ফিরে যাবে সরীসৃপ-শৈশবে?
আবার জন্ম নেবে 'ডাইনোসর'?

*

আজ আতলস্বচ্ছ পাতালে অমরাবতীর সিঁড়ি ;
মত্ত ঐরাবত শেষসিদ্ধান্তে নামে।
রক্তগঙ্গা খরস্রোতা।
মৃত্যুর সঙ্গে নিষ্পরোয়া আয়ুর মোকাবিলায়
মহাকাল নিরপেক্ষ সালিশী।

*

জানি, অবসান হবে দুঃসহ প্রহসনের।
জানি, অভিচারী বিপ্লব ধ্রুবনিষ্ফল,—
শূন্যকুম্ভ শব্দায়মান
ঈথরের শূন্যে-শূন্যে।

*

নিখর্ব বৎসরের সহিষ্ণু পৃথিবী
তবুও প্রদক্ষিণ করে অনন্ত সূর্যকে।
আর কালের নির্বাক্ প্রতিহার
নিঃশব্দে খুলে ধরে যাদুঘরের সিংহদ্বার :
সভ্যতার কৃতঘ্ন সেনানী
এখানে পাষাণ-স্তব্ধ কপট মৃত্যুর শয়নে,—
সময়ের ধূলো লেগে
সঙিনের সংহার-তীক্ষ্ণতা অদৃশ্য ;
এখনো নিশ্চিহ্ন মোছেনি
কাপুরুষ ছুরির ফলার রক্ত
আর আধপোড়া প্রতিবেশীর
বেদনা-ফেনিল মুখের মিনতি
আর পাণ্ডুর শিলালিপিতে ধ্বংসের স্বাক্ষর।
জানি, এই সব অব্যয় সাক্ষ্য
বিক্ষতআত্মা অমৃত-অন্বেষীর।

*

আগামী কালের নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হাসে
বিবর্তন-ব্যাসকূটের নির্ভুল ব্যাখ্যানে।

তোমাদের গ্রাম

অরুণাচল বসু

তোমাদের গ্রামে গিয়েছিলাম,
পাশে গাং, তার অথৈ জল ;
কূল দিয়ে চলে সরষে ক্ষেত
হলুদ ফুলের তেপান্তর।
ফাঁকে বাঁশঝাড়ে মাটির তৃণে
বিঁধে আছে লাখো সবুজ তীর,
আড়ালে আকাশে মেঘের নীড়
ইন্দ্রধনুর পাখির রং।

তোমাদের গ্রামে গিয়েছিলাম,
গাঙে টুংটাং জলের স্বর,
রাত্রি-বিছানো ঝোপের ছায়ায়
সারা দিনমান ঘুম-নগর।
মাটির দেয়ালে, খড়ের চালে
শীর্ণ বুকের ছড়ায় শ্বাস,
হিংসা-পেঁচানো মনে-মনে ঝোলে
মোকদ্দমার মরণ-ফাঁস।

জোনাকি-আশার শিখা ঝিলমিল
নেভায় ক্ষুধার ঝড় দাপট,
তোমাদের গ্রামে অন্ধজীবন
ঠুলি-চোখে টানে প্রাণ-শকট।

তোমাদের গ্রামে গিয়েছিলাম,
পাশে গাং, মধু স্মৃতির ঢেউ,—
স্নেহ মায়া যার ছোঁয়া পেলাম,
কোনোখানে বুঝি পায়নি কেউ!

মায়াবী নিবিড় সেবিকা বাহু
প্রাণ-টলমল স্বার্থহীন ;
বুকের বাসায় ঘুম-পাড়া সুখ,
তোমাদের গ্রামে সে-ক'টি দিন।
তোমাদের গ্রামে গিয়েছিলাম,
পাশে গাং, কালো ঘুম-গভীর ;
তোমাদের গ্রামে রেখে এলাম
শ্রান্ত পাখির ক্ষণিক নীড়।

ত্রিধা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্ণাকে একদিন ঝর্নার পাশে
বল্লাম, 'শোনো দেখি কে কোথায় হাসে।'
বল্ল, 'ঝর্নার জলের আওয়াজ
নিয়ে বুঝি বাড়াবাড়ি করাই রেওয়াজ?'
···তখন পাহাড়ে ছায়া, আকাশে আলো—
হঠাৎ উঠলো ব'লে 'বেশ তো ভালো।···
চুপ ক'রে আছো কেন, কিছু বলো কথা।'
'বুঝবে না, বুঝবে না কোনখানে ব্যথা।'

ফের একদিন ওকে ঝর্নার পাশে
বল্লাম, 'বলো দিকি কে কোথায় হাসে?'
বল্ল, 'বুঝেছি গো, আমাদের মন।'
'আমাদের মন!'
সুখে হেসে উঠলাম আমরা দু'জন।

আরো একদিন আমি বললাম, 'স্বর্ণা, চেয়ে দেখো স্বর্ণা,
পাহাড়ের বুকে ঐ ঝাঁপ দেয় ঝর্না।'
আমার মুখের দিকে রইলো চেয়ে;
নামলো করুণ কালো দু চোখ ছেয়ে।
বল্ল, 'ক্লান্ত আজ লাগছে বড়ো।'
বল্লাম, 'ঝর্নার মতো ভেঙে পড়ো,
প্রেমের পাহাড় নিয়ে আমি আছি পাশে।'

ও তা শুনে হাসে,
চোখের চমক ঢেকে কালোর ছলে
আমাকে বলে,
'ঝর্নার মতো যদি উচ্ছল হই
পারবে কি হ'তে তুমি কঠিন পাষাণ
নামের অনুপ্রাস করো না যতোই?
ওদিকে যে অবেলার আলোর ভাসান
পশ্চিম পাহাড়ের চুড়োয়-চুড়োয়
সোনালি রোদের রাঙা নিশেন উড়োয়।'

ছায়া নেমে আসে খাদে, অতল, অথৈ—
ভাঙা-চোরা ছায়া সব, জমা হয় পাহাড়ের ঢলে
নন্দাদেবীর চুড়ো বহুদূরে সোনা হ'য়ে জ্বলে···
গুঁড়ো হয় নিমেষ কতোই!

স্বর্ণা হেলান দেয় পাহাড়ের গায়
ঘুমে গড়া দেহ তার স্বপ্ন ছড়ায়।
কিছুটা রেশমি রং, আর সব আঁকাবাঁকা রেখা!
এ-দেহ পাথর নয়, চিরদিন যায় তাকে রোখা?
জেগে ওঠে ধমনীর উদ্দাম গান,
চ'লে যায় অবেলার আলোর ভাসান।
স্বর্ণা যে ঝর্নারই মতো
আমি তবু পাষাণ তো নই;
আমার মনের খাদ অতল অথৈ!

একটি ভিক্ষা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রির ডাকে যেন চেয়ে থাকে
        লাজে অধোমুখ তোমার বুক
পরশন-ভীরু চেনা দু'টি পাখি
        তারই মাঝে কাঁপে একটি সুখ।

আমি চাই তারই আধখানা সুধু
        এর চেয়ে আর বেশি তো নয়
আমার বিনয়-দ্বিধা-দোলনায়
        হেসে-হেসে খেলে শিশু-প্রণয়।

ওরাওঁ নৃত্য-সংগীতের অনুসরণে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোথা থেকে উঠছে এ কালো মেঘেরা ?
বৃষ্টির ঝরঝরানি···
টুপ্ টুপ্ চুপ্ চুপ্ কোনখানে পড়ছে এরা ?
পুবদিকে দেখ ভিড় করে মেঘেরা ;—
বৃষ্টির ঝরঝরানি···
টুপ্ টুপ্ চুপ্ চুপ্ পশ্চিমে পড়ছে এরা।
এ লাল পাগড়ি কার,—দিলো ভিজিয়ে ?
বৃষ্টির ঝরঝরানি···
কার এ দীঘল চুল, বৃষ্টিতে উঠলো নেয়ে ?
আহা! এ যে সেই ছেলে!—হোথা লুকিয়ে ?
বৃষ্টির ঝরঝরানি···
ওহো! এ যে সেই মেয়ে! কী যে ওরা করে লুকিয়ে ? ··
"কী ক'রে পাগড়ি, আহা, নেবো শুকিয়ে ?"
বৃষ্টির ঝরঝরানি···
"হায়রে, কোথায় আমি এতো চুল নেবো শুকিয়ে ?"
"শুক্‌নো ঝোপেই, আহা, নেবো শুকিয়ে!"
বৃষ্টির ঝরঝরানি···
"বুকের আগুনে, আহা! সব চুল নেবো শুকিয়ে!"
এলোমেলো শাড়িখানি ঠিক ক'রে নাও!···
ছেলে, পাগড়ি বাঁধো!

এতো চুল ! আহা !—সাবধানে আঁচড়াও।...
ছেলে, পাগড়ি বাঁধো।
মেয়ে !—এলোমেলো শাড়িখানি ঠিক ক'রে নাও।...
ছেলে, পাগড়ি বাঁধো।
মেয়ে !—ঠিক ক'রে নাও !

'The poetry of the earth is never dead'.

এষা মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর কবিতার মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই কভু।
প্রখর সূর্যের তাপে, মুহ্যমান ক্লান্ত পাখি যবে
ছায়াচ্ছন্ন তরুশাখে খোঁজে নীড়, একটি শব্দ তবু
সদ্য-চষা মাঠে, ঝোপে নিরন্তর প্রবাহিত হবে।
সে তো ফড়িংয়ের গান ! বসন্তের বিলাসী জীবনে
সে-ই তো নায়ক, তার ফুরায় না রঙীন আবেশ ;
এ যে তার নেশা, খেলা—বসে তাই পরিতৃপ্ত মনে,
সুখী কোনো লতিকার কোল ঘেঁষে, খেলা যবে শেষ।

হবে না, হবে না শেষ কোনোদিন পৃথিবীর গান।
শীতের নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা যবে হ'লো নিশ্চল, নিথর
তুষারের আয়োজনে, কুয়াশায় চারিদিক ম্লান,
বিচালীর পাশ থেকে ঝিঁঝিঁ ডাকে সুতীক্ষ্ণ প্রখর।
উষ্ণ, আরো উষ্ণ হ'য়ে ঝরে গান আধো জাগরণে।—
আধো ঘুমে যেন মনে হয়, সবুজ ঘাসের নীড়ে
সেই ফড়িংয়ের গান ঝিঁঝিঁর গলায় এলো ফিরে॥

স্বধর্ম

বিকাশ দাশ

তৃষ্ণার্ত হৃদয় জানি চেয়েছিল একমুঠো আলো,
চেয়েছিল আকাশের নীলের স্বপন !
তবু ত খুলিনি দ্বার,
কত না উর্মিল দিন এসে ফিরে গেছে বারে বার !
এসেছিল হংস-দূত চাঁদের মেয়ের,
বনগন্ধ, কৌস্তুভের ঘ্রান,—
পাগল জারুলবনে মৌমাছির গুঞ্জনের গান ।
তবু অবলুপ্ত মোর সুর,
স্তব্ধ মোর বাঁশি—
তবু আমি গানে গানে, সুরে সুরে উঠিনি উচ্ছ্বাসি' !

কে যেন বলেছে মোরে নিঃসঙ্গ বনের
রিক্ত স্বপনের
অন্তহীন কথা নিঃস্বতার !
কে যেন বলেছে মোরে কল্পনা-বিলাস
শুধু পরিহাস !
শিল্পী নামে ঢেকে রাখা পলায়নী বৃত্তি ভীরুতার !
তাই,
সংকোচে লজ্জায়,
বহুদিন গাহিনিকো আর
খুলিনি দুয়ার,—
গেঁয়ো সন্ধ্যা ভয় পেয়ে ফিরে চলে গেছে বহুবার !

তবু একদিন,
অশান্ত হৃদয় মোর উতল চঞ্চল
ছিঁড়ে ফেলে নাগপাশ, ভেঙে ফেলে সকল শৃঙ্খল !
খুলে দেয় মোর রুদ্ধ দ্বার,
চেয়ে দেখে বিমুগ্ধ নির্বাক !—
কেন দিল ডাক
উর্মিল স্বপ্নের দিন কোন নীল দিগন্তের তীর ?
কার স্পর্শে রুদ্র রুক্ষ পৃথিবী অস্থির ?
নদী, ফুল, প্রজাপতি ! সায়াহ্ন-তিমিরে
কী এক চেতনা আনে মুক্ত-বন্দী সমস্ত শরীরে !
বাঁশরী নিঃস্বন তোলে ফের,
ভুলে-যাওয়া গোধূলির সুর কোন আরেক দিনের !

চিত্ত ও জগৎ

স্নীলকুমার নাগ

ওখানে শ্মশান জ্বলে, অন্ধ-করা অস্থিভস্মময়।
উত্তপ্ত বাতাসে উড়ে পুঞ্জীকৃত নিষ্প্রাণ আক্ষেপ !
অকল্যাণ আপনারে অবিশ্রান্ত করিছে নিক্ষেপ
রঙ্গনৃত্যে। যে-কোনো দুর্যোগ এসে হতবাক হয়।
প্রক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গসম অতন্দ্র কর্মীরা নিশ্চেতন
স্তব্ধ আকাশের কোলে লুকিয়েছে বিবশ বিভূতি,
বর্বর করাল কাল শুনিবে না কাহারো কাকুতি,
বর্দ্ধিষ্ণু পর্বতশিরে স্বস্তির দুর্লভ্য নিকেতন।

এখানে শ্মশান মৃত। সুরসিক সাহসী মানুষ
অপূর্ব অমৃতক্ষরা আচ্ছাদনে জাহুর কুটির—
স্থাপন করেছে সোজা অন্তরের গম্বুজ-চূড়ায় ;
চিক্কণ দৃষ্টিতে দেখি কোথায় কে বিরহ কুড়ায় !
কোথায় সাগরতলে মৎস্যকন্যা মত্ত অধীর !
পর্বতের উচ্চতার কলা-মন্ত্র এখানে ফানুষ।

জন্ম

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

একটি মুহূর্ত মাত্র! তারপর ঋতু আবর্তন,
সেই পুরাতন খেলা, সুচতুর সযত্ন বিলাস,
নয়নের সেই লীলা, লাবণ্যের কৃত্রিম উচ্ছ্বাস,
পুনরাবৃত্তির পাত্র, অধরের অভ্যস্ত চুম্বন !

তারপর তুমি নেই, হে চঞ্চল, নেই শুভক্ষণ।
একটি মুহূর্ত মাত্র অরূপের বিদ্যুৎ বিকাশ—
কী সুন্দর কপোলের চমকিত লজ্জার আভাস,
কুন্দ-শুভ্র দু'টি করে কী আশ্চর্য সোনার কঙ্কণ।

প্রত্যহের পরিচয়ে অপূর্বের আলো নিয়ে হাতে
চকিতে কখনো আসো, হে অস্থির, হে প্রেম আমার !
হৃদয় আমার ভরি প্রেরণার বিচিত্র আভাতে :—
তারপর, তারপর, সুখ—সুখ ; অসহ্য মধুর,
উন্মথিত অন্ধকার, কী মধুর, কী মধুর, ভার,—
শ্যামল মাতৃত্বে স্নিগ্ধ রুক্ষ, রিক্ত, বন্ধুর, বিধুর।

শ্রাবণ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার আকাশ হবে তোমার চোখের মতো সুগভীর
শান্তস্নিগ্ধ নয়নাভিরাম,
সেইখানে লভিব বিরাম।
আমার অরণ্য হবে তোমার কেশের মতো রহস্যমদির,
সেখানে ছুটির দিন কাঁপিবে অধীর।
আমার সাগর হবে তোমার মনের মতো অগাধ গভীর মুগ্ধ
নিতল নিমীল,
সেখানে আমার ছায়া দোলে ঝিলিমিল।
আমার যাত্রা হবে তোমার গানের মতো উদাস উধাও-ধাওয়া
বনানী-মধুর,
সেই পথে চ'লে যাব দূর।
আমার স্বপ্ন হবে তোমার ঘুমের মতো স্তব্ধ বিশাল,
সেই বিস্ময়ে যাবে ডুবে যাবে দুঃসহ কাল।
তোমার কান্নাভরা কোনো-এক অভিমানী রাত্রির মতো হবে
আমার শ্রাবণ,
আমার শরীর হবে তারি সুর, ঝরোঝরো রিমঝিম অন্ধকারে
মিশে যাবে মন।

রুমির ইচ্ছা

নরেশ গুহ

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি বুলবুল, হাঁস
মৌমাছি হই এক রাশ,
তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই
ছেড়ে যাই ধারাপাত, দুপুরের ভূগোলের ক্লাশ।

তবে আমি টুপ্ টুপ্, নীল হ্রদে দিই ডুব, রোজ
পায় না আমার কেউ খোঁজ,
তবে আমি উড়ে-উড়ে, ফুলেদের পাড়া ঘুরে
মধু এনে দিই এক ভোজ।

হোক আমার এলো চুল, তবু আমি হই ফুল, লাল
ভরে দিই ডালিমের ডাল,
ঘড়িতে দুপুর বাজে, বাবা ডুবে যান কাজে
তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল।

জন্মদিনে রুমিকে

নরেশ গুহ

লাখো বছরের পুরোনো জমিতে
পুরোনো মেঘের জলে
লাখো যুগ পরে একটি গুচ্ছ
সোনালি আঙুর ফলে।
রসে টুসটুস পাৎলা শরীরে
অতটুকু ক্ষীণ প্রাণে
কতো বসন্ত-সূর্যের তাপ
বহন ক'রে সে আনে।

এতো আয়োজনে এতোটুকু ফল তুমি
আট বছরের জন্মদিনের রুমি।

নাম

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হায় নাম। কয়টি অক্ষর শুধু, ধ্বনিময় ক্ষণিক বিবাদ,
আলোকস্তম্ভের মতো নিতান্ত একাকী এক সমুদ্রের স্বাদ
পেলাম তোমার কাছে। রাত্রির নিভৃত দেশে এলে সঙ্গোপনে
দ্যূতক্রীড়া শেষ হলে মায়াবী অরণ্য ভরে হৃদয়ের নির্জন অঙ্গনে।
পিঙ্গল গাছের পাতা নিঃশব্দে পেয়েছে মাটি মৃত্যু অবিরাম
তোমার সায়াহ্ন ভ'রে কত মেঘ ঝড় তোলে মোছে সব নাম।

হায় নাম। পথে পথে ক্ষত দগ্ধ ক্লান্ত মুখ বারবার দেখি
জনতার এক কোণে সায়াহ্ন-সূর্যের তাপে মন ভরেছে কি?
এ-জীবনে স্বাদ নেই, মনের অরণ্যে মৃত রক্তহীন চাঁদ
নিঃশব্দ স্মৃতির হ্রদ, ক্ষণিক পাণ্ডুর আলো, বিবর্ণ প্রাসাদ।
নিরর্থক চেয়ে থাকা। চোখের সমুদ্রে ওঠে কঠিন তুফান :
লাসকাটা ঘরে-ঘরে মাকড় রূপালি জালে লেখে এক নাম।

হায় নাম। অশত্থের নবপত্র দগ্ধ হয় সবুজ আগুনে
দক্ষিণা বাতাস ক্লান্ত রাত্রির স্ফটিক তারা অনর্থক গুণে।
বুঝি আজ যেতে চাই যেখানে পাহাড়ে এক আছে নির্ঝরিণী
নির্জন সকাল আর নির্জন সায়াহ্ন ধরে মৃদু কলধ্বনি।
হঠাৎ চমকে ভাবি : সেখানে একাকী নও, জ্বলে অনির্বাণ
প্রেতের ছায়ার মতো পিছনে দাঁড়ায় এক রক্তহীন নাম।

প্রত্যহের ভার

বুদ্ধদেব বসু

যে-বাণীবিহঙ্গে আমি আনন্দে করেছি অভ্যর্থনা
ছন্দের সুন্দর নীড়ে বার-বার, কখনো ব্যর্থ না
হোক তার বেগচ্যুত পক্ষমুক্ত বায়ুর কম্পন
জীবনের জটিল গ্রন্থিল বৃক্ষে : যে-ছন্দোবন্ধন
দিয়েছি ভাষারে, তার অন্তত আভাস যেন থাকে
বৎসরের আবর্তনে, অদৃষ্টের ক্রূর বাঁকে-বাঁকে,
কুটিল ক্রান্তিতে ; যদি ক্লান্তি আসে, যদি শান্তি যায়,
যদি হৃৎপিণ্ড শুধু হতাশার ডম্বরু বাজায়,
রক্ত শোনে মৃত্যুর মৃদঙ্গ শুধু, তবুও মনের
চরম চূড়ায় থাক সে-অমর্ত্য অতিথি-ক্ষণের
চিহ্ন, যে-মুহূর্তে বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন
সত্তা ব'লে, স্তব্ধ মেনেছি কালেরে, মূঢ় প্রবচন
মরত্বে ; যখন মন অনিচ্ছার অবশ্য-বাঁচার
ভুলেছে ভীষণ ভার, ভুলে গেছে প্রত্যহের ভার।

অন্য প্রভু

বুদ্ধদেব বসু

রাজত্ব দিয়েছো, প্রভু, সকলেরে : শুধু নয় বাংলার জঙ্গলে
আগুন-রঙের বাঘ, আল্পসের কল্পনা-কৈলাসে
দারুণ ঈগল, বারুণী বরফে তপ্ত তিমি, শুধু
দীপ্ত দৃপ্ত দুর্জয়েরে নয়, দিয়েছো সবারে স্বত্ব
সহজাত রাজত্বের : ঘোলা-জল ধোবার ডোবায়
গলা-ডোবা কালো মোষ ভাদ্রের রোদ্দুরে, গলা-ফোলা,
গলা-খোলা ব্যাং
বৃষ্টিশেষ বিকেলের হলুদ রোদ্দুরে, মেঘলা দুপুরে
আকাশে একলা কাক, কার্তিকের রাত্তিরের পোকা, মারীমত্ত
মাছি,
রাক্ষস টিকটিকি—সকলেরে রাজত্ব দিয়েছো, প্রভু, সকলেরই
প্রভুত্ব নিয়েছো মেনে।...এ-স্বারাজ্য-সাম্রাজ্যে শুধু কি
বঞ্চিত শুধু কি আমি ?...আমি কবি !...শুধু আমি
রাজ্যচ্যুত...নির্বাসিত ?...অন্ন, শুধু প্রত্যহের অন্ন দিয়ে
আমার রাজত্ব নিলে কেড়ে ? শুধু আমি প্রতি মুহূর্তের
অস্তিত্বের অস্বস্তির দাস ?...সত্যি তা-ই ?...না কি আমি,
কবি-আমি
কোলের কুকুর কিংবা জুয়োর ঘোড়ার মতো, সব,
সব স্বত্ব হারায়েছি অন্য, হীন প্রভু মেনে নিয়ে।

সুকান্ত

জন্ম ৩০ শ্রাবণ ১৩৩৩ : মৃত্যু ২৯ বৈশাখ ১৩৫৪

বন্ধুমহলে নাম শুনেছিলুম আগেই ; চোখে দেখলুম লেক-লগ্ন একটি ক্লবের বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠানে। উজ্জ্বল আলোয়, সুবেশ, চিক্কণ এবং সাধারণত কাব্যসম্বন্ধে উদাসীন মেয়ে-পুরুষের ভিড়ে কালো একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ চেঁচিয়ে, বেশ স্পষ্ট ক'রে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে নিজের লেখা একটি কবিতা পড়লো। পড়াটা ভালো লাগলো আমার, কবিতাটিও মন্দ না। সভার শেষে একটু আলাপ করলুম ছেলেটির সঙ্গে।

এর পরে সুকান্ত একদিন এলো আমার কাছে। কালোকেলো শক্তপোক্ত চেহারা, ছোটো ক'রে ছাটা রুক্ষ চুল, আধ-ময়লা মোটা জামাকাপড়, পায়ে (খুব সম্ভব) জুতো নেই। তার বড়ো-বড়ো মজবুত হাত-পার দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো, তার রক্তের আত্মীয়তা সেই কৃষক-মজুরেরই সঙ্গে, যাদের কথা লিখতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। গর্কীর মতো, তার চেহারাই যেন চিরাচরিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কানে কম শোনে, কথা বেশি বলে না, দেখামাত্র প্রেমে পড়বার মতো কিছু নয়, কিন্তু হাসিটি মধুর, ঠোঁট দুটি সরল।

পাঁচ বছরে বোধহয় পাঁচ বারও সুকান্তকে চোখে দেখিনি আমি। বছরে দু একবার চিঠি লিখতো সে—কিংবা 'কবিতা'র জন্য কবিতা পাঠাতো—ব্যক্তিগতভাবে এটুকুই ছিলো তার সঙ্গে আমার সংযোগ। কিন্তু ব্যক্তিগতর বাইরে অন্য যে-জগৎ আছে আমাদের, সেখানে সে তো সহযাত্রী, নিত্য সঙ্গী আমাদের। সুকান্তকে আমি ভালোবেসেছিলুম, যেমন ক'রে প্রৌঢ় কবি তরুণ কবিকে ভালোবাসে ; দূর থেকে লক্ষ্য করেছি তাকে, সে একটি ভালো লাইন লিখলে উৎসাহ পেয়েছি নিজের কাজে। আর

ভালো লাইন সে মাঝে-মাঝেই লিখেছে ; ছন্দে ভুল নেই, হাতের লেখা সুন্দর, যা বলতে চায় স্পষ্ট ক'রেই বলে। এটুকু ছেলের পক্ষে এর প্রত্যেকটিই উল্লেখযোগ্য। মনে-মনে আমি তাকে মার্কা দিয়ে রেখেছিলুম জাত-কবিদের কেলাশে ; উঁচু পর্দায় আশা বেঁধেছিলুম তাকে নিয়ে। কিন্তু আশা তো বিশ্বাসঘাতিকা ? সুকান্তর অল্প কয়েকটি প্রাথমিক রচনা প'ড়েই বুঝেছিলুম যে সুভাষের সঙ্গে তার মিল নামের আড়ম্বরে শুধু নয় ; কী প্রসঙ্গে, কী আঙ্গিকে, কী অঙ্গীকারে, 'পদাতিকে'র একান্ত অনুগামী সে। কিন্তু সুভাষ তো কাব্যের ক্ষেত্রে আর-কিছু করলো না : এরও যদি তা-ই হয় ?

আশাভঙ্গের দূত এলো অন্য দিক থেকে। কয়েক মাস আগে—শীতকাল তখন—সুভাষ হঠাৎ রাত ক'রে এলো এই খবর দিতে যে সুকান্তর যক্ষ্মা হয়েছে। যক্ষ্মা! ...ক'দিন পরে আবার শুনলাম ডাক্তার বলেছেন রোগ এগিয়ে গেছে অনেক দূর।... তারপর ভরা গ্রীষ্মের একটি দিনে এসে পৌঁছলো বর্তমানের তরুণতম বাঙালি কবির মৃত্যুসংবাদ। খবরটার জন্য প্রস্তুতই হ'য়ে ছিলুম, তাব'লে দুঃখ কি কম ?

২

যক্ষ্মার খবরের অল্পদিন আগে সুকান্তর একটি পোস্টকার্ড পেয়েছিলাম। নিজের দুটি লাইন তুলে দিয়ে জিগেস করেছে : ছন্দ ঠিক আছে কি ? বন্ধুরা সংশয় প্রকাশ করছে। আমি তাকে জানিয়েছিলুম যে, ছন্দে তার দোষ হয়নি, আর সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলুম আদর্শবিশ্বাসীর গর্বপ্রসূত এই কথা : 'রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছো তুমি ; তোমার জন্য দুঃখ হয়।' সমগ্রভাবে সুকান্তর কবিতা সম্বন্ধে এটুকুই আমার বক্তব্য। তার কবিতা প'ড়ে মোটের উপর এ-কথাই মনে হয় যে তার কিশোর-হৃদয়ের স্বাভাবিক উন্মুখতার সঙ্গে পদে-পদে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে

একটি কঠিন, সংকীর্ণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ। কবিতাগুলি যেন সেই মতবাদের চিত্রণ মাত্র; জোর গলায় চেঁচিয়ে বলা, কবিতা না-হ'য়ে খবরকাগজের প্যারাগ্রাফ হ'লেই যেন মানাতো। 'পদাতিক' লেখবার সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে-স্বাধীনতা ছিলো, যার জন্য একই মতবাদ সম্বন্ধে মুগ্ধতা সত্ত্বেও ঐ ক্ষীণ বইখানার কাব্যের মর্যাদা পাওয়া সম্ভব হয়েছে, সুকান্ত ভট্টাচার্যে সে-স্বাধীনতার কিছুই তো বর্তালো না। কেন বর্তালো না, এ-প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে? যুদ্ধকালীন উদ্‌ভ্রান্তির সুযোগে দেশের সব ক'টি পোলিটিক্যাল পার্টি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক-একটি ফ্রণ্ট খুললেন, আর আমাদের নবীন লেখকরা যৌবনের ত্যাগপ্রবণতায় অধীর হ'য়ে উঠলেন নিজেদের বিকিয়ে দিতে। 'পদাতিকে' যা ছিলো মুগ্ধতার আবেগ, সুকান্তর ক্ষেত্রে তা হ'য়ে উঠেছিলো সুচিন্তিত দাসত্ব। তা-ই যদি না হবে, তাহ'লে যে-ছেলে দেয়ালে পেনসিল দিয়ে লিখেছিলো :

দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে
লিখি কথা
আমি যে বেকার, পেয়েছি লেখার
স্বাধীনতা।

কি

হে রাজকন্যে
তোমার জন্যে
এ-জনারণ্যে
নেইকো ঠাঁই
জানাই তাই।

এমনকি

সকালে বিকালে মনের খেয়ালে
ইঁদারায়
দাঁড়িয়ে থাকলে অর্থটা তার
কী দাঁড়ায়?

আর লেখার পরে ফিরেও তাকায়নি, সে কী ক'রে নিম্নোদ্ধৃত ডামাডোলকে কবিতা ব'লে ভুল করতে পেরেছিলো?—

এখন এই তো সময়—
কই?, কোথায়? বেরিয়ে এসো ধর্মঘট ভাঙা দালালরা;
সেই সব দালালরা—
ছেলেদের চোখের মতো যাদের ভোল বদলায়,
বেরিয়ে এসো,
জাহান্নমে যাওয়া মূর্খের দল,
বিচ্ছিন্ন, তিক্ত, দুর্বোধ্য—

কিংবা :

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়—
এবার কঠিন কঠোর আঘাত আনো
পদলালিত্য ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো,
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি

এখানে মতের সঙ্গে অভ্যাসের সুস্পষ্ট বিরোধ ঘটিয়ে যে-ছেলে কবিতা লিখে কবিতাকে ছুটি দিচ্ছে, গদ্যের হাতুড়িকে আহ্বান করছে ললিত পদাবলীতে, সে কী ক'রে এত দূর আত্মবিস্মৃত্ হ'তে পেরেছিলো যে

সহসা নেতারা রুদ্ধ—দেশ জুড়ে
'দেশপ্রেমিক' উদিত ভুঁই ফুঁড়ে
প্রথমে তাদের অন্ধ বীর মদে
মেতেছি এবং ঠকেছি প্রতি পদে—

এই আধুনিক সম্ভাবশতক লিখতেও তার কলমে আটকায়নি?

বস্তুত ধনিকের দ্বারা শ্রমিকের রক্তশোষণ সুকান্তর রীতিমতো

একটা ম্যানিয়া হ'য়ে উঠেছিলো, চিত্তের একটা অসুস্থতা ; সর্বত্রই সে যেন বিভীষিকা দেখছে, আর তা থেকে পালাতে গিয়ে বার-বার ডুব দিচ্ছে ভাবালুতার পাতালে। সূর্যকে সে বলছে—'হে সূর্য, তুমি তো জানো আমাদের গরম কাপড়ের কতো অভাব!' সে দেখছে, অসহায় সিঁড়িকে পা দিয়ে পিষে মারছে 'গর্বোদ্ধত অত্যাচারী,' 'মৌন-মূক শব্দহীন' কলমকে দিয়ে কলঙ্কময় দাসত্ব করিয়ে নিচ্ছে হৃদয়হীন লেখক ; সে উত্তেজিত করছে সিগারেটকে 'হঠাৎ জ্ব'লে উঠে বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে' মারতে, 'যেমন ক'রে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছো এতোকাল' ; সে কাঁদছে ডাকঘরের রানারের দুঃখে—'পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া' ! (ছুঁতে পারলে কি ভালো হ'তো ?)

বালকের ভাবালুতা ব'লে এ-সব উড়িয়ে দিতে পারতুম, যদি না সুকান্তর সহজাত কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা থাকতো আমার। এর চেয়ে ভালো কবিতা তার আমি দেখেছিলাম ; আর আভাস পেয়েছিলাম নেপথ্যবর্তী আরো বড়ো সম্ভাবনার। কিন্তু সম্প্রতি এ-ধরনের লেখাই বেশি বেরুচ্ছিলো তার কলম থেকে, তার কারণ হয়তো এই যে রাজনৈতিকের বিচারে এগুলোই ভালো কবিতা। বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ দুর্ভাগ্য আজ এইটেই যে এর অনেকটা অংশই হ'য়ে উঠেছে বিভিন্ন শিবিরবাসী সৈনিকদের যান্ত্রিক কুচকাওয়াজ মাত্র। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে এ-সব রচনা সুকান্তর স্বাধীন মনের স্বচ্ছন্দ কর্মপ্রসূত। সৈনিকপংক্তিতে বন্দী হ'লে, কোনো মতবাদের দাসত্ব স্বীকার করলে, শক্তিশালী কবিরও কী-রকম অপমৃত্যু ঘটে, তারই উদাহরণ সুকান্ত। ছেলেমানুষ ব'লে অসম্মান করবো না তাকে, কেননা উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে স্মরণীয় কবিতা লিখেছেন স্বদেশের ও বিদেশের অনেক কবি। সুকান্ত কেন পারলো না ? সে মৃত ব'লে এ-প্রশ্নের উত্তর কি এড়িয়ে যাবো ? কবির কায়িক মৃত্যু যত দুঃখের, তার মানসিক

পক্ষাঘাত কি তার চেয়ে কম ? স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ করেছিলো সুকান্ত ; শেষ পর্যন্ত নিজের লুপ্তি দ্বারা রচনা ক'রে গেলো সমসাময়িক আর পরবর্তী নবীন লেখকদের জন্য সাবধানী বাণী।

৩

সুকান্তর নিজের দিক থেকে মহৎ এই ত্যাগ। স্বল্প পরিসরের মধ্যে দ্বিধাহীন, খেদহীন, নির্মল, সম্পূর্ণ তার জীবন। যে-প্রতিজ্ঞা সে নিয়েছিলো, তার দায়িত্ব নিঃশেষে পালন ক'রে গেছে সে। সে তো জানতো না যে দেশের ও বিশ্বের বীভৎস নৈরাজ্য থেকে যে-মতবাদে নিশ্চিত আশ্রয় সে খুঁজেছিলো, তারও ক্রিয়াকর্ম নৈরাজ্যাভিমুখী ; সে তো জানতো না যে 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারদিকে' ব'লে ক্রমাগত চীৎকার করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত শুধু যে রেল-লাইন ওপড়ানো আর পোস্টাপিশ পোড়ানো হবে তা নয়, শুধু যে কলকাতার রাস্তা হত্যার প্রকাশ্য রঙ্গালয় হ'য়ে উঠবে, তাও নয় ;—তার চেয়েও বেশি—পরীক্ষা দিতে এসে ছেলেরা চেয়ার টেবিল ভেঙে বেরিয়ে যাবে, পড়া না-পারলেই ধর্মঘট করবে স্কুলের ছাত্র—তারপর একদিন নম্বর-বিতরণে ঘোরতর অসাম্যের অন্যায় আর যদি সহ্য না হয়, যদি বিদ্যার্থী বঞ্চিতেরা পাশ-করা পুঁজিওলাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধই ঘোষণা করে—তাহ'লেই বা কী বলবার আছে ?···কিন্তু এই সর্বনাশী পরিণাম সম্বন্ধে অচেতন থেকেও কাব্যশক্তির বিকাশ তো সম্ভব, যদি কবির আত্মচেতনা থাকে। তাও উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলো সুকান্ত, কিছু হাতে রাখেনি, যূথের কাছে ব্যক্তির সর্বস্ব সমর্পণের সমীকরণে তার কবিত্বে কুঁড়ি ধ'রেই ঝ'রে গেলো। যে-চিলকে সে ব্যঙ্গ করেছিলো, সে জানতো না সে নিজেই সেই চিল ; লোভী নয়, দস্যু নয়, গর্বিত নিঃসঙ্গ আকাশচারী, স্খলিত হ'য়ে পড়লো ফুটপাতের ভিড়ে, আর উড়তে পারলো না, উঠতেই পারলো না। কবি হবার জন্যই জন্মেছিলো সুকান্ত, কবি হ'তে পারার আগেই মরলো সে। দ্বিগুণ দুঃখ হয় তার জন্য।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

প্যারীমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হয়েছি। আমার ছেলেবেলায় 'প্রবাসী'তে যাঁরা নিয়মিত কবিতা লিখছেন (এখন বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু সে-যুগে বাংলাদেশের যা কিছু 'নতুন' কবিতা, সব 'প্রবাসী'তেই বেরতো), তাঁদের মধ্যে রাধাচরণ চক্রবর্তীর অকালমৃত্যু ঘটলো কয়েক বছর আগে, প্যারীমোহনও ঠিক বার্ধক্যে পৌঁছতে পারলেন না। তাঁর কবিতা সম্বন্ধেই (সম্ভবত) রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'তোমার কবিতা আমার ভালো লাগে।' ('কবিতা দুই জাতের, ভালো ও মন্দ। তোমার কবিতা প্রথম জাতের'—এটা কাকে বলেছিলেন, এখন কিছুতেই আর মনে করতে পারছি না।) যা-ই হোক, প্যারীমোহনের কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে সায় দিয়েছিলেন তৎকালীন অনেক পাঠক। উত্তরজীবনে কবিতা তিনি আর আর বেশি লিখেছেন ব'লে মনে হয় না ; বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা করতেন ; বছর পনেরো আগে 'উদয়ন' ব'লে একটি মাসিকপত্র বেশ একটু জাঁক-জমক ক'রে যখন বেরোয়, প্রথম দিকে তার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কবিতার বই এখন আর চলতি আছে কিনা জানি না, খুব সম্ভব নেই ; এবং সতর্ক না-হ'লে তিনিও অচিরেই সেই প্রেতলোকেই মিশে যাবেন, যেখানে দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং আরো অনেক বাঙালি কবি এখন লুপ্ত। কিন্তু সতর্ক হবে কে? কবিদের—বিশেষ গৌণ কবিদের—রচনা প্রকাশ লাভকর ব্যবসা নয় ; বিশ্ববিদ্যালয় বা ঐ-রকম কোনো নৈর্ব্যক্তিক হিতকর প্রতিষ্ঠান ভার নিলে তবেই এ-কাজ সুসম্পন্ন হ'তে পারে। এ-বিষয়ে 'কবিতা'য় আগেও লিখেছি, হয়তো আবারও লিখতে হবে। বার-বার আঘাত করলে একদিন কি দরজা খুলে যাবে না?

সমালোচনা

একান্তা। সুধীরকুমার চৌধুরী। দাম লেখা নেই

পুনর্নবা। অজিত দত্ত। পূর্বাশা প্রেস। ১॥০

সুধীরকুমার চৌধুরীর কাব্যে নবযৌবনের বর্ষা যখন শেষ হয়ে গেল আমার তখন অক্ষর পরিচয় হয়নি। আমি যখন লিখতে পড়তে শিখলুম তখন তিনি হঠাৎ কী কারণে কবিতা লেখা বন্ধ করলেন। মনে পড়ে ছেলেবেলায় পুরোনো প্রবাসীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা কবিতার উপর কতবার তাঁর নাম চোখে পড়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো প্রতি মন দেবার কৌতূহল অত ছেলেবেলায় ছিল না। বহুকাল পরে তাঁর সে কবিতাগুলো 'জলের লিখন' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তাও বোধহয় দশ বছর আগেকার কথা। মনে করেছিলাম ইতিমধ্যে আর নতুন কিছু লিখছেন না তিনি। হঠাৎ তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থখানি হাতে পেয়ে তাই চমকে উঠেছিলুম। মহাযুদ্ধের কয় বছরে লেখা কবিতাগুচ্ছ তিনি এ গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। সবগুলি রচনার নিচেই ১৯৪০ এর পরেকার তারিখ এবং অনেকগুলি কবিতাই প্রেমের কবিতা। এ-গ্রন্থের নামকরণ করেছেন তিনি 'একান্তা' : 'জলের লিখনের' 'অতিবিনয়' না থাকলেও 'একান্তা' শুধু নাম মাত্র নয়, পরিচয়। তিনি যে সমসাময়িক হয়েও স্বতন্ত্র ও নিভৃত, তিনি যে—যূথবদ্ধতায় নয়—একনিষ্ঠ এককের সার্বিক সার্থকতায় প্রত্যয়শীল, সে কথাটা যেন তিনি নামকরণেই ব'লে দিতে চান।

বস্তুতই আধুনিকতার কোনো চিহ্ন তাঁর কবিতার বেশবাসে চোখে পড়ে না। কিন্তু আধুনিকতাই কোনো কবিতার নিন্দা বা প্রশংসার যথেষ্ট চিহ্ন নয় এই কথাটাই আমার বলার। আমি বুঝতে পারি সুধীরবাবু সেই যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ যখন সূর্যের মতো সাহিত্যের আকাশে জ্বলছেন। (এই সেদিনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে জীবিত ছিলেন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে!) এমন বোধ হয় কেউ ছিলেন না সে যুগে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তিতে যাঁরা অভিভূত না হয়েছেন, যাঁদের জীবনের ভাবনার কল্পনার আকাশ রবীন্দ্রনাথের রঙে আচ্ছন্ন না হয়েছে। আমরা যাঁরা পরে এসেছি, দূর থেকে শৈশবের বিস্ময়-বিহ্বলতায় তাকিয়েছি রবীন্দ্রনাথের দিকে, তারা ভাবতেই

পারি না রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় যাঁরা বড়ো হ'য়ে উঠেছেন তাঁদের কাছে তিনি কতোটা ছিলেন। 'একান্তা'র প্রথম কবিতা 'অন্তরাগ' সেই বিরহ-বেদনার অভিজ্ঞান।

সুধীরবাবু যে আমাদের একযুগ আগে জন্মগ্রহণ করেছেন এ-কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক। এতদূর উৎসুক যে নামের পূর্বে 'শ্রী' পর্যন্ত তিনি ত্যাগ করেননি, যদিও এযুগে কেউই আর ঐ অলংকরণ ব্যবহার করে না, এমনকি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শেষ জীবনে করেন নি। এই পুরাতনপ্রীতি তাঁর প্রতিটি কবিতাই তারস্বরে ঘোষণা করছে। প্রকাশভঙ্গির বিচিত্র পরীক্ষার পথে, আধুনিকের নিরন্তর অনুসন্ধানের দিকে তিনি আশ্চর্যরকম উদাসীন। ভাষার পরিমার্জনায়, পদ্যগন্ধী শব্দ পরিহার করায় তাঁর মন নেই: সন্তরিয়া, সঞ্জীবিয়া, অবহেলে, প্রবেশিতে, হিয়া, সখী, শুধাও, পরশি, প্রভৃতি যে-সব কথা পারতপক্ষে আজকাল আর কেউ কবিতায় ব্যবহার করেন না—তাদের তিনি অনায়াসে অসংকোচে প্রশ্রয় দিয়েছেন। ছন্দের নতুন সম্ভাবনার জন্য তিনি ভাবিত নন; প্রকাশের গাঢ় সংহতির জন্য কোনোই প্রয়াস নেই তাঁর। অধিকাংশ কবিতাই দীর্ঘ। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, প্রতীক, প্রতিরূপে তিনি মধ্য-রবীন্দ্রনাথেরই একান্ত অনুগামী। একটিমাত্র কবিতায় একটিমাত্র 'অবিশুদ্ধ' কথা তিনি ব্যবহার করেছেন—

মোর দেশমাতৃকারে দেখে এস কন্ট্রোল দোকানে।

কিন্তু সুর কেটে গেল; খট্ করে কানে বিঁধলো কথাটা। ওটাকে প্রক্ষিপ্ত বলতে পারলেই খুশি হতুম। তবে এ ছাড়া, মোটামুটি বলতে গেলে, মধ্য-রাবীন্দ্রিক সাধুতা তাঁর রচনায় অক্ষুণ্ণ।

তবু তো, এই কবিতাগুলো পড়ে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারলুম না যে সুধীরবাবু আমার প্রিয় কবিদের মধ্যে একজন। কবিতার ভঙ্গি, ভাষা কাব্য-উপভোগের পক্ষে অনেকখানি হলেও নিশ্চয়ই সবটা নয়। তিনি যা নন তা নিয়ে অভিযোগ কী আক্ষেপ বৃথা। বিচিত্র স্বরের সাধনা তিনি তাঁর কাব্যে করেননি। তিনি বিশুদ্ধ প্রকৃতির কবি নন; তিনি অতি-প্রাকৃতের কবি নন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ঝাঁজ তাঁর জানা নেই; তিনি শান্তশীল বিষণ্ণ প্রেমের কবি। তাঁর হৃদয়ের আবেগ উত্তর-জীবনের তির্যক ছায়ায় ছায়াময়। এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে প্রথম যৌবনের তীব্রতা নেই, আধুনিক মনের জটিলতা নেই। এ-কথাও হয়তো বলা যায় যে তাঁর প্রেমের

কবিতায় metaphysics-এর স্পর্শ লেগেছে। পড়তে পড়তে বেদনায় হৃদয় ছিঁড়ে পড়ে না। কিন্তু চিন্তা-লাগা আবেগের গাঢ়তায় গম্ভীর হ'য়ে যায় মন।

এ জন্মের মত
সাধিব দুজনে সখি অসিধারব্রত
তিমির বিহ্বল নিশা...
...হাত রাখি হাতে
দিকচক্র দ্বিধা হয় তীক্ষ্ণধার বিদ্যুতের ঘাতে,
সে আলোতে চাহিয়া চমকি
হেরি কার অসিফলা দুজনার মাঝে দোলে সখী।...

অতীতের প্রতি তাঁর স্থির আনুগত্য তাঁকে নিছক 'গতানুগতিক' ক'রে তোলেনি এই কারণে যে কাব্যে যে সুর বাজাতে তিনি চেয়েছেন তার জন্য সঙ্গতের কোনো নতুনত্বের প্রয়োজন হয় না। এই সঙ্গে এটাও হয়তো উল্লেখযোগ্য যে সমসাময়িক রীতিকে অস্বীকার করলেও সমসাময়িক বিষয়কে একটু বেশিই প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি; যুদ্ধ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক ভূকম্পন, তাঁর মতো কবির পক্ষে এ-সব বিষয়ে নীরবতাই যদিও সুশোভন ছিলো, তবু তাঁর মানবিক চিত্তবিক্ষেপকে কবিতায় প্রকাশ না করে তিনি পারেন নি। এ-রকম ক্ষেত্রে কবির প্রত্যয়কে বিষয়বস্তু থেকে কবিতায় রূপান্তরিত করা দুরূহ, এবং সুধীরবাবু যখন বলেন,

হৃদয় তো থাকে না যুগের
তার কাছে প্রেমের দূতের
আছে কোন পরিচয়, মর্যাদা কে দেবে সেথা তাঁরে

তখন আমরা বুদ্ধি দিয়ে সম্পূর্ণ সায় দিই তাঁর কথায়, অর্থাৎ নিজেকে তাঁরই মতাবলম্বী বলে স্বীকার করি, এবং যে-যুগে সাহিত্যের চেহারা নিয়েও অজস্র রচনা দিগ্বিদিকে শুধু হিংসাই প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে, সে যুগে প্রেম ও পবিত্রতার পরম সত্য উচ্চারণ করেছেন ব'লে তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাই—তবু এ প্রশ্নও মনে জাগে বইকি যে এ-সব কথা এত স্পষ্ট ক'রে বললে কবিতা কি ক্ষুণ্ণ হয় না?

অজিত দত্তকে আমি 'পাতালকন্যা'র কবি ব'লে চিনি। 'কুসুমের মাসে'র পরে 'পাতালকন্যা'তেই তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেছিল বলে আমার বিশ্বাস। তিনি ছিলেন স্বপ্নময় রূপকথার অপরূপে বিশ্বাসী।

তিনিই আবার অত্যন্ত ঘরোয়া, অত্যন্ত পারিবারিক সুরে অভ্যস্ত। 'কুসুমেরমাসে' এই ঘরোয়া প্রেমের স্নিগ্ধ মাধুরী অম্লান হয়ে আছে।

গুরুজনদের মাঝে কথা কহিবার অছিলায়
কহিলাম, 'এক গ্লাশ জল দেবে, পেয়েছে পিপাসা।'

এই ধরনের সনেটে কত সুখ তিনি রচনা ক'রে তুলেছিলেন! আবার যৌবনের জাদুতে, প্রেমের মুগ্ধতায় সেই নিঃঝুম স্বপ্ন-পুরীর ঘুমও তিনি ভাঙিয়েছিলেন, শৈশবের বিস্ময়, ভয় আর কৌতুহল নিয়ে রূপকথার যে-জগৎ আমরা পার হ'য়ে আসি। একমাত্র জীবনানন্দ দাশ ছাড়া আর কোনো কবিরই অলৌকিকে এত অগাধ বিশ্বাস ছিল না। এবং সে-বিশ্বাস তাঁরা সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন তাঁদের কাব্যে।

যেখানে রূপালি ঢেউয়ে দুলিছে ময়ুরপঙ্খী নাও।

কিংবা—

দূরে বহুদূরে—শাল তাল
তমাল হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়াম্লান দেশে—
প্রেম বুঝি নাহি টুটে—

কতোবার পড়েছি! অভাবিতের অদৃশ্য অঞ্জন চোখে নিয়েই তিনি বাংলা কবিতায় এসেছিলেন। সেই দৃষ্টি পৃথিবীতে যার উপরে পড়ে তারই রূপান্তর হয়। তাই মায়াময় হয়। সেই অতিপ্রাকৃতের অরূপ সংগীতকে সনেটের মতো আঁটোসাঁটো নির্ধারিত মাপেও তিনি ধরিয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর প্রাণের সেই দেশ যে তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে উদ্যত তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল, 'নষ্ট চাঁদে'ই, 'পুনর্বা'য় তা স্পষ্ট হ'লো। চিরকালের মতোই ত্যাগ করেছেন সেই মায়ালোক, আর তা নিয়ে তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ নেই। কিন্তু

একদিন এ জীবনে সত্য ছিল মিথ্যার বেসাতি—

এই যদি প্রথম যৌবনের কাব্যসাধনার প্রতি তাঁর মন্তব্য হয় তাহ'লে পাঠকের পক্ষ থেকে আমি অন্তত আপত্তি করবই।

আজ তিনি 'জেগে উঠেছেন' স্বকালের বাস্তব চেতনায়, আসন্ন সামাজিক পরিবর্তনের বিরাট রহস্য তাঁর চোখের সামনে আজ উদ্‌ঘাটিত। উল্টো রথের বাজনা বাজছে—'চন্দনে আর চলবে না কাজ তিলক কাটো রক্তের।' (কিন্তু আর রক্ত কেন?)

পশুবৎ আজো যারা নগ্ন নিঃস্ব মূর্খ অসহায়
স্বর্ণ দন্ত ভস্ম হবে তারা যদি চোখ মেলে চায়।…

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—রবীন্দ্রনাথের সেই বেদনাময় আবেগোচ্ছ্বাস মনে পড়ে। কিন্তু 'পাতালকন্যার' কবির এই রূপান্তর আশাতীতভাবে বিস্ময়কর। বিস্ময়কর এই জন্য যে তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক পথ থেকে তিনি স্বেচ্ছায় এমন ক'রে স'রে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্বাস করা শক্ত। তাঁর তৃতীয় গ্রন্থেই এই পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। তাঁর স্বপ্নভঙ্গ করেছিল যুদ্ধের অপূরণীয় ক্ষতি। নিজের প্রতি এবং অকিঞ্চন বিশ্বের প্রতি করুণায় তখন ব্যঙ্গের সুর লেগেছিল তাঁর কণ্ঠে। পুনর্বায় সেই ব্যঙ্গও নেই, এখন তিনি একেবারেই সীরিয়স।

আমরা পীড়িত, ক্লিষ্ট, সঙ্গীহীন, তথাপি আমরা
স্নেহ প্রীতি সত্য নিয়ে কাব্য রচি এ মোদেরি কাজ…

কবি অজিত দত্তর কণ্ঠে একথা অত্যন্ত বাহুল্য ব'লে শোনায়। আশার জন্য ভবিষ্যতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেছেন—সেই ভবিষ্যতে একালের 'পঙ্কতিলক' মুছে অবশ্যই জয়মালা আছে—এই অলীক আশ্বাসে তিনিও দেখছি আস্থাবান্। মোটের উপর অপ্রস্তুতে পড়তে হয় পাঠককে: যেন গান শুনতে ব'সে গায়কের কথা শোনা। কিন্তু তাতেই বা কী? স্বপ্নের কবিতা না-হয় নাই লিখলেন আর তিনি। তাঁর মনে মহামানবিক দুঃখের এই চেতনায় আনন্দিত হওয়াই তো উচিত। কিন্তু এই সব সীরিয়স কবিতায় সেই স্বচ্ছন্দ অনির্বচনীয় সুরটি কি শোনা যায়—কাব্যের মোহময় তৃপ্তিতে যা ভ'রে দেয় আমাদের হৃদয়কে? বিগত যুগের (১৯৩৪ সালে লিখিত) একটি সনেট দিয়ে তিনি তাঁর এ গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন; রূপান্তরটা প্রত্যক্ষ করানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এটি নিশ্চয়ই তাঁর বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতার নিদর্শন নয়, কাজেই তুলনীয় নয়। সীরিয়স মন নিয়েও কোনোদিন তিনি কবিতায় গম্ভীর স্বগতোক্তি করতেন না। সেই ছিল তাঁর স্বভাব। আজো সেই সুর যে তিনি ভুলতে পারেননি, 'সহস্র সহস্র জন্ম চলে গেল। শতাব্দীর পর—' এই কবিতাই তার নিদর্শন থাকলো। কবির বিশ্বাস অবিশ্বাসের সঙ্গে কাব্যের সার্থকতার কী যোগ আছে সে প্রশ্ন তুলব না। আমি বলব এ কবিতাগুলো বড়ই সরল, বড়ই স্পষ্ট। বক্তার চেয়ে এ কবিতা কিছুই বেশী বলে না। এর মধ্যে অনির্বচনীয় নেই।

সুখের কথা যে লঘুছন্দে, ঈষৎ কৌতুকহাস্যমণ্ডিত সেই মধুর ছড়াগুলি তিনি আজও লিখছেন। উত্তর-পাতালকন্যার কবির পরিচয় আমার কাছে এই সুন্দর হালকা কবিতাগুলোতেই।

দিকে দিকে চিৎকার
ক্ষিং কার জিং কার—

হালকা অর্থে সামান্য নয়। চালটা হালকা, কিন্তু রস ফিকে নয়। ছড়ার পথে আধুনিক বাংলা কবিতা বিকাশের একটি সুন্দর সম্ভাবনা রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কবি অজিত দত্তর মন ও মেজাজ দুইই এর অনুকূল। ছড়াগুলির জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এ আশা নিশ্চয়ই রাখবো অপেক্ষাকৃত নির্জন বাংলা কাব্যের এই মহল দিনে দিনে তিনি আরও ঐশ্বর্যমণ্ডিত ক'রে তুলবেন।

Rabindranath Tagore, by Masti Venkatesa Iyengar. Jeevana Karyalaya, Bangalore. Rs. 6/-

পৃথিবীর কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সামান্য অনুবাদ প'ড়ে তাঁর জীবন এবং সাহিত্য নিয়ে আলোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করা কি সম্ভব? বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের? যাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা সাহিত্য এবং জীবনের প্রতিটি কোণ উদ্ভাসিত করেছিল? আমরা জানি কবির কোনো দেশ নেই, কাল নেই। সর্বযুগের, সর্বদেশের মানুষের তিনি সমকালীন। তাঁর বয়সের কোনো সীমা নেই, কেননা তাঁর বাণীর মহাদেশে ক্লান্তিহীন কাল তার গতি হারায়। তবু এ কথা সত্য যে তাঁর আপনার ভাষার মধ্য দিয়ে না-পেলে কবিকে সত্যি করে পাওয়াই হয় না। একই সময়ে তিনি স্বকালের ও স্বদেশের এবং বিশ্বের ও চিরকালের।

বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধের কিছু অনুবাদ হয়েছে। গীতাঞ্জলি যুগের কিছু কবিতা তো তিনি নিজেই অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু বিপুল রবীন্দ্ররচনাবলীর তুলনায় তার পরিমাণ সামান্য। অনুবাদ প'ড়ে যাঁরা আকৃষ্ট হবেন, মূল রচনা পড়ে তাঁরা মুগ্ধ হবেন—অনুবাদের, অন্তত রবীন্দ্ররচনা অনুবাদের একমাত্র লক্ষ্য বোধ হয় তাই। কানাড়া সাহিত্যের অগ্রণী আধুনিক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মাসতি বেঙ্কটেস আয়েঙ্গার, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের উপর নির্ভর ক'রে একটি গ্রন্থ রচনা করার প্রয়াস করেছেন।

কানাড়া সাহিত্যে তাঁর ছোটোগল্পের বিশেষ সুখ্যাতি। শ্রীরাজাগোপালাচারী যখন তামিল ভাষায় গল্প লিখতেন তখন তিনি মাসতি বেঙ্কটেস আয়েঙ্গারের 'মুক্তোর মতো' গল্পগুলো থেকে বেছে কিছু অনুবাদ করেছিলেন। (শ্রীরাজাগোপালকে আমরা আজ তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রবীণ রাজনীতিক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনে, কিন্তু তামিল সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়।) কবিতাভবন থেকে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের একটি গল্পের অনুবাদও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপর এ-গ্রন্থখানিতে তাঁর যশোবৃদ্ধি হবে কি? রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অসীম। তাহলেও অনুবাদের সার সংক্ষেপ আর টমসন প্রমুখ সমালোচকদের আলোচনার পুনরালোচনা ক'রে এই গ্রন্থ তিনি কাদের জন্য লিখেছেন? মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথকে যারা কোনোদিনই পড়বে না, অথবা সামান্য অনুবাদেই তুষ্ট থাকবে তারাই তাঁর লক্ষ্য। না হ'লে দু'একলাইনে রবীন্দ্রনাথের গল্পকবিতার যেমন-তেমন সারানুবাদ তিনি কখনোই দিতেন না। শিল্পীর হাতের, শিল্পীর মনের কোনো চিহ্ন এ গ্রন্থে নেই। নিজেই তিনি এক জায়গায় বলেছেন—'These summaries after the manner of theatre advertisements can give really no idea of the quality of Tagore's stories (শুধু stories কেন?) as literature.' তাহলে শুধু প্রথম এবং শেষ পরিচ্ছেদটি লিখলেই তো হতো, যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতধর্মিতা, ছন্দের অসামান্য দখল, সুতীক্ষ্ণ হাস্যরসবোধ, উপমা-ব্যবহারে সিদ্ধতা, সর্বোপরি জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য—ইত্যাদি যে সব গুণের এক দুই ক'রে বিবৃতি দিয়েছেন লেখক, তার চেহারাটা হয়েছে অনেকটা কলেজ-বইয়ের টীকার মতো। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের গ্রন্থখানিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভারতের অন্য এক অংশের শ্রদ্ধানিবেদনের নিদর্শন হিসেবেই নিলুম।

ফরিয়াদ। মতিউল ইসলাম। আলহামরা লাইব্রেরি। ১৷৹
বিষণ্ণ। তড়িৎকুমার সরকার। পুষ্কর প্রকাশিকা। ১৷৹

নজরুল ইসলামের সুউচ্চ কণ্ঠ একদা সমাজের বঞ্চিতদের হ'য়ে যে মুখর কবিতার প্রবাহ এনেছিল মতিউল ইসলাম সাহেবের কবিতার স্বাদটা সেই

জাতের। সেই উচ্ছ্বাস, ভাষার সেই ঝংকার। প্রবঞ্চিতের বেদনা তাঁর বুকে বেজেছে। চারিদিকেই কান্না, বঞ্চনা, হাহাকার।

কালের জাহাজ ভিড়েছে আসিয়া অশ্রুর বন্দরে
বুকের পাঁজরে বাড়বাগ্নির শিখা
সূর্য্যের মতো ছড়ায়ে পড়েছে অন্ধ দিগন্তরে
রাঙায়ে কৃষ্ণ রাত্রির বিভীষিকা।···

এই দুঃখের দাহনে কবি উদ্‌ভ্রান্ত। তাঁর শেষ আশা—'মৃত্যুহীন চাষী ও মজুর'—যারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়,—বঞ্চিত দুঃখী। দ্বিধাবিভক্ত হতভাগ্য দেশে অন্তত কবির কণ্ঠেও এ সুর শুনে আনন্দ হয়। তাঁর ছন্দ ধ্বনিবহুল, শব্দযোজনা আয়াসহীন এবং কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, কিন্তু পড়বার পরে মনে কোনো রেশ রাখে না। মুখর কবিতামাত্রেরই বোধকরি এই পরিণাম। বইটি সুদৃশ্য।

'বিষণ্ণ'র কবিতায় ব্যঙ্গ এবং নিরুৎসাহের সুর। স্থানে স্থানে চমকপ্রদ হলেও ভাষাব্যবহার মোটামুটি শিথিল, স্বল্পকথার ইঙ্গিত সবসময়ে খুব প্রীতিকর বলে মনে হয় না। অবান্তর কথার ঝুমঝুমি বাজানোর চেয়ে কবিতায় কম্ কথা বলা নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু অকারণ দুরূহতাও একটা বাধা। দুরূহতা না ব'লে সরসতার অভাব বলাই উচিত।

গান্ধীজিকে কবিতায় এক দীর্ঘ খোলা চিঠি আছে। তা গান্ধীজিকে 'তুখোড়বুদ্ধি রাজনৈতিক চালিয়াৎ' ব'লে বাতিল ক'রে ভিন্ন নেতাকে সেলাম জানাতে কবিতাই যদি লিখতে হয় তাহলে তাতেও কাব্যের কারুকর্ম সরসতা এবং সম্পূর্ণতা তো থাকা চাই। দুঃখের বিষয় সে সাধনার কোনো চিহ্ন এ-কবিতায় নেই। সুরুচির তীরে, গারো, মনকুহেলির পাহাড় প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা ভালো। সবচেয়ে ভালো 'গারো', যার কয়েকটি লাইন তুলে দিই:

এখানে আকাশ ক্লান্তিবিহীন, তাকায় শূন্যপানে
পাখীরা ভরেছে ঘনছায়াবন গানে
ঝরনা লুটোয় জলে
নরম ঘাসের স্পর্শ পায়ের তলে।
মনে হয় যেন স্বর্গের পথ কিছুটা এসেছি বেয়ে।···

বইখানার চেহারাও শোভন নয়। প্রকাশকের ভূমিকাটি অবান্তর।

নরেশ গুহ.

উল্লেখ

মেঘনা। (সাহিত্যসংকলন)। সম্পাদক—বিমলচন্দ্র ঘোষ।

দাম তিন টাকা।

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে ভূষিত হ'য়ে এই সুদৃশ্য সংকলনটি সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে। গ্রন্থবিলাসী মাত্রই উৎসাহিত হবেন, কেননা অন্নদাশঙ্কর রায়, অমিয় চক্রবর্ত্তী থেকে সুরু ক'রে অতি নবীন আধুনিক লেখকদের রচনা একত্র পড়তে পাওয়া আনন্দের কথা। আমাদের সাম্প্রতিক জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি জানালাই যখন রুদ্ধপ্রায় তখন একমাত্র বইই হচ্ছে মানসিক উজ্জীবনের উপায়। বিমলচন্দ্র ঘোষ সংস্কৃতির এই দুর্গতির দিনে আধুনিক চিন্তা এবং সৃষ্টির এই বিচিত্র নিদর্শনটি রচনা ক'রে ধন্যবাদার্হ হলেন। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, হিটলারের জার্মানি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের পত্র, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় এবং আরো অনেকের ছবি 'মেঘনা'র অতিরিক্ত আকর্ষণ।

প্রাপ্ত

আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী। ।•
নভোরশ্মি। সুকুমারচন্দ্র সরকার। " " "
ভারতের বনৌষধি। অসীমা চট্টোপাধ্যায়। " " "

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'র এই আষাঢ়-সংখ্যার সঙ্গে আপনাদের দ্বাদশ বর্ষের চাঁদা শেষ হ'লো। আগামী ১লা আশ্বিনের পূর্বে ত্রয়োদশ বর্ষের চাঁদা (চার টাকা) কিংবা নিষেধাজ্ঞা পাঠিয়ে দিলে বাধিত হবো। যাঁদের চাঁদা বা নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যাবে না, তাঁদের সকলকেই ভি. পি. তে আশ্বিন সংখ্যা পাঠানো হবে। ভি. পি. তে গ্রাহককে বেশি দিতে হয়, আর আমাদের হাতে টাকা পৌঁছতে অনেক সময় তিন-চার মাসও দেরি হ'য়ে যায়; অতএব নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মনি-অর্ডারে টাকা পাঠানোই উভয়ত সুবিধাজনক। ইতিমধ্যে কারও ঠিকানা বদল হ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, এবং প্রেরিত ভি. পি. যাতে প্রত্যাখ্যাত না হয়, সে-বিষয়ে যথাসম্ভব সচেষ্ট হবেন, বিশেষভাবে এই দুটি অনুরোধ জানাই।

বুদ্ধদেব বসু
পরিচালক, কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

সম্পাদক ও প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন/২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস থেকে
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত

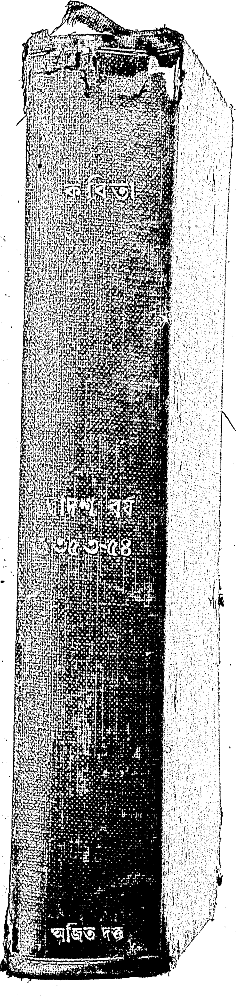
কবিতা
দ্বাদশ বর্ষ
১৩৫৩-৫৪
অজিত দত্ত